তারাশঙ্করের তিনটি উপন্যাস : কৌমজীবনের রূপায়ণ

মোঃ সেলিম ভূঞা

Dhaka University Library
403642

403642

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধীন এম ফিল ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত

অভিসন্দর্ভ

ডিসেম্বর ২০০৬

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যা
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

403642

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, মোঃ সেলিম ভূঞা (রেজিস্ট্রেশন নম্বর: ৩২/১৯৯৭-১৯৯৮) কর্তৃক উপস্থাপিত 'তারাশঙ্করের তিনটি উপন্যাস : কৌম জীবনের রূপায়ণ' শীর্ষক এম ফিল পর্যায়ের গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে রচিত। এই অভিসন্দর্ভ বা এর কোনো অংশ কোথাও মুদ্রিত হয়নি এবং গবেষক অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো ডিগ্রির জন্য ইতঃপূর্বে উপস্থাপন করেননি।

২১ ডিসেম্বর ২০০৬

(ডক্টর ভীষ্মদেব চৌধুরী)
গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক
ও
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০
বাংলাদেশ

Dhaka University Institutional Repository

প্রসঙ্গ-কথা

আমি ১৯৯৭-৯৮ শিক্ষাবর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধীন 'তারাশঙ্করের তিনটি উপন্যাস : কৌমজীবনের রূপায়ণ' শীর্ষক অভিসন্দর্ভ প্রণয়নের জন্য এম ফিল গবেষণা কর্মে ব্রতী হই। নানা সাংসারিক সমস্যার কারণে গবেষণা কর্ম সমাপ্ত করতে দীর্ঘ বিলম্ব হয়। আমার এই গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ভীষ্মদেব চৌধুরী। তাঁর প্রেরণা নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধানে এই অভিসন্দর্ভ পূর্ণাঙ্গরূপ পেয়েছে। তাঁর ঋণ অপরিশোধ্য। এছাড়া বাংলা বিভাগের অন্যান্য শ্রদ্ধেয় শিক্ষকের উপদেশনাও আমার গবেষণা কাজকে ত্বরান্বিত করেছে। আমি বিশেষভাবে স্মরণ করছি এম ফিল প্রথম পর্বে আমার দুই শ্রদ্ধেয় কোর্স শিক্ষক বিভাগের সর্বপ্রবীণ অধ্যাপক সৈয়দ আকরম হোসেন এবং অধ্যাপক বিশ্বজিৎ ঘোষকে।

গবেষণার শেষ পর্যায়ে নানা বিষয়ে আমাকে প্রভূত সাহায্য করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভাষাতত্ত্ব বিভাগের লেকচারার অনুজ প্রতিম সৈয়দ শাহরিয়ার রহমান। অভিসন্দর্ভের মুদ্রণসৌকর্যের কাজটি তিনি সানন্দে সম্পাদন করে দিয়েছেন। তাঁর সান্নিধ্যলাভ আমার এক আনন্দময় অভিজ্ঞতা। তাঁর কাছে আমার ঋণ অশেষ।

আমার সহপাঠীবৃন্দ গবেষণাকাজ সম্পাদন করতে আমাকে সর্বদা উৎসাহ যুগিয়েছে। তাদের মধ্যে এ-মুহূর্তে বিশেষ ভাবে স্মরণ করছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক বায়তুল্লাহ কাদেরী, মোখলেসুর রহমান সাগর এবং এস. আলমগীর আহমেদ শান্তনু-র কথা। আমার আবাল্য বন্ধু বর্তমানে অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী আবুল কালাম আজাদ আমার চিরকালের শুভাকাঙ্ক্ষী। এ-মুহূর্তে তার কথা বিশেষভাবে স্মরণ করছি।

গবেষণাকর্মের জন্য আমি প্রধানত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ব্যবহার করেছি। গ্রন্থাগারের বিভিন্ন কর্মীকে এই সুযোগে আমার বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই। এছাড়া আমার গবেষণা তত্ত্বাবধায়কের ব্যক্তিগত পাঠাগার থেকেও আমি প্রভূত উপকৃত হয়েছি।

অভিসন্দর্ভ রচনাকালে সাংসারিক অনেক জটিলতা থেকে আমাকে মুক্ত রাখতে সচেষ্ট ছিলেন আমার স্ত্রী হাছিনা আক্তার লিলি। গবেষণাকর্ম সম্পাদনে আমাকে নিরন্তর প্রেরণা যুগিয়েছেন তিনি।

গবেষণাকর্ম সম্পাদনের মধ্যবর্তী সময়ে আমি পিতৃমাতৃ-হারা হই। বিদ্যাশিক্ষার প্রতি তাঁদের ছিল প্রবল অনুরাগ। আমাকেও বিদ্যানুরাগী হিসেবে দেখতেই তাঁরা প্রত্যাশী ছিলেন। আজ অভিসন্দর্ভ উপস্থাপনাকালে আমি সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করছি আমার পরলোকগত জনক-জননীকে।

আমার পুত্রকন্যা অদ্রি ও অর্ণব তাদের আকর্ষণীয় সান্নিধ্য দিয়ে আমাকে সচল ও সবল রেখেছে সবসময়। তাদেরকে আশীর্বাদ জানাই।

—গবেষক

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

ভূমিকা ০৫

প্রথম অধ্যায় ॥ পরিপ্রেক্ষিত ০৭

প্রথম পরিচ্ছেদ : তারাশঙ্করের দৃষ্টিতে আদিবাসী মানুষ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : কাহার কৌম

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : বেদে কৌম

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : সাঁওতাল কৌম

দ্বিতীয় অধ্যায় ॥ তারাশঙ্করের উপন্যাসে কৌমজীবনের রূপায়ণ ৪৪

প্রথম পরিচ্ছেদ : হাঁসুলীবাঁকের উপকথা উপন্যাসে কাহার জীবনের রূপায়ণ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : নাগিনী কন্যার কাহিনী উপন্যাসে বিষবেদে জীবনের রূপায়ণ

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : অরণ্য-বহ্নি উপন্যাসে সাঁওতাল জীবনের রূপায়ণ

উপসংহার ১১৪

পরিশিষ্ট ১১৬

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনপঞ্জি

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থপঞ্জি

তারাশঙ্কর-বিষয়ক সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

তারাশঙ্কর-বিষয়ক উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধপঞ্জি

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১) বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী। তাঁর রচিত বেশ কয়েকটি উপন্যাস বাংলা চিরায়ত কথাসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। তারাশঙ্করের উপন্যাসে প্রধানত বাংলার সামাজিক বিবর্তন এবং সমকালীন রাজনৈতিক জীবন শিল্পিত হলেও সমাজের নানা শ্রেণি-পেশা-গোত্র ও বর্ণের মানুষের জীবন-বাস্তবতার রূপায়ণেও তিনি সমানভাবে দক্ষ। অবক্ষয়িত সামন্ত-সমাজের সমাজপতি এবং উন্মেষিত প্রাক্-ধনতান্ত্রিক সমাজের নব্য-ধনিকের দ্বন্দ্ব তারাশঙ্করের উপন্যাসের আকর্ষণীয় বিষয়। তবে অবক্ষয়িত সমাজের ক্রান্তিকালের সংকটই কেবল তাঁর রচনাকে অমর করে রাখেনি, তাঁর রচনায় বিধৃত সমাজের প্রান্তবাসী মানুষ, বিশেষত ভারতীয় উপমহাদেশের আদিবাসী নানা নৃ-গোষ্ঠীর মানুষের জীবনের অণুপুঙ্খ রূপায়ণও তাঁর অসামান্য সাফল্যের স্মারক। তিনি সমাজবিজ্ঞানী কিংবা নৃতত্ত্ববিদ ছিলেন না। কিন্তু তাঁর ছিল এক অন্তর্ভেদী সমাজদৃষ্টি ও জীবনবীক্ষা। স্বকীয় এই দৃষ্টিভঙ্গির কারণেই তিনি তাঁর উপন্যাসে বিভিন্ন নৃ-গোষ্ঠীর মানুষের সউৎস নৃতাত্ত্বিক, সাংস্কৃতিক, ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক বাস্তবতাকে রূপ দিতে সমর্থ হয়েছেন। আদিবাসী মানুষের জীবন নিয়ে রচিত তারাশঙ্করের উপন্যাসসমূহ আজ কেবল সাহিত্যেরই গৌরব নয়; জ্ঞানের আন্তঃশাখার, বিশেষত নৃবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাসবিদ্যা ও ভূগোলশাস্ত্রের বিদ্যার্থী ও গবেষকদের কাছেও আকরগ্রন্থের মর্যাদায় ভূষিত। তারাশঙ্কর যে-সব উপন্যাসে আদি নৃ-গোষ্ঠীর মানুষের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও আর্থনীতিক বাস্তবতার স্বরূপ অঙ্কন করেছেন তার মধ্যে সর্বাধিক উলেখযোগ্য উপন্যাসসমূহ হল *হাঁসুলী বাঁকের উপকথা* (১৯৪৬), *নাগিনী কন্যার কাহিনী* (১৯৫২) ও *অরণ্য-বহ্নি* (১৯৬৬)। এই তিনটি উপন্যাসকে অবলম্বন করেই **তারাশঙ্করের তিনটি উপন্যাস : কৌমজীবনের রূপায়ণ** শীর্ষক বর্তমান অভিসন্দর্ভ প্রণয়ন করা হয়েছে। বক্ষ্যমাণ অভিসন্দর্ভে তিনটি আদি নৃ-গোষ্ঠী তথা কাহার কৌম, বিষবেদে কৌম এবং সাঁওতাল কৌমের মানুষের জীবনের রূপ, লক্ষণ, বৈচিত্র্য এবং নিয়তি ও সম্ভাবনা তারাশঙ্করের উপন্যাসে কীভাবে রূপায়িত হয়েছে তার স্বরূপ ও প্রকৃতি বিশেষিত হয়েছে। এই বিশেষণের ক্ষেত্রে বর্তমান অভিসন্দর্ভে গ্রহণ করা হয়েছে বর্ণনামূলক গবেষণা-পদ্ধতি।

ভারতীয় উপমহাদেশে যে-সব আদিবাসী নৃ-গোষ্ঠী রয়েছে তার মধ্যে নানা কারণে উল্লিখিত তিনটি নৃ-গোষ্ঠী বিশিষ্ট। মানব সভ্যতার বিবর্তনের যে ইতিহাস, তার সুষম সুফল বঞ্চিত এইসব জনগোষ্ঠী তথাকথিত সভ্য নাগরিক মানুষের অবহেলা ও নির্যাতনের শিকার হয়েছে যুগে যুগে। আদিবাসী হয়েও এদের কোনোটি 'নিজ বাসভূমে' উপেক্ষিত 'পরবাসীর' জীবননিয়তির দুর্ভোগ বহন করে চলেছে আজো। তথাকথিত সভ্য ও স্বার্থান্বেষী মানুষ, বিশেষত ঔপনিবেশিক আমলের বহিরাগত শক্তি ও তাদের ক্ষমতাবলয় ভুক্ত জমিদার-মহাজন এবং উপনিবেশ-উত্তর কালের স্বাধীন রাষ্ট্রের সরকারসমূহ নিজেদের স্বার্থে ও প্রয়োজনে এইসব গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষকে ব্যবহার করেছে। বাস্তু ও খাদ্যের প্রলোভনের ফাঁদে ফেলে তারা কৃষিজমি ও গ্রাম প্রতিষ্ঠায় তাদের শ্রমকে কখনো স্বল্পমূল্যে, কখনো-বা বিনামূল্যে ক্রয় করে নিয়েছে। তবু এইসব কৌমজনতা বারবার পরাভূত হয়েও পুনরায় নিজেদের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষা

Dhaka University Institutional Repository

করে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। কোনো গোষ্ঠী বহিরারোপিত শক্তি ও চেতনার আক্রমণে স্বভূমি থেকে উন্মূলিত হয়ে হয়েছে সংস্কৃতি-হারা, কোনো গোষ্ঠী স্বস্থান থেকে উৎখাত হয়ে যাযাবর জীবনের দুর্ভাগ্যকে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু এ কথাও সত্য যে, সংস্কৃতির স্বকীয়তা এবং ওই সংস্কৃতির বলয়ের মধ্যে নিজেদের টিকিয়ে রাখার প্রেরণাই তাদের জীবনের অমোঘ নিয়তি, তাদের বর্তমান অস্তিত্বেরও স্মারক। সভ্যতাগর্বী মানুষের অবহেলা আর গোষ্ঠীগত সাংস্কৃতিক প্রেরণার পরস্পরবিরোধী টানাপোড়েনই মূলত আদিবাসী সংস্কৃতির রক্ষাকবচ গড়ে তুলেছে।

যে আঞ্চলিক ভূগোল তারাশঙ্করের শৈশব-কৈশোর ও যৌবনের লালনক্ষেত্র, বিভিন্ন আদিবাসী নৃ-গোষ্ঠীর পদচারণা ও জীবন-যাপনায় তা ছিল ঋদ্ধ। রাঢ় বাংলার ওই বিশিষ্ট ভৌগোলিক ও সামাজিক পরিমণ্ডলে বেড়ে-ওঠা তারাশঙ্কর শৈশবকাল থেকেই নিবিড়ভাবে মিশেছেন বিভিন্ন গোষ্ঠীর আদিবাসী মানুষের সঙ্গে, দেখেছেন তাদের স্বকীয় জীবন-যাপন পদ্ধতি, স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি। তিনি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন তাদের আর্থনীতিক জীবন, জাতিগত উৎস ও স্বরূপ এবং উত্থান-পতন ও সম্ভাবনা। আর স্বোপার্জিত এই অভিজ্ঞতাকেই তিনি রূপায়িত করেছেন কয়েকটি বিখ্যাত উপন্যাসে। আদিবাসী জীবনের প্রসঙ্গকথা ছড়িয়ে আছে তাঁর নানা উপন্যাসে। কিন্তু আমাদের আলোচ্য তিনটি উপন্যাসে অখণ্ডরূপে তিনি তিনটি আদি নৃ-গোষ্ঠীর জীবনকেই অবলম্বন করেছেন। ওই তিনটি উপন্যাসে বিধৃত কৌমজীবনের অর্থাৎ তিনটি স্বতন্ত্র কৌমের জীবনধারা তথা সমাজ সংস্কৃতি ধর্ম অর্থনীতি এবং জাতিগত উৎসের যে পরিচয় তারাশঙ্কর উপস্থাপন করেছেন তার স্বরূপ ও প্রকৃতি বিশেষণের উদ্দেশ্যেই বর্তমান অভিসন্দর্ভ প্রণীত হয়েছে। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে **তারাশঙ্করের তিনটি উপন্যাস : কৌমজীবনের রূপায়ণ** শীর্ষক বর্তমান অভিসন্দর্ভ "ভূমিকা" ও "উপসংহার"সহ স্বতন্ত্র দুটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত হয়েছে। অভিসন্দর্ভের প্রথম অধ্যায়কে আমরা চিহ্নিত করেছি "পরিপ্রেক্ষিত" নামে। এ অধ্যায়ে বিভিন্ন কৌম জনগোষ্ঠীর সঙ্গে তারাশঙ্করের সম্পৃক্তি, তাদের সম্পর্কে ঔপন্যাসিকের মনোভাব এবং উপন্যাসোক্ত তিনটি নৃ-গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য ও স্বরূপ বিশেষণ করা হয়েছে। আলোচনার সুবিধার জন্য এ অধ্যায়কে আমরা চারটি স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদে বিন্যাস করেছি। যথাক্রমে এই পরিচ্ছেদ চারটি হল : প্রথম পরিচ্ছেদ : 'তারাশঙ্করের দৃষ্টিতে আদিবাসী মানুষ' ; দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : 'কাহার কৌম' ; তৃতীয় পরিচ্ছেদ : 'বেদে কৌম' ; চতুর্থ পরিচ্ছেদ : 'সাঁওতাল কৌম'। অভিসন্দর্ভের দ্বিতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম "তারাশঙ্করের উপন্যাসে কৌমজীবনের রূপায়ণ"। আলোচনার সুবিধার্থে এ অধ্যায় বিন্যস্ত হয়েছে তিনটি পরিচ্ছেদে। এ অধ্যায়ে অবলম্বিত তিনটি উপন্যাসে বিধৃত কৌমজীবনের স্বরূপ বিশেষিত ও মূল্যায়িত হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ের অন্তর্গত পরিচ্ছেদ তিনটি হল যথাক্রমে : প্রথম পরিচ্ছেদ : 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা উপন্যাসে কাহার জীবনের রূপায়ণ' ; দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : 'নাগিনী কন্যার কাহিনী উপন্যাসে বিষবেদে জীবনের রূপায়ণ' ; তৃতীয় পরিচ্ছেদ : 'অরণ্য-বহ্নি উপন্যাসে সাঁওতাল জীবনের রূপায়ণ'। সবশেষে দুটি আলোচিত অধ্যায় সূত্রে প্রতিপাদিত প্রত্যয়কে সিদ্ধান্তের আকারে "উপসংহার" অংশে উপস্থাপন করা হয়েছে। অভিসন্দর্ভে আলোচিত ও প্রতিপাদিত বিষয়াদির সম্পূরক সংযোজন হিসেবে "উপসংহার" অংশের পরে একটি 'পরিশিষ্ট' সংযোজিত হয়েছে। এতে সংকলন করা হয়েছে 'তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনপঞ্জি ও গ্রন্থপঞ্জি', 'তারাশঙ্কর-বিষয়ক গ্রন্থপঞ্জি', 'তারাশঙ্কর-বিষয়ক উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধপঞ্জি' এবং 'সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি'।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

পরিপ্রেক্ষিত

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম পরিচ্ছেদ
তারাশঙ্করের দৃষ্টিতে আদিবাসী মানুষ

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৯৮-১৯৭১) বীরভূম জেলার লাভপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর শৈশব-কৈশোর ও প্রাক্-যৌবনকাল অতিবাহিত হয়েছে ওই অঞ্চলে। বীরভূম জেলার ভৌগোলিক বাস্তবতার কারণেই সুদীর্ঘকাল ধরে বীরভূমে বিভিন্ন আদিবাসী জনগোষ্ঠীর বাস। ফলত নানা আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে দেখার, তাদের জীবন ও সংস্কৃতিকে পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ তাঁর কাছে ছিল অবারিত। তারাশঙ্করের এই বিশিষ্ট সমাজদৃষ্টি কৈশোরপর্বেই প্রস্ফুটিত হওয়ার সুযোগ লাভ করায় সতর্ক ও আন্তরিক বীক্ষণে তিনি এই আদিবাসী জীবনধারাকে উপলব্ধি করতে সমর্থ হন।[১] উত্তরকালে যখন তাঁর এই সমাজদৃষ্টি শিল্পবোধের সঙ্গে সমন্বিত হয়, তখন সাহিত্যের উপকরণ হিসেবে স্ব-অঞ্চলের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জীবন তাঁকে প্রভূতরূপে আকৃষ্ট করে। এই অনুরাগ ও আকর্ষণের শিল্পস্মারক তারাশঙ্কর সৃজিত তিনটি কালজয়ী উপন্যাস – *হাঁসুলী বাঁকের উপকথা* (১৯৪৬-৪৭), *নাগিনী কন্যার কাহিনী* (১৯৫২) ও *অরণ্য-বহ্নি* (১৯৬৬)। উল্লিখিত তিনটি উপন্যাসে যথাক্রমে কাহার, বেদে ও সাঁওতাল কৌম-জনগোষ্ঠীর জীবনবেদ ও জনজীবন অনন্য শিল্পসৌন্দর্যে রূপায়িত হয়েছে। আদিবাসী মানুষের প্রতি তারাশঙ্করের অনুরাগ ও আকর্ষণ শুধু ওই তিনটি উপন্যাসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। তাঁর সমগ্র সাহিত্যজীবনের বিভিন্ন পর্বে এর প্রতিফলন আমরা লক্ষ করব।

সমগ্র বীরভূম ও রাঢ়-মুর্শিদাবাদে নিম্নবর্গের মানুষের বসবাস বহুকাল ধরে। বীরভূমের উত্তর-পশ্চিমে সাঁওতাল পরগণার অবস্থান। বীরভূমের গ্রামাঞ্চলে বহু উচ্চবর্ণের হিন্দুগৃহে আদিবাসী সাঁওতালরা কৃষি ও গৃহস্থালি কাজে অংশ নিত। সমগ্র রাঢ়ের কাঁকর মিশ্রিত লাল মাটির সঙ্গে নিম্নবর্গের এসব মানুষের রক্তের সম্পর্ক ছিল ভারতীয় সভ্যতার উষাকাল থেকে। রাঢ়ভূমি ছিল অসংখ্য নিম্নবর্গ মানুষের মিলনমেলা। বিচিত্র সব মানুষ রাঢ়ের সংস্কৃতিকে বিভিন্নভাবে সমৃদ্ধ করেছে। এছাড়া বিভিন্ন মৌসুমে বর্হিজেলা থেকে নানাবর্ণের পেশা ও জাতির মানুষ কাজের সন্ধানে ভিড় করত বীরভূমে। তারাশঙ্করের নিজ গ্রাম লাভপুরেও উচ্চবর্ণের মানুষের পাশাপশি বাস করত নানা বর্ণের ও পেশার অন্ত্যজ মানুষ। প্রাচীন জৈনসূত্র গ্রন্থ এবং বৌদ্ধ গ্রন্থ থেকেও জানা যায় বীরভূম এককালে ঘন অরণ্যে আচ্ছাদিত ছিল। বীরভূমের 'বীর' শব্দটি হল মুণ্ডারী শব্দ। এর অর্থ হল জঙ্গল। প্রধানত অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় গোষ্ঠীজাত অনার্য ক্ষুদ্র জাতিসত্তা রাঢ় অঞ্চলের প্রাচীনতম আদিবাসী হওয়ায় এ অঞ্চল দীর্ঘকাল আর্যদের প্রভাব মুক্ত ছিল।

রাঢ়বঙ্গে বসবাসকারী আদি অস্ট্রাল কৌমগোষ্ঠীর মধ্যে রয়েছে সাঁওতাল, কাহার, বেদে, মুন্ডা, ওঁরাও, হাড়ি, বাগদী, ডোম, বাউল. পটুয়া, দ্রাবিড় ভাষাভাষী দাসদস্যুসহ অসংখ্য নিম্নবর্গ মানুষ। বর্তমান পশ্চিম বাংলার মোট আদিবাসী জনসংখ্যার শতকরা পঁচাত্তর জনই বাস করে রাঢ় বঙ্গের তিনটি জেলা— বর্ধমান, বীরভূম ও বাঁকুড়ায়। আর সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর শতকরা পঁচাত্তর জনেরই বসবাস ও চলাচল

Dhaka University Institutional Repository

মেদেনীপুরসহ ওই তিনটি জেলায়।[২] সমাজ-বিন্যাসের এই বৈশিষ্ট্য তারাশঙ্করের স্ব-গ্রাম লাভপুরে আরও বৈচিত্র্য নিয়ে প্রকাশিত। তারাশঙ্কর শৈশব থেকে দেখেছেন দিনমান এখানে আসত বাউল-বৈষ্ণব, শাক্ত-তান্ত্রিক, পদাবলী গায়ক, লাঠিয়াল, পীরমঙ্গল, গোরুমারা, যাযাবর, পটুয়া, বিষবেদে, মালবেদে, সাঁওতাল শ্রমিক, কাঁহার, ডোম, বাগ্দী ইত্যাদি নানা বর্ণ ও গোষ্ঠীর অন্ত্যজ পেশাজীবী মানুষ। তারা কেউ গান-গল্প শোনাত, কেউ খেলা দেখাত। আবার কেউ কেউ দিন মজুর হিসেবে কাজ করত। অনুসন্ধিৎসু তারাশঙ্কর বাল্যকাল থেকেই তাদের কথা শুনতেন এবং তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশতেন। এদের বিচিত্র জীবনধারা ও ভাষাবৈশিষ্ট্য শৈশব থেকেই তাঁকে আকর্ষণ করত। তারাশঙ্করের বাড়িতে আসত সেতারি, জ্যোতিষী, পটুয়া, লাঠিয়াল, ডাইনী, বেদেনী— আরও কত রকমের মানুষ। সবার কথা শুনে, সবার সঙ্গে মিশে শৈশবেই সমৃদ্ধ হয়েছে তাঁর অভিজ্ঞতার জগৎ। আদিবাসী অধ্যুষিত লাভপুর সম্পর্কে তারাশঙ্কর লিখেছেন—'লাভপুর গ্রামখানি অদ্ভুত গ্রাম। আমার জন্মস্থান– আমার জন্মভূমি– আমার পিতৃপুরুষের লীলাভূমি বলে অতিরঞ্জন করছিনা, সত্য কথা বলছি। ... এ গ্রামে জন্মেছি বলে নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করি।'[৩] *আমার সাহিত্যজীবন* গ্রন্থে তারাশঙ্কর আরও লিখেছেন — 'এদেশের মানুষকে জানার একটা অহংকার ছিল। ... এদের সঙ্গে মানুষ হিসেবে পরিচয়ের একটা বড় সুযোগ আমার হয়েছিল। ... তাই এদের কথা লিখি। এদের কথা লিখবার অধিকার আমার আছে।'[৪]

তারাশঙ্করের শৈশবকালীন পারিবারিক পরিমণ্ডলও এ বিষয়ে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। একদিকে তাঁর পিসীমা শৈলজা ঠাকুরাণী নিজের ভ্রাতুষ্পুত্রটিকে জমিদারির উপযুক্ত বৈষয়িক জ্ঞান-সম্পন্ন করে তুলতে চেয়েছেন। অন্যদিকে তাঁর মা তাঁকে শিক্ষা দিয়েছেন জমিদারি শাসনের বাইরে মানবিক দিক ও দেশপ্রেম বিষয়ে। ফলে, তাঁর মধ্যে মানুষকে জানার আগ্রহ উত্তরকালের সাহিত্য রচনায় সহায়ক হয়েছে। লাভপুরের নিম্নবর্গের এসব মানুষের প্রতি তারাশঙ্করের দৃষ্টি ছিল প্রচণ্ড স্নেহশীল। আদিবাসীদের তিনি দেখেছেন জীবনসংগ্রামী মানুষ হিসেবে। আর এ-সব কারণেই নিম্নবর্গের মানুষের জীবনাচার ও তাদের সংস্কৃতি আত্মস্থ করা তারাশঙ্করের পক্ষে সহজতর হয়েছিল। তারাশঙ্কর জন্মসূত্রে ক্ষুদ্র জমিদারির উত্তরাধিকার লাভ করেছিলেন। জমিদারি তত্ত্বাবধানের জন্যও তাঁকে অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষের সংস্পর্শে আসতে হয়েছিল। উত্তরকালে সমকালীন জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক স্রোতোধারার সঙ্গে তাঁর সম্পৃক্তি নিম্নবর্গীয় মানুষের আরও নিকটবর্তী হতে সহায়তা করেছে। তারাশঙ্করের হরিজন সেবা, দ্রুত চিকিৎসা-সহায়তা দান, অগ্নি-নির্বাপণ বাহিনীর তত্ত্বাবধান, জনগণের কাতারে নেমে আসার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছিল। উত্তরকালে অহিংস-অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে তিনি যখন মহাত্মা গান্ধীর রাজনৈতিক আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে উত্তাল দলীয় রাজনীতির জগতে প্রবেশ করেন তখনও জীবনদৃষ্টির কারণেই অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষকে ঐতিহাসিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে বিচার করে তাদের বঞ্চনার ইতিবৃত্ত ও মুক্তির সম্ভাবনা বিষয়ে তিনি ভেবেছেন। এরই উজ্জ্বল সাক্ষ্য তাঁর প্রথম উপন্যাস *চৈতালী ঘূর্ণি*। এতে উন্মূলিত কৃষকের শ্রমজীবীতে পরিণত হওয়ার কাহিনী তিনি সৃজন করেছিলেন। ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে শ্রীনিকেতনে পল্লীকর্মী সম্মেলনে তারাশঙ্কর উপস্থিত হয়েছিলেন পল্লীসমাজের সেবাব্রতী হিসেবে। সেখানে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন — 'গ্রামকে গড়ে তোল। নইলে ভারতবর্ষ বাঁচবে না'।[৫] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই পল্লীগঠনমূলক কাজের আহ্বানের পরিপ্রেক্ষিতে তারাশঙ্কর সচেতনভাবে আরো নিবিড়ভাবে অসংখ্য আদিবাসী মানুষের সান্নিধ্যে আসেন। তাদের সঙ্গে গড়ে ওঠে তাঁর নিবিড় সখ্যের

Dhaka University Institutional Repository

সম্পর্ক। ওই পল্লীসম্মেলনে রবীন্দ্রনাথ কথায় কথায় তারাশঙ্করকে প্রশ্ন করেছিলেন— 'তুমি দেখেছ অনেক, এত দেখলে কি করে?' তারাশঙ্কর জবাবে বলেছিলেন, 'সমাজ সেবকের কাজ করেছি, বিষয়কর্ম দেখাশোনা করেছি।' কবি বলেছিলেন, 'সেটা সত্য হয়েছে তোমার। তোমার মত গাঁয়ের মানুষের কথা আগে আমি পড়িনি'। [৬] তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিল্পিমানস সংগঠনে আদিবাসী জনতার যে নিবিড় সংস্পর্শ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে রবীন্দ্রনাথের উপর্যুক্ত মূল্যায়নেই তার যথার্থ স্বীকৃতি মেলে। প্রান্তিক মানুষের প্রতি অকপট মমতা, কৌতূহল আর অনুসন্ধিৎসার সঙ্গে তিনি তাঁর শিল্পবীক্ষণকে সমন্বিত করেছিলেন। তাই সাহিত্য সৃজনকালে এসব ব্রাত্যজনের জীবন-কথার শিল্পরূপায়ণে তিনি নিরবচ্ছিন্নভাবে স্বচ্ছন্দ ও সফল হয়েছেন।

আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তন পরস্পর গভীরভাবে সম্পর্কিত। পরাধীন এবং স্বাধীন ভারতবর্ষে সকল প্রকার পরিবর্তন এসছে এই ত্রিধারার আন্তঃসম্পর্কের সূত্র ধরেই। বীরভূম ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলের আদিবাসীদের জীবনধারার পরিবর্তনও বিচ্ছিন্ন কোনো উৎস থেকে উদ্ভূত হয়নি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে পৃথিবী ব্যাপী পরিবর্তনের সূত্র ধরে শুরু হয় আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামোর প্রকৃত ভাঙা গড়া। যুদ্ধের ভয়াবহতা ও যুদ্ধসৃষ্ট নৈতিক অবক্ষয়ে বিপর্যস্ত হতে থাকে মানবীয় মূল্যবোধ। যুদ্ধকালীন অস্থিরতায় ভেঙে পড়ে অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবন। এই নেতিবাচক প্রভাব পড়ে সমগ্র বিশ্বে। ব্রিটিশশাসিত ভারতবর্ষকেও যুদ্ধের ফল ভোগ করতে হয় অনিবার্যভাবে। জাতীয় জীবনের সর্বস্তরের সংকটের এ ঘনীভবন আদিবাসী জীবনকেও বিপুলভাবে স্পর্শ করে। বিশেষ অঞ্চলের জীবনযাত্রা ও সামাজিক ব্যবস্থার যত স্বকীয় বৈশিষ্ট্যই থাক না কেন সাধারণভাবে তা জাতীয় এবং বিশ্বজনীন জীবনধারার সঙ্গেও একান্তভাবে সম্পর্কিত। তবু, ১৯১৪-১৮ সালের প্রথম মহাযুদ্ধের ধ্বংসাত্মক পরিবর্তেনের পরও ভারতের আদিবাসী জনগোষ্ঠী অদম্য প্রাণশক্তি ও সংকোচনশীল কৌমজীবন কাঠামোর মধ্যে কোনো রকমে টিকে ছিল। কিন্তু ১৯৩৯-৪৩ সালের দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ভয়াবহতার হাত থেকে তারা রেহাই পায়নি। যুদ্ধের প্রয়োজনে উজাড় হয়েছে অরণ্য, নদী ভরাট করে তৈরি হয়েছে সেতু, নির্মিত হয়েছে অসংখ্য রাস্তাঘাট। যুদ্ধ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং মনুষ্যসৃষ্ট কৃত্রিম দুর্ভিক্ষের কারণে সমগ্র বাংলা দেশ সহ আদিবাসী সমাজে ১৯৪৩ ভয়াবহরূপে আত্মপ্রকাশ করে। সমগ্র ভারতবর্ষে ক্রমবিস্তৃত এই দুর্ভিক্ষে অকালে মৃত্যু হয় লক্ষ লক্ষ অনাহারী মানুষের। যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষের এই ভয়াবহ পরিণতির হাত থেকে মুক্তি পায়নি বাংলার আদিবাসী জনগোষ্ঠী। এ-সময় থেকেই তারা নিজস্ব সংস্কৃতি, পেশা ও জীবনধারার স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে উন্মূলিত জনগোষ্ঠীতে রূপান্তরিত হতে শুরু করে।

তারাশঙ্করের জীবনকালের দুই-তৃতীয়াংশ সময়ই ব্রিটিশ কলোনিশাসিত গ্রামীণ সমাজ ছিল সামন্তবাদী সমাজকাঠামোর অন্তর্গত। ওই সমাজ ব্যবস্থার সামাজিক,আর্থনীতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের পুরোটাই সামন্ত শ্রেণী তথা মহাজন-জমিদারদের করায়ত্ত ছিল। ওই কালের সামন্ততান্ত্রিক শোষণ, নির্যাতন ও নিপীড়নে প্রজা ও খাতকরূপী আদিবাসী মানুষের জীবন ছিল সর্বাধিক দুর্বিসহ। পশ্চাৎপদতা, অনগ্রসরতা, পরিবর্তনবিমুখতা, কুসংস্কারচ্ছন্নতা, অভাব-অনটন, দারিদ্র্য-ব্যাধি এবং নানপ্রকার প্রাকৃতিক বিপর্যয় আদিবাসী সমাজের ও জীবনের সীমাহীন দুর্গতির প্রধান কারণ। ঔপনিবেশিক শাসনামলে আদিবাসী সমাজ শোষিত হয়েছে নানা দিক থেকে। দেশীয় মহাজন, জমিদার এবং ঔপনিবেশিক শাসক সবাই তাদের প্রতি ছিল নির্মম। উচ্চশ্রেণী-নিয়ন্ত্রিত বর্ণাশ্রম প্রথার পীড়ন, নারীর মর্যাদাহীনতা ও লাঞ্ছনা এইসব ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জীবনধারাকে রাহুর মতো গ্রাস করেছিল।[৭]

Dhaka University Institutional Repository

সমস্ত উনিশ শতকে রাঢ়বঙ্গের সমাজ জীবনে উঠতি বণিকগোষ্ঠী দ্রুত প্রতিপত্তি অর্জন করে। এরই অনিবার্য প্রতিক্রিয়ায় বনেদি সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে নব্য পুঁজিবাদের সংঘাত দেখা দেয়। এই সংঘর্ষে নতুন পুঁজিবাদী শক্তিরই নিয়মমাফিক বিজয় ঘটে। এর ফলে আদিবাসী প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থায়ও পরিবর্তন অর্থাৎ অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোগত পরিবর্তন আসন্ন হয়ে ওঠে। সনাতন মূল্যবোধের সঙ্গে নবীন জীবনবোধের সংঘাত এ কালের এক জীবন্ময় প্রসঙ্গ। পুঁজিবাদের প্রতিষ্ঠা ব্যক্তিত্ব বিকাশে সহায়ক হলেও পুরোনো সামন্তসমাজের বিধিবিধান ও অনুশাসন রাতারাতি উপেক্ষা করার সুয়োগ ছিল স্বল্প। তারাশঙ্করের গল্পে উপন্যাসে এই জরাজীর্ণ ঘুণেধরা সামন্ততন্ত্র-বেষ্টিত পরিবর্তন-উন্মুখ গ্রামীণ সমাজের ভাঙনের ছবি প্রাধান্য পেয়েছে। তারাশঙ্কর তৎকালীন এই পরিবর্তনকে দেখেছেন স্বোপার্জিত সমাজদৃষ্টি ও কংগ্রেসী রাজনীতির দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয়ে। শ্রেণী-সংগ্রামের মার্কসীয় তত্ত্বে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না।[৮] তারাশঙ্কর ১৯২১ খ্রিস্টাব্দের অসহযোগ আন্দোলনের কাল থেকেই মহাত্মা গান্ধীর চিন্তা ও আদর্শে আকৃষ্ট হন। রাজনীতিক চিন্তা ও মতাদর্শে তিনি পূর্বাপর গান্ধীকেই অনুসরণ করেছেন। গান্ধীজীর অহিংস মতবাদ তারাশঙ্করের মনে গভীর রেখাপাত করে। সমাজের পরিবর্তনশীলতার স্বোপার্জিত সমাজদৃষ্টি এবং গান্ধীজীর অহিংস মতবাদ ও ভারতত্ত্ব সমন্বিত হয়েই সংগঠিত হয়েছে আদিবাসী জনগোষ্ঠী সম্পর্কে তারাশঙ্করের দৃষ্টিকোণ।[৯] আর এই দৃষ্টিভঙ্গিকেই ওই জনগোষ্ঠীর কৌমজীবনের শিল্পরূপায়ণে প্রয়োগ করেছেন তারাশঙ্কর।

দুই

উনিশ শতকে সামন্ত জমিদারগণ মূলত তৎকালীন ব্রিটিশ রাজশক্তির সম্পূরক শক্তিরূপে কাজ করেছে। ব্রিটিশ শাসন ও শোষণ পাকাপোক্ত করাই ছিল জমিদারদের প্রধান কাজ। ফলে জাতীয় জীবনে শোষক ও শোষিত এই দুটি পক্ষ দাঁড়িয়ে যায় এবং দ্বন্দ্বময় অবস্থান গ্রহণ করে। এই সপ্রাণ দ্বন্দ্বের সঙ্গে যুক্ত হয় নবগঠিত জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক দলের কর্মসূচি ও সংগ্রাম। রাজনৈতিক জ্ঞান বর্জিত সাধারণ আরণ্যক ও কৌমসমাজ-বন্দি মানুষের দ্বারা পরিকল্পনাহীনভাবে সংগঠিত সাঁওতাল বিদ্রোহ ও নীল বিদ্রোহ ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থায় পরাধীন দেশের জন্য জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের প্রতীক হিসেবে দেখা দেয়। নীল-বিদ্রোহের সমসময়ে সংঘটিত সিপাহী বিদ্রোহও ভারতীয় জাতীয়তার চেতনাকে পরিপুষ্ট করে তোলে। তারাশঙ্কর অঞ্চলভিত্তিক ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর সাঁওতাল বিদ্রোহের মতো সংগ্রামকে মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলেও তার রাজনৈতিক ব্যাখ্যায় তেমন উৎসাহ দেখাননি। তিনি সমাজ-রাজনীতির ওই ইতিহাস অধ্যয়ন করেছেন, বেদনাহত হৃদয়ে সনাতন গ্রামীণ ও কৌমসংস্কৃতির জন্য হাহাকার তুলেছেন। এই বোধটিই তাঁর নানা উপন্যাসে শিল্পিত হয়েছে।[১০] ওই দৃষ্টিভঙ্গির জন্যই সাঁওতাল বিদ্রোহকে আদিম নৃ-গোষ্ঠীর জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামরূপে না দেখে অধিকার সচেতন নির্যাতিত মানুষের অন্যায় অবসানের আন্দোলন হিসেবে দেখেছেন তারাশঙ্কর । ফলত, ভারতে ইন্দিরাশাসিত কংগ্রেসী রাজনীতির সংহত অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে উচ্চতম আইন পরিষদ রাজ্যসভার সদস্য তারাশঙ্করের পক্ষে ১৯৬৬ সনে *অরণ্য-বহ্নির* শিল্পরূপায়ণে আদিবাসীর মুক্তিসংগ্রামের ভবিষ্যৎ-সঞ্চারী আবেদন সৃজন করা সম্ভব ছিল না। যদি তিনি তা করতেন তা হলে তা অখণ্ড ভারতচেতনার বিপক্ষে যেত এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের 'সপ্ত-ভগিনীতুল্য' রাজ্যের বিচ্ছিন্নতাবাদী অন্দোলনকেই তা মদদ যোগাত।[১১] তাঁর এই কংগ্রেসীয় দৃষ্টিভঙ্গির কারণেই *অরণ্য-বহ্নি* জাতীয় গণসংগ্রামের সম্ভাবনাদীপ্ত শিল্প-অভিব্যক্তি না হয়ে ঐতিহাসিক রোমান্সে

Dhaka University Institutional Repository

পর্যবসিত হয়েছে।[১২] তারাশঙ্কর তাঁর স্মৃতিকথায় বীরভূমের সাঁওতাল বিদ্রোহের কথা উল্লেখ করেছেন। *কালিন্দী* (১৯৪০) উপন্যাসেও সাঁওতাল বিদ্রোহের কথা স্মৃতিচারণসূত্রে বিধৃত; *অরণ্য-বহ্নি* উপন্যাসেরও মূল কাহিনীবৃত্তের অন্তর্ভুক্ত। তারাশঙ্কর স্বীকার করেছেন যে, রাজনৈতিক মতাদর্শের কারণে *অরণ্য-বহ্নিতে* আদিবাসী রাজনীতি ও তাদের সংগ্রাম দলের কাছে এবং নিজের কাছেও যথাযথ মূল্য পায়নি। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অখণ্ড ভারত-চেতনার কারণেই সাঁওতালদের স্বতন্ত্র স্বভূমি প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম সাদর সম্ভাষণে মূল্যায়ন করা তারাশঙ্করের পক্ষে সম্ভব হয়নি। যদিও শিল্পী হিসেবে আদিবাসীদের স্বাধীনতা সংগ্রামে তিনি সহানুভূতিশীল। কিন্তু ভারত-চেতনার ধারক হিসেবে আদিবাসীদের স্বাধীনতা আন্দোলন তাঁর কাছে কেবলই বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন।[১৩] রচিত প্রধান উপন্যাসগুলিতে সমাজগতির ধারাকে অনুসরণ করতে গিয়ে তারাশঙ্কর রাঢ় বঙ্গের আদিবাসীসহ সমগ্র পল্লীর জীবনধারা অন্বেষণ করেছেন। বাংলার ভূমি-ব্যবস্থার ক্রম-পরিবর্তন এবং কৃষি ও শিল্পের দ্বন্দ্বময় সম্পর্ক কীভাবে আদিবাসীসহ সমগ্র গ্রামজীবনকে বিপর্যয়ের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছিল, তার স্বরূপ সন্ধানের পরিচয় রয়েছে তারাশঙ্করের লেখায়। তারাশঙ্কর সমাজের সঙ্গে ব্যক্তি এবং গোষ্ঠীর নানাবিধ সম্পর্কের বিশ্লেষণ, সমাজের শাসন-শোষণ ও সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিলেন। আদিবাসী সমাজের অর্থনীতি, সমাজ-ব্যবস্থা, নৈতিক চেতনা, ধর্মবোধ, উৎসব-অনুষ্ঠান-পার্বণ এবং ওই সমাজের মানুষের গোষ্ঠীগত জীবনের বাস্তব ও বাস্তবতার ছবি অঙ্কনে তিনি সফল হয়েছেন। তাঁর উপন্যাসে কৌম জনগোষ্ঠীর মানুষের ক্ষুদ্রতা, হীনতা, দুর্বার জৈববৃত্তি, দুঃখ, যন্ত্রণা, দারিদ্র্য, হতাশা, অস্তিত্ব সংকটসহ নানা বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে প্রবল সংঘাত এবং তার মধ্য দিয়েই তাদের মনুষ্যত্বের অমলিন মহিমার প্রকাশ ঘটেছে। তারাশঙ্কর ওইসব জীবনসংরাগ ও তার মহিমাকে মহৎ শিল্পীর সহানুভূতি দিয়েই অঙ্কন করেছেন। অধিকন্তু সমকাল-সচেতন তারাশঙ্কর আবার স্বনিরূপিত ইতিহাস চেতনারও ধারক। সামাজিক নানা পট পরিবর্তন এবং সমস্যাগুলো সম্পর্কেও যথাযথ মাত্রায় সচেতন ছিলেন তিনি। সামন্ততন্ত্রের ক্ষয়িষ্ণু রূপ, নতুন যন্ত্রনির্ভর শিল্পসভ্যতার বিকাশ, কৃষিজীবনের সঙ্গে তার সংঘর্ষের ঐতিহাসিক পটভূমির সঙ্গে তিনি যুক্ত করেছেন রাজনীতিক ও আর্থনীতিক চিন্তাধারার বৃহৎ পরিপ্রেক্ষিতটিকেও। 'আর্থনীতিক দুর্দশায় অনন্যোপায় কৃষকের শ্রমজীবী হওয়ার অসহায়ত্ব' বর্ণনাই হোক, কিংবা আদর্শদীপ্ত অহিংস জাতীয়তাবাদের প্রকাশেই হোক – তাঁর জীবনাগ্রহ ছিল প্রবল।

তিন

আদিবাসী-প্রধান রাঢ় অঞ্চলের গভীরে যে আদিম কৌম সংস্কৃতির উপাদান রয়েছে, তাকে তারাশঙ্কর যত্ন সহকারে তাঁর রচনায় উপস্থাপন করেছেন। আবার হিন্দুর ধর্ম-সংস্কৃতির সঙ্গে কৌম জনগোষ্ঠীর ধর্ম-সংস্কৃতির যে মিশ্রণ ঘটেছে তার অভিজ্ঞতাও তাঁর ছিল। রাঢ়ের কৃষকাজে আদিবাসী সাঁওতালদের কর্মদক্ষতা এবং তাদের শ্রমনিষ্ঠার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অন্যান্য আদিবাসীদের পিছিয়ে পড়া ও অলস গতিহীনতা দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল তারাশঙ্করের। অনার্য সম্প্রদায়ের উপযুক্ত জীবিকার অভাবে নিরুপায় হয়ে সামাজিক অপরাধের পথে পা বাড়ানোর প্রবণতাকেও তিনি নিরীক্ষণ ও বিশ্লেষণ করেছেন গভীর সহৃদয়তায়। পৃথিবী পরিব্যাপ্ত মহাযুদ্ধ এই সামাজিক পরিবর্তনের জন্য যে বিশেষভাবে দায়ী, তারাশঙ্কর নিজের রচনায় তা বিশেষভাবে দেখাতে চেয়েছেন। যুদ্ধের প্রভাবে আর্থনীতিক পরিবর্তনের কারণে জীবনমান পাল্টে গেছে তাদের। বাধ্য হয়ে কৃষিজীবী আদিবাসীরা শিল্পকারখানায় শ্রমদাসে পরিণত

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছে। তবে, সামন্ততন্ত্রের অবসানের পথ ধরে পুঁজিবাদের অভ্যুদয়ের ফলে তারাশঙ্করের জীবনজিজ্ঞাসায় পরিবর্তন আসলেও ওই ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্রের প্রতি অচ্ছেদ্য আত্মীয়তার সম্পর্ককে তিনি আমৃত্যু অস্বীকার করতে পারেননি। বিগত সমাজ, বিগত জীবনের জন্য তারাশঙ্করের সকরুণ মমত্ববোধ তাঁর রচনাবলিতে ব্যাপৃত। তিনি নিজে ছিলেন ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত রক্তের উত্তরাধিকারী। ফলে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জীবনধারার বিপর্যয়ে তাঁর বেদনা স্বতঃস্ফূর্ত। নতুন কালকে গ্রহণ করেও পুরোনো কালের জন্য মর্মগত সহানুভূতি তারাশঙ্করের সাহিত্যের সাধারণ বৈশিষ্ট্য।

প্রত্যেক জাতি বা সমাজের একটা প্রাণশক্তি থাকে। এর মধ্য দিয়েই সে প্রাণরস আহরণ করে। প্রত্যেক নৃ-গোষ্ঠীই মহামারী, দুর্ভিক্ষ, দুর্বিপাক, অভাব-অনটন, প্রাকৃতিক প্রতিকূলতাকে অগ্রাহ্য করে যুগান্তব্যাপী টিকে থাকার চেষ্টা করে । বীরভূম ও তৎসংলগ্ন বিভিন্ন আদিবাসী অন্ত্যজ সমাজও একইভাবে অস্তিত্ব রক্ষা করেছে তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি তথা সংস্কার, কুসংস্কার ও লৌকিক বিশ্বাসের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ ক'রে। তারাশঙ্কর আদিবাসীদের সংস্কৃতির ঘনিষ্ঠ দ্রষ্টা। সংস্কৃতিই-যে কোনো জাতির প্রাণশক্তি, সে কথাই তারাশঙ্কর বিভিন্ন কৌম সংস্কৃতির সাহিত্যিক রূপায়ণের মধ্য দিয়ে প্রমাণ করতে চেয়েছেন।

কাহার সম্প্রদায় চন্দ্রবোড়া সাপের শিস দেওয়াটাকে তাদের কর্তাবাবা কালারুদ্রর রুষ্ট হয়ে কোপাই-এর কুল ছেড়ে যাওয়ার অশনি সংকেত রূপে কল্পনা করেছে। কালারুদ্র কেন্দ্রিক এই লৌকিক বিশ্বাসই হয়ে উঠেছে এক কৌম জীবনকাঠামোর মুখ্য অবলম্বন। *হাঁসুলী বাঁকের উপকথা* (১৯৪৬-৪৭) জুড়ে আদিবাসী কাহার জনগোষ্ঠীর নানা উপকথা ছড়িয়ে আছে। লৌকিক বিশ্বাস, কুসংস্কার, পালা-পার্বণ ও উৎসব-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয় কাহারদের জীবন প্রবাহ। রাঢ় বাংলার আদিবাসী সংস্কৃতির প্রায় পুরোটাই লৌকিক বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। তাদের সামাজিক আর্থনীতিক জীবনকেও নিয়ন্ত্রণ করেছে ধর্মীয় বিশ্বাস আর বিভিন্ন কুসংস্কার। কৃষি-নির্ভর আদিবাসী সমাজের গৃহস্থালি কাজ-কর্মের মধ্যেও এসব লোকবিশ্বাসের ব্যাপক প্রভাব বিদ্যমান। আদিবাসী সম্প্রদায়ের বেশিরভাগই কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত। এছাড়াও রয়েছে নানা বিচিত্র পেশার মানুষ। এদরে কেউ কেউ সাপখেলা দেখায়, কেউ পাল্কী বহন করে, কেউ বাদর নাচায়, যাদু দেখায় ও গান গায়। কারো রয়েছে স্থায়ী ঘর, আবার কেউ যাযাবর জীবন যাপনে অভ্যস্ত। কাহার আর সাঁওতালদের মূল পেশা কৃষিকর্ম। কাহাররা কৃষির পাশাপাশি পাল্কীও বহন করে, কিন্তু সাঁওতালরা মূলত কৃষি শ্রমিক। আদিবাসীদের ঘর-দোর কাঁচা, খড় বা পাতায় ছাওয়া। আর বেদে সম্প্রদাযের বেশিরভাগেরই বসবাস নৌকায় । এরা মূলত যাযাবরস্বভাবী। আদিবাসীদের জীবনের বড় অংশ জুড়ে রয়েছে নাচ-গান-পানাহারের ভূমিকা। তাদের জীবনের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত বিভিন্ন ধরনের পূজা-পার্বণ ও অনুষ্ঠান। এদের প্রায় সবই ভয় আর লৌকিক বিশ্বাস উদ্ভূত। বছরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পূজা অনুষ্ঠান পালন করে তারা। তাদের আর্থনীতিক জীবন যতই বিপর্যস্ত হোক না কেন এ-সকল কৌম জীবনাচরণের আয়োজন বরাবরই ব্যাপক। এ-সব বিষয় আকৃষ্ট করেছিল তারাশঙ্করকে। আর এ-জন্যই তিনি আদিবাসীদের জীবন, ধর্ম, দেবতা, ভাষা, বিশ্বাস, পেশা এবং ভূত- দৈত্য-দেও-দানব পরিবেষ্টিত জীবনরূপকে নিপুণতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন তাঁর সাহিত্যে।

তারাশঙ্কর আদিবাসীদের মধ্যে বেদে সম্প্রদায়ের জীবনাচার ও তাদের সংস্কৃতির প্রতি গভীরভাবে অনুরক্ত ছিলেন। তাই বেদেদের লৌকিক জীবনের নানা কথা, উপকথা, ইতিকথা, বিশ্বাস, সংস্কার, কুসংস্কারের কাহিনী নিয়ে রচনা করেছেন বিশিষ্ট কয়েকটি গল্প ও উপন্যাস।[১৪] রাঢ় অঞ্চল সর্পসংকুল ছিল বলে বেদেদের আনাগোনা এখানে অধিক। বেদে জীবনের খুঁটিনাটি তারাশঙ্কর শৈশবকাল থেকেই জানার

Dhaka University Institutional Repository

চেষ্টা করেছেন। সে সুযোগও তাঁর ছিল। তারাশঙ্করের শৈশব কালে তাঁর গ্রামে নানা জাতের বেদেরা আসত। এদর কেউ কেউ সাপ ধরত, খেলা দেখাত, ভিক্ষা করত, নাচ-গান করত। এদের কারো কারো সঙ্গে তারাশঙ্করের সখ্যও ছিল ; পরবর্তীকালে তাদেরই কয়েকজন তাঁর রচনায় জীবন্ত হয়ে উঠে এসেছে।[১৫] তাদের জীবনের আশ্চর্য সব সংস্কার-কুসংস্কার সুনিপুণ দক্ষতায় প্রাণবন্ত রূপ লাভ করেছে তাঁর গল্প উপন্যাসে।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় আদিবাসী মানুষের লৌকিক বিশ্বাস আর সংস্কার-কুসংস্কারভিত্তিক জীবনকে শৈল্পিক মহিমা দান করেছেন তাঁর কথাসাহিত্যে। তিনি লোকায়ত জীবনের প্রেক্ষাপটে আদিবাসী মানুষের জীবন সংগ্রামের কাহিনীকেই রূপদান করেছেন। আদিবাসীদের সঙ্গে মিশে তাদের ভাষা, জীবনাচার, সুখ-দুঃখ, ভয়-বিশ্বাস, দৈবকল্পনা, পেশা, আর্থনীতিক অবস্থা, সামাজিক প্রথা ও বিধি নিষেধকে তিনি শিল্পরূপ দিয়েছেন।

তথ্যনির্দেশ

১ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়; *আমার কালের কথা*, তারাশঙ্কর রচনাবলী, দশম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃ. ৪৩৮-৩৯

২ "রাঢ়ে দীর্ঘকাল থেকেই বহু অনার্য উপজাতি বাস করে এসেছে। তার পশ্চিম সীমান্তে রাজমহল এবং দক্ষিণ পশ্চিমে ছোটনাগপুর। এই দুই পার্বত্য ও অরণ্য অঞ্চলের অধিবাসীরা আগে রাঢ় দেশের সমতল ভূমিতে বাস করত। তাদের একটা প্রধান অংশ রাঢ় অঞ্চলে বাস করে আসছে।"
শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য; "তারাশঙ্কর ও রাঢ়ের লোকসংস্কৃতি", ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত), *তারাশঙ্কর: সমকাল ও উত্তরকালের দৃষ্টিতে*, প্র. প্র. মাঘ ১৪০৫, রত্নাবলী, কলকাতা, পৃ. ৪২

৩ দ্র. আদিত্য মুখোপাধ্যায়; *তারাশঙ্কর: সময় ও সমাজ*, কলকাতা, পৃ. ১০৮

৪ *আমার কালের কথা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০১

৫ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপধ্যায়; *আমার সাহিত্য জীবন*, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমী সংস্করণ, ১৯৯৭, পৃ. ২০-২৩

৬ *আমার সাহিত্য জীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০

৭ জগদীশ ভট্টাচার্য, "ব্যক্তিগত তারাশঙ্কর"; প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্য (সম্পাদিত), *তারাশঙ্কর: ব্যক্তিত্ব ও সাহিত্য*, নতুন দিল্লী, প্র. প্র. ২০০১, পৃ. ১২

৮ "সেদিনের গ্রামীণ সমাজে সামন্ততন্ত্রের আধিপত্য ছিল। ... গ্রামীণ জীবনের পশ্চাদপদতা, তাদের চিন্তাচেতনায় কুসংস্কারের আচ্ছন্নতা ও আধিপত্য, অভাব-অনটন ও দারিদ্র্য, ব্যাধির প্রকোপ এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয় সব মিলিয়ে সেখানে সীমাহীন দুর্গতি ও অতলান্ত অন্ধকারের রাজত্ব। ওই সমাজে জাতভেদ প্রথা, অস্পৃশ্যতা, নারীর মর্যাদাহীনতা ও লাঞ্ছনা— সামগ্রিকভাবে মানবিক মূল্যবোধের প্রচণ্ড অভাব সেখানকার জীবনকে আষ্টেপৃষ্ঠে ঘিরে ধরেছিল।"
অরুণ চৌধুরী; "তারাশঙ্করঃ সামাজিক বাস্তবতার এক সার্থক রূপকার", *তারাশঙ্কর: সমকাল ও উত্তরকালের দৃষ্টিতে*, প্রাগুক্ত পৃ. ২১৮

৯ "সামন্তশক্তি বনাম ধনতান্ত্রিক শক্তির মধ্যেকার যে শ্রেণীসংগ্রাম তা তারাশঙ্করের অধিকাংশ সৃষ্টির মর্মকথা। অবশ্য তারাশঙ্কর শ্রেণীসংগ্রামের যে মার্কসীয় তত্ত্ব তাতে বিশ্বাসী ছিলেন না। ওই বিশ্বাস না থাকা সত্ত্বেও এক বাস্তবাদী সমাজসচেতন জীবনশিল্পী হিসেবে সার্থকভাবে সমাজের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বগুলিকে সাহিত্যজাত করেছেন।"
অরুণ চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৮-১৯

১০ "প্রথম জীবনে গান্ধীর অহিংসামন্ত্রে উজ্জীবিত তারাশঙ্কর যে জীবনার্থ অন্বেষায় সাহিত্যের পথযাত্রায় পথিক হয়েছিলেন— সুদীর্ঘ পথপরিক্রমায় আত্মদ্বন্দ্বের পীড়ন সত্ত্বেও সমাজ-ধর্ম-রাজনীতি-চিন্তায় পরিশীলিত হয়ে পরিশেষে তিনি হিংসা-মুক্ত ও ঈশ্বরত্বময় সমাজ ও মানুষের কল্যাণী তত্ত্বভূমিতে তাঁর কাঙ্ক্ষিত জীবন-প্রত্যয়ের সন্ধান পেয়েছেন।"
ভীষ্মদেব চৌধুরী; *তারাশঙ্কর সমাজ ও রাজনীতি*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্র.প্র. ১৯৯৮, পৃ. ৬৭

১১ "জাতীয়তাবাদ স্বাধীন দেশের পক্ষে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির পক্ষে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের প্রতীক, প্রগতিশীল শক্তি। কিন্তু তারাশঙ্কর কখেনো এই বিরোধকে কেন্দ্র করে আত্সসচেতন সম্মিলিত মানুষের রক্তাক্ত বিপ্লবী চেতনায় তাঁর কল্পনাকে উদ্দীপিত করতে

Dhaka University Institutional Repository

পারেননি, সংবেদনশীল ও সহানুভূতিপূর্ণ দর্শকের মতো সমস্ত বিরোধ ও পরিবর্তনকে দেখেছেন। আর করুণ বেদনায় অতীতের গ্রামীণ সংস্কৃতির জন্যে অশ্রু বিসর্জন করেছেন একাকী।"বার্ণিক রায়; "তারাশঙ্করের রাজনৈতিক উপন্যাস", উজ্জ্বলকুমার মজুমদার (সম্পাদিত), *তারাশঙ্কর:দেশ কাল সাহিত্য*, পুস্তক বিপনী, কলকাতা, প্র.প্র. ১৯৯৮, পৃ. ১১

[১২] ভীষ্মদেব চৌধুরী; প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭২

[১৩] 'আদিবাসী সম্প্রদায়ের সামাজিক-রাজনৈতিক ইতিহাসের বাস্তবনিষ্ঠ শিল্পরূপ হিসেবে নয়, বরং ঐতিহাসিক রোমান্সরূপেই *অরণ্য-বহ্নির* সাফল্য বিচার্য।'
ভীষ্মদেব চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭২

[১৪] 'ভারতচেতনার যিনি স্বাপ্নিক, তাঁর কাছে আদিবাসীর স্বাধীনতা-স্পৃহা বিচ্ছিন্নতাবাদী মানসিকতারই তুল্য।'
ভীষ্মদেব চৌধুরী, প্রগুক্ত পৃ. ২৭২

[১৫] বেদে সম্প্রদায়কে নিয়ে তারাশঙ্করের সৃজিত গল্প 'নারী ও নাগিনী' (১৩৪১), 'বেদের মেয়ে' (১৩৫৬), 'সাপুড়ের গল্প' (১৩৬৫), 'বেদেনী' (১৩৪৬), 'যাদুকরী' (১৩৪৮); উপন্যাস হচ্ছে *নাগিনী কন্যার কাহিনী* (১৯৬৬)। তারাশঙ্কর লিখেছেন :'রাধিকা বেদেনীর সঙ্গে আমার হৃদ্য একটি সম্পর্ক জন্মেছিল। ... রাধিকার একপিঠ ঘন কালো চুল আর তীক্ষ্ণ চোখ যেন আকর্ষণ করত আমাকে।'
আমার কালের কথা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৮-৩৯

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
কাহার কৌম

আদিম গোষ্ঠীভিত্তিক সমাজব্যবস্থার ক্রমবিবর্তিত রূপ বর্তমান মানবসভ্যতা। প্রজ্ঞা ও মেধাজাত শিক্ষা, প্রযুক্তি ও দর্শনকে স্ব-নৃতাত্ত্বিক অন্তঃস্রোতে বাহিত করে পৃথিবীর উন্নত জাতিগোষ্ঠী নিজস্ব আর্থ-সামাজিক ও মানবিক বৃত্তটিকে বিকেন্দ্রীকৃত ও প্রসারিত করছে যুগ যুগ ধরে। অপরদিকে তথাকথিত পশ্চাৎপদ জাতিসত্তার ধারক তথা আদিবাসীরূপে পরিগণিত জনগোষ্ঠী পার্থিব আধিপত্য বিস্তারের অসম প্রতিযোগিতায় আত্মসমর্পণ করেছে বাধ্য হয়ে। ফলত নিজস্ব নৃতাত্ত্বিক-সমাজতাত্ত্বিক-ঐতিহাসিক স্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে আধুনিক সভ্যতার পৌনঃপুনিক সংঘাত তাদেরকে করেছে গোষ্ঠীগতভাবে আত্মকেন্দ্রিক, তারা হয়ে উঠেছে আদিম সংস্কৃতির ঘেরাটোপে স্বেচ্ছাবন্দি। একদিকে নৃতাত্ত্বিক বিশুদ্ধতা রক্ষার একান্ত বাস্তব দায়বদ্ধতা, অপরদিকে স্বাজাত্য অস্তিত্ব-ধ্বংসের আশঙ্কা এই কৌম গোষ্ঠীসমূহের এক চিরায়ত নিয়তি। যে কোনো আদিবাসী সম্প্রদায়ের সার্বিক পরিচয় অনুধাবনের ক্ষেত্রেই এ দৃষ্টিকোণটি বিবেচনাযোগ্য। অর্থাৎ, পূর্ব-ভারতের সাঁওতালদের ন্যায় বৃহৎ আদিবাসী গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে যেমন এই বিবেচনাটি প্রযোজ্য, তেমনি পূর্ব-ভারতীয় কাহার কিংবা বিষবেদে সদৃশ ক্ষুদ্রতর আদিবাসী গোষ্ঠীসমূহও এই বাস্তবতার ঊর্ধ্বে নয়। এ কারণে উপর্যুক্ত দ্বান্দ্বিক প্রেক্ষাপট থেকেই বর্তমান অভিসন্দর্ভে পূর্বভারতের 'কাহার' নামে পরিচিত ক্ষুদ্র কৌম জনগোষ্ঠীর নৃতাত্ত্বিক-সমাজতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক পরিচয় বিবেচনা করা হবে।

অসংখ্য ভারতীয় আদিবাসীর ক্ষুদ্র একটি শাখা কাহার নৃ-গোষ্ঠী। এরা স্বতন্ত্র কোনো বৃহৎ আদিবাসী সম্প্রদায় নয় বলেই এদের সম্পর্কে বিস্তারিত নৃতাত্ত্বিক বিবরণ তেমন পাওয়া যায়না। তারাশঙ্কর তাঁর *আমার কালের কথা* গ্রন্থে লিখেছেন, 'কাহার বলে কোনো নির্দিষ্ট জাত বাংলাদেশে নেই। হরিজন যাদের বলি আমরা এদের মধ্যে যারা পালকি বয়ে থাকে তারাই বাংলাদেশে কাহার। ধরা যাক বাগদী সম্প্রদায়। বাগদীদের মধ্যে যারা পালকী বয় তারা বাগদী কাহার, যারা বয়না তারা শুধুই কাহার।"[১] তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় রাঢ়ের আদিবাসীদের সম্বন্ধে এত অনুসন্ধিৎসু ছিলেন যে তিনি তাদের নৃ-তাত্ত্বিক, সমাজতাত্ত্বিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন। এ কারণেই আদিবাসী সংক্রান্ত তাঁর প্রদত্ত তথ্য এবং তত্ত্ব গ্রহণীয়। বাংলা ভাষায় রচিত সমাজবিদ্যার নানা শাখার গ্রন্থে আকর-উৎস বিবেচনা করে উপাত্ত হিসাবে তাঁর রচনাংশ উদ্ধৃতির দৃষ্টান্ত সুলভ। কাহারদের সম্পর্কেও তাঁর মতামত, পর্যবেক্ষণ ও বর্ণনা বিশ্বস্ত ও বস্তুনিষ্ঠ। তারাশঙ্কর স্বীকার করেছেন যে, কাহার সম্পর্কিত তথ্য-উপাত্ত যোজনায় ও সামাজিক রীতিনীতির বর্ণনায় তিনি কোথাও অতিরঞ্জন করেননি।[২] 'কাহার নামে ক্ষুদ্র একটি গোষ্ঠী বিহার ও তৎসংলগ্ন পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া, বীরভূম, বাঁকুড়ায় বাস করে। এরা পালকী বহন, ভার বহন, চাষ-বাস ও ভৃত্যের কাজে পারদর্শী। ১৯১১ সালে অভিভক্ত বাংলায় এদের সংখ্যা ছিল ৮৯,৬৯৪;"[৩] শাখা গোষ্ঠী হলেও স্বতন্ত্র নামে চেনা যায়, কাহার নামে এমন একটি গোষ্ঠীর অস্তিত্ব পরিষ্কারভাবেই বিদ্যমান। *The Tribes and Castes of Central Provinces of India* গ্রন্থেও কাহারদের সম্পর্কে তারাশঙ্করের মতের সমর্থন পাওয়া যায়। এই গ্রন্থে কাহারদের বৃহৎ কোনো আদিবাসী গোষ্ঠীর বিচ্ছিন্ন

Dhaka University Institutional Repository

শাখাগোষ্ঠী হিসেবে দেখানো হয়েছে— 'No scientific distinction can be made between the Kahars and Dhimars, both names being applied to the same people. In northern India the term Kahar is generally used.'[৪] উত্তর ভারতে যাদের কাহার বলা হয় অন্যত্র হয়তো তাদের ধীমার বলা হয়। *হাঁসুলী বাঁকের উপকথা* উপন্যাসে হাঁসুলী বাঁক সংলগ্ন মস্তলী ও কাঁদপুর গ্রামে তিনশত জন বাগদী কাহারের বসবাসের কথা তারাশঙ্কর উল্লেখ করেছেন।[৫] এ-সকল উপাত্ত থেকে নিঃসন্দিগ্ধ হওয়া যায় যে, কাহার নামে একটি আদিবাসী কৌম জনগোষ্ঠী ভারতের নানা স্থানে বিদ্যমান ছিল।

আবয়বিক নৃতত্ত্বের (structural anthropology) বিচারে দেখা যায় যে, ভারতে বিচিত্র মানবগোষ্ঠীর সমাগম ঘটেছে। যুগে যুগে ভিন্ন রক্তের মিশ্রণজনিত কারণে তাদের পরিবর্তনও ঘটেছে। ফলে আধুনিক কালে বিভিন্ন কৌমে বিভক্ত ওইসব গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের নৃতাত্ত্বিক পরিচয় নিরূপণ করা সহজসাধ্য নয়। তথাপি নৃতাত্ত্বিকগণ দৈহিক বৈশিষ্ট্যের নিরিখেই জ্ঞাতিত্ব বিচারে ব্রতী হন। নৃতাত্ত্বিকগণ গায়ের রং, মাথার চুল, চোখের রং ও বৈশিষ্ট্য, দেহের উচ্চতা, মুখের গঠন, মাথার আকার, নাকের গড়ন ও রক্তের বিভাজন দ্বারা মানুষের নৃতাত্ত্বিক পরিচয় অনুধাবন করেন।[৬] তবে গাত্রবর্ণের ওপরই তাঁরা বেশি জোর দিয়ে থাকেন। আবয়বিক বৈশিষ্ট্য বিচারে কাহার সম্প্রদায় প্রোটো-অস্ট্রালয়েড বা আদি অস্ট্রাল। কাহারদের গায়ের রং কালো, উচ্চতা মাঝারি, এরা দীর্ঘ শিরস্ক, সুঠাম দেহের অধিকারী এবং প্রচণ্ড পরিশ্রমী। আদি অস্ট্রালদের সঙ্গে এদের যথেষ্ট সাযুজ্য রয়েছে। বলা হয়ে থাকে ভারতের আদি অধিবাসী যারা তারাই আদি অস্ট্রাল।[৭] সমতলে আর্যদের এবং পরে পেশাগত কারণে সভ্য মানুষের সংস্পর্শে বসবাসের ফলে বিভিন্ন রক্তসম্পর্কের মিশ্রণজনিত কারণে এদের মধ্যে আবয়বিক পরিবর্তন হয়েছে অপেক্ষাকৃত দ্রুতগতিতে। তথাপি গোষ্ঠীগতভাবে নিরীক্ষণ করে কাহারদের পৃথকভাবে চিনতে কষ্ট হয় না।

দুই

সাঁওতালদের মতো কাহারদের ক্ষেত্রেও আগমনের উৎসস্থল চিহ্নিত করা সম্ভব হয়না। তবে তারাও অন্যান্য আদিবাসীর মতো ভারতে খুব প্রাচীন। প্রধানত উত্তর ভারতের বিহার এবং পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম, পুরুলিয়া ও বাঁকুড়ায় কাহারদের বসবাস। এসব অঞ্চলে এখনো এদের অস্তিত্ব বিদ্যমান। সাঁওতালদের মতো এরা অরণ্যচারী কিংবা পাহাড়ী- ছিল না। পেশাগত কারণেই তারা উর্বর সমতলভূমিতে বসবাস করত। পেশাগত স্বার্থেই কাহাররা বহু পূর্ব থেকে আর্যদের সংস্পর্শে এসেছিল।

ভারতের পাঁচটি ভিন্ন নরগোষ্ঠীর লোক মোট ১০৫৮ টি মাতৃভাষায় কথা বলে।[৮] এর মধ্যে যারা আদি-অস্ট্রাল গোষ্ঠীভুক্ত তারা 'অস্ট্রিক' ভাষা শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।[৯] কাহার সম্প্রদায়সহ ভারতীয় প্রাচীন অধিবাসীদের প্রায় সবার ভাষাই অস্ট্রিক শ্রেণীভুক্ত। কিন্তু কালপরম্পরায় কাহাররা তাদের ভাষার স্বকীয়তা রক্ষা করতে পারেনি। বিভিন্ন জাতির সঙ্গে সংমিশ্রণের ফলে বর্তমানে বাংলা ভাষার এক অপভ্রংশ রূপ পরিগ্রহ করেছে কাহার ভাষা। উত্তর ও পূর্ব ভারতের কাহার জনগোষ্ঠী হিন্দু ধর্মাবলম্বী। তবে তারা খুব নিচু জাতের, হিন্দু হয়েও সকল দেবতার পূজা করবার অধিকার থেকে বঞ্চিত। উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের কাছে তারা অস্পৃশ্য। কাহারদের ধর্মবিশ্বাস এক অতিলৌকিক জগতের ভয় ও অন্ধ-বিশ্বাস দ্বারা আচ্ছন্ন। হিন্দু ধর্মানুসারী হলেও হিন্দু ধর্মের দেবতাদের পাশাপাশি তাদের রয়েছে নিজস্ব গোষ্ঠী-দেবতা। আর কাহারদের কাছে সেই গোষ্ঠী-দেবতাই অধিক জাগ্রত। শিব 'কালারুদ্র' নামে সর্বশক্তিধর দেবতা হিসেবে কাহার সমাজে পূজিত হন। মনসা ও লক্ষ্মীর প্রতিও তাদের যথেষ্ট ভক্তি। চারপাশের কল্পিত অতিপ্রাকৃত জগৎ সম্পর্কে কাহারদের রয়েছে প্রচণ্ড ভয়কম্পিত শ্রদ্ধা। প্রাকৃতিক

Dhaka University Institutional Repository

বিপর্যয়, দুর্ঘটনা, সর্পদর্শন, অকাল মৃত্যু ও ফসল না হওয়াকে কাহাররা তাদের সমাজের পাপ হেতু দেবরোষ বলেই মনে করে। কৃতকর্মের পারলৌকিক ফলাফলে তারা গভীরভাবে বিশ্বাসী। পূর্বজন্মের আচরিত কর্মের ফল হিসেবেই নিচু কুলে তাদের জন্ম— এ তাদের অনড় বিশ্বাস। পরলোকের প্রতি আস্থাই কাহারদের যাবতীয় কর্তব্য কর্মে প্রেরণা যোগায়। এ কারণে বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কিংবা কোনো মঙ্গল সাধনের লক্ষ্যে তারা গোষ্ঠীদেবতার পূজা-পার্বণ পালন করে। কালারুদ্র কাহারকৌমের প্রধান দেবতা। এই কালারুদ্রই 'বুড়ো শিব' অভিধায় কাহার সমাজে সম্ভাষিত। তিনি জন্ম-মৃত্যু ও যাবতীয় ভাল-মন্দের নিয়ন্তা। আর কালারুদ্রের অনুচর হিসেবে কাহারদের তত্ত্বাবধানের দায়িত্বপ্রাপ্ত 'স্থানীয় দেবতা' বা গোষ্ঠী-দেবতা হচ্ছেন বাবা ঠাকুর। বাবা ঠাকুরকে কাহাররা যথেষ্ট ভয় করে। তাঁর সন্তুষ্টির জন্য অব্যহত থাকে তাঁদের আপ্রাণ প্রয়াস। কাহারদের ধর্ম-বিশ্বাস মূলত অন্ধ-বিশ্বাস আর ভীতি নির্ভর। তাদের ধারণা অপঘাতে মৃত্যু হলে মৃত ব্যক্তির আত্মা ভূত-প্রেত হয়ে আশেপাশে বিরাজ করে এবং অনেক সময় ক্ষতি সাধনও করে। মৃত্যুর পরে কাহারেরা মৃতদেহ দাহ করে। দাহের পদ্ধতি হিন্দুর ধর্মাচারের অনুরূপ। কাহার সম্প্রদায় তাদের চারপাশের বিশেষ গাছ, সাপ, মেঘ, বজ্র, ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদিকে দেবমাহাত্ম্য-যুক্ত বিবেচনায় ভয়মিশ্রিত শ্রদ্ধা পোষণ করে। মোট কথা পারিবেশিক প্রকৃতি এবং অতিলৌকিক জগৎকে অবলম্বন করেই কাহারদের জীবন ও ধর্মবিশ্বাস আবর্তিত।

প্রাচীনকাল থেকেই কাহার জনগোষ্ঠী তাদের দৈহিক শক্তিমত্তার জন্য পালকি বা ভার বহনের মতো কাজে পারদর্শিতা অর্জন করেছিল। নবাবি আমলে নবাবদের অন্তঃপুরের মহিলাদের একমাত্র বাহন ছিল পালকি। কাহাররা নবাবদের বাঁধা বাহক হিসেবে কাজ করত। ইংরেজ আমলেও তাদের প্রাচীন পেশা বজায় ছিল। দৈহিক সামর্থ্যের জন্য ইংরেজ কুঠি পাহারা, ও নীল চাষীদের শায়েস্তা করার জন্য কাহাররা লাঠিয়ালরূপেও নিযুক্ত ছিল। এছাড়া কাহার সম্প্রদায় আবর্জনা পরিষ্কার ও মৃতের সৎকার কাজেও সহায়তা করত। নিচু কুলে জন্ম হওয়ার কারণে এসব কাজ তাদের জন্যই নির্ধারিত বলে তাদের বিশ্বাস। এসব কাজের পাশাপাশি কাহাররা চাষাবাদের কাজেও জড়িত ছিল প্রাচীনকাল থেকেই। নিচু কুলের কৌম জনগোষ্ঠী হওয়ার দরুণ সমাজের উঁচু শ্রেণীর মানুষের সেবা করাকেই পুণ্য কর্ম বলে গণ্য করত তারা। প্রাচীনকালের মতো বর্তমান কালেও কাহারদের মধ্যে গোষ্ঠীগত শ্রম ও আর বেহারা কাহাররা ভার ও পালকি বহনকারী। জমিদারি প্রথা চালু থাকাকালে কাহাররা তাদের কাজের বিনিময়ে জমিদার বা মালিকের কাছে পেত চাষের জন্য সামান্য ভূমি। পরিশ্রমী বলে তারা কৃষিকাজেও যথেষ্ট ভাল ছিল। কাহার সমাজে শ্রমবিভাজনের রীতি বিদ্যমান। যেমন আটপৌরে কাহাররা জমিদার বা কুঠিয়ালদের বাড়িতে নানা কাজে বাঁধা কর্মী হিসেবে খাটে। তাদের নিজেদের ভূমি নেই। জমিদারদের দেওয়া অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট জমি অধিকারে নিয়ে তারা চাষ করে। প্রয়োজনীয় কৃষিজমির অভাবের কারণেই তারা চুরি, ডাকাতি, লুণ্ঠনের মতো অপরাধপ্রবণ কাজের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে নানা সময়। কাহার নারী-পুরুষ একত্র কৃষিক্ষেত্রে কাজ করতে অভ্যস্ত। কাহার মেয়েরা খুব পরিশ্রমী এবং কৃষিকাজেও দক্ষ। মেয়েরা ভদ্রজনের বাড়িতে ঝিয়ের কাজও করে কখনো কখনো। অর্থের বিনিময়ে কাহাররা লাঠিখেলা দেখায়, নাচে, গান করে। এ-সব কাজে তাদের কদরও যথেষ্ট। কাহার জনগোষ্ঠী তাদের পিতৃপুরুষের প্রতিও পরম শ্রদ্ধাশীল। পালকি বহন ও কৃষিকাজ ছাড়া কাহার পল্লির বাইরে অন্য কাজ করাকে তারা জাত-ধর্ম বিসর্জনের সমার্থক বলে মনে করে। কারো বিয়ে বা 'জ্ঞান গঙ্গা যাত্রার'[১০] জন্য ডাক এলে কাহাররা উপেক্ষা করে না। পিতৃপুরুষের পেশা হিসেবে এই দুটো কাজকে তারা কৃষির পাশাপাশি চিরকালই সম্মানের সঙ্গে বহন করে চলতে চেষ্টা

Dhaka University Institutional Repository

করেছে। কৃষিকাজ ছাড়াও কাহার মেয়েরা গরু-বাছুরের জন্য ঘাট-কাটা, ঘুঁটে কুড়ানো এবং দুধ বিক্রির মতো কাজে স্বচ্ছন্দ। মেয়েরা নিজেদের সাজগোজ ও শখ পূরণের জন্য খরচের পয়সা নিজেরাই জোগাতে সক্ষম , এর জন্য পুরুষের মুখাপেক্ষী থাকা তাদের অপছন্দ।

তিন

আর্যরা ভারতবর্ষে আসার পরও বহুকাল পর্যন্ত ভারতের আদিবাসী কৌম সম্প্রদায় আর্য-সংস্কৃতির স্পর্শমুক্ত ছিল। ফলে তাদের সাংস্কৃতিক নিজস্বতা টিকে ছিল দীর্ঘদিন।[১১] আর ভারতীয় প্রতিটি আদিবাসী গোষ্ঠীরই ছিল বিচিত্র সংস্কৃতি। প্রতিটি কৌমে ভিন্ন ভিন্ন পূজা-পার্বণ, খেলাধুলা, উৎসব, সংস্কার, নৃত্য-গীত, বিশ্বাস, বিনোদন ও নানা প্রকার বিধি-নিষেধ ছিল প্রচলিত। কাহার জনগোষ্ঠী নিজেদেরকে হিন্দুদেরই নিম্ন একটি জাত বলে মনে করে। সৎজাতের লোকের সেবার জন্যই তাদের জন্ম হয়েছে বলে তাদের বিশ্বাস। হিন্দুদের জীবন-ধারা ও সংস্কৃতির সঙ্গে তাদের জীবনবৈশিষ্ট্যের যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে। তবে অভিজাত হিন্দু পল্লির পূজা-পার্বণে তারা দূর থেকে কেবল প্রত্যক্ষণের আনন্দই পায়। বর্ণ-হিন্দুর পূজা উৎসবে তাদের স্পর্শ, চলাচল ও অংশগ্রহণ নিয়ন্ত্রিত। তবে নিজস্ব কিছু পূজা-পার্বণ ও অনুষ্ঠানাদির আয়োজন করে তারা। কাহাররা শৈব ; সর্বশক্তিমান কালারুদ্র তথা বুড়া শিবের পূজা কাহার কুলে গাঁজন নামে পরিচিত। চৈত্র সংক্রান্তিতে আয়োজিত হয় এই গাঁজন উৎসব। হাড়ি, বাগদি, ডোম, কর্মকার, তন্তুবায়, কাহার ইত্যাদি ব্রাত্যশ্রেণীর মানুষের প্রবল শ্রদ্ধামিশ্রিত এই গাঁজন উৎসব। চৈত্রের শেষ দিনে কাহার সম্প্রদায়ের গাঁজনের ভক্তা বা সন্ন্যাসীরা 'বান গোসাই'[১২] নিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে ভিক্ষা সংগ্রহ করে। চৈত্র সংক্রান্তির দিনে তারা দীর্ঘ সংযমের পর ভিক্ষালব্ধ খাদ্য-উপকরণ ভোজন করে আনন্দের সঙ্গে। কালারুদ্রের শিষ্য ও অনুচর কর্তা ঠাকুর। কাহারদের সার্বিক রক্ষণাবেক্ষণে ইনি সদানিয়োজিত। এই কর্তাঠাকুর কাহার সম্প্রদায়ে অত্যন্ত গুরুত্ব ও শ্রদ্ধার সঙ্গে পূজিত হন। যে-কোনো বিপদের আশঙ্কায় কিংবা শুভ সংবাদ প্রাপ্তির আনন্দে তারা কর্তাঠাকুরের আসনে পূজা দেয়। কাহারদের এসব পূজা-পার্বণের মূল ভিত্তি হল তাদের অতিলৌকিক ধর্মবিশ্বাস উদ্ভূত জীবনধারা। কর্তাঠাকুরকে কেন্দ্র করেই অনুষ্ঠিত হয় তাদের অধিকাংশ পূজা-পার্বণ ও উৎসব। এছাড়া কাহার সম্প্রদায় মনসার পূজাতেও অভ্যস্ত। সাপকে তারা কর্তাঠাকুরের বাহন মনে করে। আশ্বিন মাসে কাহাররা ইঁদ পূজা বা ইন্দ্র পূজা করে। তাদের সবচেয়ে বড় উৎসব নবান্ন উৎসব। ফসল ওঠার পর তারা গোষ্ঠীর সমৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষায় জমকালোভাবে এ উৎসব উদ্‌যাপন করে। এই উৎসবেই পরের বছর ভাল ফসলের জন্য তারা গোষ্ঠীবদ্ধভাবে প্রার্থনা জানায়। গাঁজনের উৎসবের একটা বড় অঙ্গ হল চড়ক পূজা। এই পূজায় চড়ক পাঠা নামক লোহার কাঁটাযুক্ত কাঠে শিবভক্ত কোনো কাহার শুয়ে থেকে সমগ্র কৌমের জন্য প্রার্থনা জানায়। গ্রামপ্রধানই এক্ষেত্রে চড়কের পাঠায় ওঠার অধিকারী। এছাড়া কাহার সংস্কৃতির বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে ঘেটু [১৩] পূজার স্থান। ঘেটুকেও তারা গাঁজনের অঙ্গরূপে বিবেচনা করে। ঘেটু পূজায় কাহারেরা ঘেটু গানের আসর বসিয়ে নাচ, গান ও নৃত্য করে। এসব গানে তাদের সমসাময়িক জীবনের প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে। ঘেটু গান কাহার সংস্কৃতির ভিন্ন একটি রূপকে অভিব্যক্ত করে।

কাহারদের উদ্দাম-উল্লাসময় আরেকটি পর্ব হল 'ভাঁজো পরব'[১৪]। লতা পাতা ফুল দিয়ে ভাঁজো দেবীর আদল তৈরি করে জ্যোৎস্না রাতে মেয়ে-পুরুষ মিলে মদ্যপান করে নাচ-গানে মেতে ওঠা ভাঁজো পর্বের প্রধান আকর্ষণ। ওই দিনটিতে নারী-পুরুষের জন্য সামাজিক অনুশাসনের রক্তচক্ষু অনেকটা শিথিল থাকে। ভাঁজো পূজায় মেয়ে-পুরুষের কিছু ব্রত পালনের রেওয়াজও আছে। ভাঁজো পর্বের পরের দিন পালের গরু-বাছুরগুলোকে তারা মুক্ত রাখে। পর্বের রাতে পূর্ণবয়স্ক কাহারদের ঘুমানো বারণ। পরের দিন মেয়েরা শালুক ফুলের মালা আর সিঁদুরের

Dhaka University Institutional Repository

টিপে সাজিয়ে ভাঁজো সুন্দরীকে নদীতে ভাসিয়ে দিয়ে স্নান করে ঘরে ফিরে আসে। এ-ছাড়াও কাহার সমাজে ষষ্ঠীপূজা, মঙ্গলচণ্ডী ও জলশয়ান পূজা প্রচলিত। বার্ষিক নিয়মিত পূজা-পার্বণ ও উৎসবানুষ্ঠানের বাইরেও কাহার গোষ্ঠীর নানা অনুষ্ঠান লেগেই থাকে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়, সামাজিক অন্যায় অপরাধের প্রায়শ্চিত্তের জন্যও পূজার প্রচলন রয়েছে কাহার সমাজে। তাদের বিশ্বাস অপঘাতে মৃত ব্যক্তির আত্মা ভূত-প্রেত হয়। এদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কাহাররা পূজা করে। এমনকী ভাল ফসলের প্রত্যাশায় এবং কুলের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় বাবা ঠাকুরের উদ্দেশে কাহারেরা পূজা দেয়। ওই পূজা অনুষ্ঠিত হয় বাবা ঠাকুরের আসনে হাঁস বা পাঁঠা বলির মাধ্যমে।

চার

সামাজিক বন্ধন ও শৃঙ্খলা কঠোর হলেও কাহার নারী-পুরুষের যৌন জীবন কিছুটা শিথিল। তবে কাহার নারীরা সাধারণত সতীনের ঘর করে না। পূর্বের স্ত্রীই প্রযোজ্য ক্ষেত্রে স্বামীর ঘর ছেড়ে চলে যায়। কাহার মেয়েরা সৌন্দর্যপ্রিয়। সাজগোজের প্রতি তাদের ঝোঁক প্রবল। নিজেদের ঘর দোর পরিচ্ছন্ন রাখতে তারা অত্যন্ত আন্ত রিক। কাহারদের বিয়ের অনুষ্ঠানগুলোতেও বেশ আনন্দ হয়ে থাকে। কাহার মেয়েরা নৃত্য-গীত ও মদ্যপানের মাধ্যমে আনন্দ যাপন করে।

সারাদিন পরিশ্রমের পরে রাতে নাচ গান ও মদ্যপানের মাধ্যমে আনন্দ যাপন কাহারদের প্রাত্যহিক জীবনের অঙ্গ। অল্প বয়সের ছেলেরা অবসরে শিকার বা ডাংগুলি খেলায় মেতে ওঠে। লাঠি খেলার মাধ্যমে শারীরিক কসরৎ প্রদর্শনেও আগ্রহ আছে কাহার পুরুষদের। তাদের মধ্যে বহু কুসংস্কারও প্রচলিত। অন্ধবিশ্বাসের এক অন্ধকার জগতে সর্বক্ষণ তাদের বিচরণ। বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যই তাদের সব আচার-উপচার পরিচালিত ও ব্যবহৃত হয়। কাহারদের সমাজে অনেক বাধা নিষেধও বিদ্যমান। তাদের সমাজের বাইরে নিজস্ব পেশা ছাড়া অন্য কোনা কাজ করা নিষিদ্ধ। এতে জাত ধর্ম নষ্ট হয় বলে তাদের গোষ্ঠীগত বিশ্বাস। পূর্বপুরুষ যা করেনি, এমন কাজ কাহাররা সাধারণত করে না। কাহার পাড়ায় পাকা ঘর নির্মাণ করা নিষিদ্ধ। তাদের ধারণা এতে গ্রামে অমঙ্গল নেমে আসে।

পাঁচ

অন্যান্য আদিবাসী কৌমের মতো কাহারদের সমাজেও গ্রাম-প্রধান বা গোত্র-প্রধান প্রথা প্রচলিত। গোত্র প্রধানকে ঘিরেই কাহারদের যাবতীয় জাগতিক কর্ম আবর্তিত হয়। গোষ্ঠীকেন্দ্রিক সবকিছু নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব গোত্র প্রধানের। কৌমের জাগতিক ভালমন্দ দেখার দায়িত্বও তার। পূজা-পার্বণ উৎসব থেকে শুরু করে আনুশাসনিক কর্মধারা গোত্রপ্রধানের নেতৃত্বেই পরিচালিত হয়। প্রাচীনকাল থেকেই কৃষিজীবী কাহার জনগোষ্ঠী ক্ষুদ্র পরিসরে চাষাবাস নিয়েই নিস্তরঙ্গ জীবন যাপন করে। বাইরের সমাজের কোনো ঘটনা তাদের সমাজজীবনে আলোড়ন তোলে না। রাঢ়ের রুক্ষ কাঁকড় মিশ্রিত লাল মাটি যেমন গ্রীষ্মে শুকিয়ে যায়, আবার সামান্য জলধারায় ফসলের প্রাচুর্য আনে, তেমনি এ রুক্ষ মাটির সাথে নিয়ত সংগ্রাম করে যুগ যুগ ধরে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রেখেছে কাহার জনগোষ্ঠী।

কাহারেরা নিজস্ব জগতের বাইরে কিছু ভাবতে অভ্যস্ত নয়। তাদের সীমায়িত বিচরণক্ষেত্রই তাদের পৃথিবী। কাহাররা স্বীয় সমাজ বহির্ভূত বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। অর্থনীতি, রাজনীতি, স্ব-অধিকার সম্পর্কিত যৌক্তিক কার্যকারণ বিষয়ে তারা উদাসীন। এসব বিষয় তাদের জীবনধারায় প্রভাব ফেললেও তারা এ-সবের কারণ

Dhaka University Institutional Repository

অনুসন্ধানে উৎসাহ দেখায় না।। তবু বৈশ্বিক ও দৈশিক আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ক্রমে তাদের জীবনধারাকে পর্যুদস্ত করেছে। সরল এ জনগোষ্ঠীর জীবনধারণের চাহিদাও সামান্য। খেয়ে-পড়ে কোনো প্রকারে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারলেই তারা সন্তুষ্ট। অপেক্ষাকৃত ভদ্র জনগোষ্ঠী যুগ যুগ ধরে তাদের স্বীয় স্বার্থ ও বিলাসের জন্য কাহারদের ব্যবহার করেছে। পালকি বাহক হিসেবে বাঁধা রাখার জন্য ভদ্রশ্রেণীর মানুষ নিম্নমানের সামান্য জমি দিত তাদের। মোঘল ও ইংরেজ শাসনের প্রথম দিকে ওই জমিটুকুর ওপর নির্ভর করেই কাহাররা কোনো ক্রমে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছিল। ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তন হলে নব্য জমিদাররা তাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তায় পরিণত হয়। ওই সময় থেকেই মূলত আদিবাসীরা এ-সব জমিদারের ইচ্ছা-অনিচ্ছা ও খেয়াল খুশির শিকারে পরিণত হয়। তবে বীরভূমের জমিদারির একটা ভিন্নতা ছিল। জমিদারের সংখ্যা ছিল অধিক কিন্তু জমিদারির আয়তন ও আয় ছিল ক্ষুদ্র। তবে আয়ের স্বল্পতা থাকলেও পরাক্রম ও সমারোহ ছিল প্রবল। পুঁজিবাদী নব্য ধনিকশ্রেণীর উত্থানের ফলে রাঢ়ের আদিবাসী অঞ্চলেও জমিদার বনাম ধনিক শ্রেণীর সংঘাত অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। এতে জমিদারির বৃহদংশ বণিক শ্রেণীর করায়ত্ত হয়। ভূমির মালিকানা পরিবর্তনের ফলে কৃষিজীবী কাহাররাও কর্ষণযোগ্য জমি হারায়। কেননা, নতুন প্রভূরা ওইসব ভূমিকে কৃষিকাজে ব্যবহারে উৎসাহী ছিল না। ফলে অধিকার সচেতন না হওয়ার কারণে সংখ্যালঘু কাহার গোষ্ঠী ভূমিচ্যুত হতে থাকে। নব্য ধণিকশ্রেণী ভূস্বামী হয়ে তাদের ভূমিতে শিল্প ব্যবসায় ও কলকারখানা তৈরিতে অধিক আগ্রহী হয়। ফলে কাহারদের চাষের জমিতে কলকারখানা স্থাপিত হতে থাকে। কৃষিজমি বন্দোবস্ত প্রাপ্তির প্রতিযোগিতায় কাহাররা ভদ্র হিন্দুদের সঙ্গে কুলিয়ে উঠতে পারে না। ফলত ত্রুটিপূর্ণ ভূমি ব্যবস্থায় কাহাররা কৃষিজীবী হয়েও ভূমির স্বত্ব লাভে বঞ্চিত হতে থাকে। একই কারণে কৃষি উৎপাদনেও প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়। বিভিন্ন সময়ের প্রাকৃতিক দুর্যোগ[১৫] রাঢ়ের কৃষি অর্থনীতি তথা কাহারদের জীবনে বিপর্যয় নিয়ে আসে। স্ব-পেশা ও স্ব-ভূমির ওপর নির্ভরতা হারিয়ে কাহাররা অস্তিত্ব সংকটের মুখোমুখি হয়।

ছয়

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় পুঁজিবাদী শ্রেণীর উদ্ভব ও যুদ্ধজনিত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকটে কাহারদের জীবনেও হতাশা ও যন্ত্রণা নেমে আসে। তারা জমিদার ও পুঁজিবাদী শ্রেণীর শোষণের শিকার হয়। আর্থনীতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন জড়িত। রাঢ় বাংলার স্থানে স্থানে কৃষির পরিবর্তে শিল্পের প্রসারজনিত ভূমির মালিকানা পরিবর্তনের সূত্রে কাহারদের মনিব পরিবর্তন হয়েছে ঘন ঘন। নতুন পুঁজিবাদী মনিবের অধিকাংশই কৃষিভূমিতে শিল্প ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান স্থাপনে আগ্রহী ছিল। ফলে কৃষিজীবী কাহাররা কৃষিভূমি থেকে উৎখাত হতে থাকে। এভাবেই স্বীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্যে লালিত কৃষিজীবী কাহারদের জীবন বিপন্ন হয়ে পড়ে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে কাহারদের জীবনে যে সামাজিক ও আর্থনীতিক পরিবর্তন সূচিত হয়, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের করাল গ্রাসে তা চূড়ান্ত রূপ পায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ কাহারদের অস্তিত্বে সরাসরি আঘাত হানে এবং তারা স্ব-স্থান থেকে উন্মূলিত হতে থাকে। এই মহাযুদ্ধের ভয়াল তরঙ্গাভিঘাতে কৃষিজীবী কাহাররা নির্বাসিত হয় স্ব-ভূমি ও স্ব-সংস্কৃতি থেকে। যুদ্ধের ভয়াবহ সংকটকালীন সময়ে সবাই অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে লিপ্ত হয়। এ-সময় দেশ-পরিব্যাপ্ত নৈতিকতা, মানবিকতা ও মূল্যবোধের অবক্ষয় কাহারকুলকেও গ্রাস করে। ধনিক-বণিক সুদখোর মহাজন শ্রেণীর শোষণে কাহাররা হৃত-সর্বস্ব হয় ইতিহাসের এই কাল পর্বেই। ফলে বাঁচার তাগিদে গণ্ডিবদ্ধ জীবনের বাইরে পা বাড়াতে বাধ্য হয় তারা। কৃষিজীবী কাহাররা বাধ্য হয়ে ভিন্ন জীবনে প্রবেশ করে স্বীয়

Dhaka University Institutional Repository

জীবনধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ফলত শিল্প কারখানার শ্রমদাসে পরিণত হয় তারা। *হাঁসুলী বাঁকের উপকথা* উপন্যাসে কাহারদের জাতিগত এই ট্রাজেডির জীবনচিত্র শিল্পিত হয়েছে।

রাঢ়ের আদিবাসী অঞ্চলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের রসদ সংগ্রহের জন্য ব্যাপক হারে বাঁশ ও বৃক্ষ নিধনের ফলে কাহাদের গ্রাম উজাড় হয়ে পড়ে। যুদ্ধের প্রয়োজনেই নতুন রাস্তা নির্মাণ এবং যুদ্ধ-বিমানের ঘাঁটি তৈরির জন্য জমি অধিগ্রহণের শিকার হয় কাহার পল্লি। আর এভাবেই সম্পূর্ণ অনিকেত আদিম মানুষে পরিণত হয় কাহার জনগোষ্ঠী। '— এভাবেই উপকথা-সংসক্ত কাহার জীবন ভূমি-উৎকেন্দ্রিক হয়ে সমাজগতি-ইতিহাসের বড় নদী বা মূল ধারায় সমর্পিত হয়েছে। পিতৃপুরুষের উত্তরাধিকারবাহী প্রত্নপ্রতিমাতুল্য কাহারদের জীবনবেদ-এর এই বিপর্যয়, তাদের স্বসমাজের জন্য আত্মঘাতী স্বরূপ হলেও, সামাজিক রূপান্তরের সর্বমানবিক সদর্থকতায় এটি ইতিহাসেরই অনিবার্য উত্তরণ' [১৬]। আদি পেশা পালকি বহন, লাঠিখেলা ছেড়ে এরা চাষাবাদে পুরোদস্তর মনোনিবেশ করেছিল তাদের জীবন-ইতিহাসের মধ্যস্তরে এসে। কিন্তু পুঁজিবাদী বিশ্বের আগ্রাসনের শিকার হয়ে কাহার জনগোষ্ঠী ভূমিচ্যুত হয়। হাজার বছর ধরে আঁকড়ে থাকা পেশা কৃষিকে পরিত্যাগে বাধ্য হয়ে কাহার সম্প্রদায় শিল্প-শ্রমিকের আত্ম-পরিচয়ে এখনো বেঁচে আছে। নিতান্ত বেঁচে থাকার জন্যই ক্ষুদ্র এই আদিবাসী জনগোষ্ঠী জাতিগত ঐতিহ্য ও প্রথা ত্যাগ করে স্ব-ভূমি ও স্ব-ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। এভাবেই স্বতন্ত্র একটি কৃষিজীবী কৌমসমাজ স্বীয় পেশা ও সমাজ থেকে ছিটকে পড়ে এবং হারিয়ে ফেলে নিজস্ব সংস্কৃতি। কালিক বিবর্তন ধারায় পুঁজিবাদী সমাজের কৃষিবিমুখতা এবং শিল্পের প্রতি আগ্রহই কাহারদের জীবিকা পরিবর্তনে বাধ্য করেছে। এই গতিধারাকেই ত্বরান্বিত করেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। ফলত একটি আদিবাসী গোষ্ঠী সভ্যতার যান্ত্রিক স্পর্শে আজ বিচ্ছিন্ন , ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। পূর্ব-ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে **এখনও** যে-সব কাহার বা যে-সব কাহারপল্লি খুঁজে পাওয়া যায়, সে-সব পল্লির জনতা গাত্রবর্ণে কাহার হলেও আর্থনীতিক ও বৈরীসংস্কৃতির আগ্রাসনে স্বকীয়তা বিবর্জিত, বিক্ষিপ্ত-বিচ্ছিন্ন শ্রমদাস মাত্র।

তথ্যনির্দেশ

১ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়; *আমার কথা*, ১৪০২, অনামিকা পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃ. ৩৪

২ *আমার কথা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪

৩ 'লোক সংস্কৃতি গবেষণা' (ত্রৈমাসিক পত্রিকা) ; সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি ক্ষেত্র গুপ্ত ; সম্পাদক : সনৎকুমার মিত্র, প্রকাশক : লোক-সংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ, প্রকাশকাল : কার্তিক-পৌষ ১৪০৪, পৃ. ৩১৩

৪ Russell, R.V.: *The Tribes and Castes of the Central Provinces of India*, Vol-iii, Cosmo Publications, Delhi, p. 291

৫ দ্র. 'লোক সংস্কৃতি গবেষণা', পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১৩

৬ কোনো একটি বিশেষ দিকের উপর নির্ভর করে নৃতাত্ত্বিক পরিচয় পাওয়া সম্ভব নয়। আবয়বিক সব লক্ষণের সমষ্টিগত ফলাফলের উপর নির্ভর করতে হয়। ড. অতুল সুর; *ভারতের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়*, ১৯৮৮, সাহিত্যলোক, কলকাতা, পৃ. ৫৪

৭ ড. অতুল সুর; প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪

৮ ড. অতুল সুর; প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬

৯ ড. অতুল সুর; বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, ১৯৭৭, জিজ্ঞাসা, কলকাতা, পৃ. ৯

১০ কাহাররা হিন্দু ধর্মাবলম্বী হলেও তাদের স্বতন্ত্র কিছু বিশ্বস ও আচার বিদ্যমান। এ-কারণেই হিন্দু হয়েও হিন্দুদের থেকে কিছু ভিন্নতা কাহার-সমাজে রয়েছে।

১১ আর্য সংস্কৃতি যেমন পরবর্তীকালে আদিবাসী সংস্কৃতিকে প্রভাবিত ও বিবর্তিত করেছে। তেমনি আদিবাসী সংস্কৃতিও আর্য সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করেছে।
ড. অতুল সুর; *ভারতের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪

Dhaka University Institutional Repository

[১২] 'বান গোসাই' একজন শিবভক্ত। শিবের কাছে তিনি বর চেয়ে নিয়েছিলেন নিচুকুলের মানুষরাই গাজনের পূজায় আংশ নিবে।

[১৩] *গণদেবতায়* লেখক ঘন্টাকর্ণ বা ঘেঁটু পূজাকে গাঁজনের অঙ্গরূপে বর্ণনা করেছেন। তাঁর ধারণা 'বসন্ত রোগ-নিবারক মহাবল ঘন্টাকর্ণ' ও এই বিষ্ণুদ্বেষী, শিবভক্ত পিশাচ ঘেঁটু পৃথক দেবতা। কিন্তু বাস্তবিক অর্থে চর্মরোগের দেবতা ঘন্টাকর্ণই নিম্নজাতীয় বাঙালির আরাধ্য ঘেঁটু। কাহাররা তারই পূজা করে।
দ্র. রঞ্জিতকুমার মুখোপাধ্যায়; *তারাশঙ্কর ও রাঢ় বাংলা*, প্র. প্র. ১৯৮৭, নবার্ক, কলকাতা, পৃ. ৮১

[১৪] অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'বাংলার ব্রত' গ্রন্থে ভাঁজো নামান্তরে শালপাতার ব্রতকে বিশেষভাবে বর্ধমান জেলার মেয়েদের একটি ব্রত বলেছেন। এটি ভাদ্র মাসের মন্থন ষষ্ঠীতে আরম্ভ হয় শুক্লা দাদশীতে শেষ হয়। তারাশঙ্করের উপন্যাসে দেখা যায় বীরভূমের বাগ্দী, কাহার, ডোম, হাড়ি, বায়েন ইত্যাদি নিম্নশ্রেণীর মানুষেরা ভাঁজো সুন্দরীর পূজা করে। মেয়েরা শস্য ভিজিয়ে রেখে কয়েকদিন এতে পানি দেয়, অঙ্কুরিত হলে সৌভাগ্যের লক্ষণ রূপে ধরা দেয়। দ্র. রঞ্জিতকুমার মুখোপাধ্যায়; প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩

[১৫] ইঁদ পূজা রাঢ়ের নিজস্ব একটি পরিচিত উৎসব। অমলেন্দু মিত্র তাঁর রাঢ় সংস্কৃতির আলোচনায় বীরভূমের সিউরী থানার কোমা গ্রামে বারোয়ারী ইন্দ্র পূজার উল্লেখ করেছেন। এই ইঁদ বা ইন্দ্র পূজার প্রাচীন নাম শক্রধ্বজোত্থান উৎসব। দ্র. রঞ্জিতকুমার মুখোপাধ্যায়; প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২-৮৩

১৬ বীরভূমে ১৯০১ থেকে ১৯৫০ পর্যন্ত পঞ্চাশ বছরে বন্যা হয়েছে চার বার, আর এই সময়ে অনাবৃষ্টি হয়েছে সাত বার। দ্র. রঞ্জিতকুমার মুখোপাধ্যায়; প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
বেদে কৌম

আর্যদের আগমনের পূর্ব থেকেই অসংখ্য বিচিত্র আদিবাসী সম্প্রদায়ের বসবাস ছিল ভারতীয় উপমহাদেশে। আর্য-আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই ওইসব আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে নবাগত সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে অসম সংঘর্ষে লিপ্ত হতে হয়েছে। বহু বিচিত্র ওইসব গোষ্ঠীর মধ্যে বেদেরা অন্যতম। ভারতীয় উপমহাদেশে যত আদিবাসী গোষ্ঠী আছে তার মধ্যে বেদে সম্প্রদায় অনন্য স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত জনগোষ্ঠী।

রাঢ়-অঞ্চলের অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষের জীবনের রূপায়ণ ছিল তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্যতম অন্বিষ্ট। সাঁওতাল, কাহার, হাড়ি, বাগদী, ডোম ইত্যাদি বিভিন্ন প্রান্তিক মানুষের জীবনঘনিষ্ট শব্দচিত্র তিনি অঙ্কন করলেও বেদে সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁর আগ্রহ ও আকর্ষণ ছিল সর্বাধিক। বেদে সম্পর্কিত তাঁর প্রদত্ত তথ্য এবং পর্যবেক্ষণ একজন অধ্যয়ননিষ্ঠ নৃতাত্ত্বিকের বর্ণনা-বিশ্লেষণের মতো নির্ভরযোগ্য বলে প্রতীয়মান হয়। তারাশঙ্কর যে-সব আদিবাসী গোষ্ঠীজীবনের সাহিত্যরূপ দিয়েছেন এদের মধ্যে একমাত্র বেদেরাই যাযাবর গোষ্ঠীর অন্তর্গত। তারা নিজেদের কৌম সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্যের কারণেই নির্দিষ্ট একটি স্থানে স্থায়ীভাবে বসবাস করে না। তাদের গোষ্ঠীগত অন্তর্বিভাগও বিচিত্র, যেমন: মালবেদে, মাঝিবেদে, ইসলামি বেদে, বিষবেদে প্রভৃতি।

বাংলার বেদে নামক ভ্রাম্যমাণ কৌমজাতির বৈশিষ্ট্য নিরূপিত হয়েছে এভাবে : 'They are jugglers, fortune tellers, rope dancers, beggers, wanderers and bird-killers.'[১] ১৯০১ সালের সেন্সাস রিপোর্টে বাংলা ও বিহারের এই বেদেদের Gipsies, Acrobats ইত্যাদি পরিচয় উল্লেখ করা হয়েছে। তারাশঙ্করের সাহিত্য রচনার প্রারম্ভ কালেই বেদেগোষ্ঠী ক্রমশ বিলুপ্তির দিকে যাচ্ছিল। সাঁওতাল ও কাহারদের মত বেদেদের নৃতাত্ত্বিক পরিচয় বিশ্লেষণের জন্যও তাদের দৈহিক অবয়বের উপরই নির্ভর করতে হবে। দৈহিক দিক বিচারে বেদেগোষ্ঠী আদি অস্ট্রাল বংশোদ্ভূত। বেদেদের গায়ের রং গভীর কালো, চুল কোকড়ানো এবং ঢেউ খেলানো। তাদের দৈহিক গঠন সুঠাম, উচ্চতা মাঝারি ধরনের, চোখ আয়ত ও কৃষ্ণ। এ-সব দৈহিক লক্ষণ আদি-অস্ট্রালদেরই পরিচয়বাহী।

বেদেরা যাযাবর-স্বভাবী বলেই এদের কোনো স্থায়ী বাসস্থান থাকে না। তারাশঙ্করের *নাগিনী কন্যার কাহিনী* উপন্যাসে বিধৃত বেদে সম্প্রদায়ের উপকথা অনুসারে জানা যায় যে, সাঁওতাল পরগণার পাহাড়ের পাদদেশ অঞ্চলকেই বেদেরা তাদের নিজস্ব দেশ বিবেচনা করে। বেদে কৌমের কিংবদন্তি অনুসারে চম্পকনগর ছিল তাদের পূর্বপুরুষের দেশ। সেখান থেকে তারা সাঁওতাল পরগণায় এসেছে। পেশাগত জীবনের স্বাতন্ত্র্যের জন্যই বেদেরা যাযাবর হতে বাধ্য হয়েছে। প্রাচীন কাল থেকে তাদের বিচরণ ক্ষেত্র ছিল সাঁওতাল পরগণা, ছোটনাগপুর, বিহার, মুর্শিদাবাদ, বাঁকুড়া ইত্যাদি অঞ্চল। বেদেরা প্রায়-বিলুপ্ত এক কৌম গোষ্ঠী হলেও ওইসব অঞ্চলে এখনো এদের বিচরণ চোখে পড়ে।

Dhaka University Institutional Repository

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে ভারতীয় উপমহাদেশে আদিবাসীদের মধ্যে যারা আদি অস্ট্রাল গোষ্ঠীভুক্ত তাদের ভাষাবংশ অস্ট্রিক শ্রেণির। 'অস্ট্রিক ভাষা-গোষ্ঠীই ভারতের সবচেয়ে প্রাচীন ভাষাগোষ্ঠী। এক কথায় এটাই ভারতের আদিম দেশজ ভাষা। ... ভারতে প্রচলিত অস্ট্রিক ভাষাসমূহকে দুই শাখায় বিভক্ত করা হয়; প্রথম, 'মোন-খমের'। ... দ্বিতীয়, 'মুণ্ডারী' গোষ্ঠীর ভাষাসমূহ। এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে— খারওয়ারি, কুরকু, খরিয়া, জুয়াঙ, শবর ও গডাবা। খারওয়ারি গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে— সাঁওতালি বা হর, মুনারি, ভূমিজ, বিরহর, কোডা, হো, তুরিম, আসুরি, আগারিয়া ও কোরওয়া। সাঁওতালি প্রধানত সাঁওতাল পরগণার ভাষা, হো সিংহভূমের লরকাদের ভাষা আর বাকীগুলি ছোটনাগপুর সংলগ্ন ওড়িসার পার্বত্য অঞ্চল ও মধ্যপ্রদেশের আদিবাসীদের ভাষা।'[২] সেদিক থেকে উপমহাদেশের অধিকাংশ আদিবাসীই অস্ট্রিক ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত। বেদেদের ভাষার অপর বিশেষত্ব হল এদের দ্রুত বিবর্তনধর্মিতা। তাদের ভাষার বিবর্তিত রূপ হচ্ছে অপভ্রংশ বাংলা। ভ্রাম্যমাণ জাতি হওয়ার কারণে, সভ্য সমাজের সংস্পর্শে বেশি আসার ফলে দ্রুত তাদের ভাষার স্বকীয়তা বিসর্জিত হয়েছে।

দুই

বেদে সম্প্রদায় হচ্ছে বিচিত্র সংস্কারাচ্ছন্ন এক গোষ্ঠী। এই কৌম গোষ্ঠীর ধর্ম বিশ্বাসও বিচিত্র। ইতিহাসের এক বিশেষ কাল পর্ব থেকে এরা 'মুসলিম' ধর্ম সম্প্রদায়ের পরিচয়ে চিহ্নিত। তবে বেদেদের আচার-আচরণ, রীতি-নীতি, সংস্কার, নামকরণ ইত্যাদি হিন্দু ধর্মের অনুসরণে করা হয়। হিন্দুদের পুরাণ-কথা তাদের কণ্ঠস্থ, দেব-দেবীর পূজা ও ব্রত পালন তাদের প্রাত্যহিক জীবনের অংশ, অথচ মৌল ধর্ম পরিচয়ে তারা 'মুসলমান'। *ভারত কোষে*ও এদের মুসলমান বলা হয়েছে।[৩] তবে বেদেদের মধ্যেও হিন্দু বেদে আছে। ১৯০১ সালের সেন্সাস রিপোর্টে মুসলমান বেদের সংখ্যা ৩২,৬২১ জন আর হিন্দু বেদের সংখ্যা ১২,৩০১ জন উল্লেখ করা হয়েছে।[৪] ধর্ম তাদের যাই হোক পেশা-বাস্তবতার প্রয়োজনেই তারা দেবী মনসার একনিষ্ঠ ভক্ত। হিন্দু ধর্মের দেব-দেবীর ওপর তাদের ভক্তি ও শ্রদ্ধা গভীর। মুসলমান বেদেরাও হিন্দু ধর্মের প্রথা-পদ্ধতিকেই মান্য করতে অভ্যস্ত। বেদে সম্প্রদায় পরকালে বিশ্বাসী। পরজন্মে ভাল কিছু হয়ে জন্মাবার জন্য ইহকালে ভাল কাজ করবার ব্যাপারে তাদের আগ্রহ সুগভীর। হিন্দু-মুসলমান উভয় বেদেগোষ্ঠীই শিবের প্রতি গভীর অনুরক্ত। তারা সাপকে একদিকে যেমন জীবিকার উপায়রূপে বিবেচনা করে, অপরদিকে তেমনি মা মনসার সন্তান বলেও সমীহ করে। নিরুপায় না হলে তারা সর্পনিধনে লিপ্ত হয় না। নানা কারণে মনসার আশ্রয় প্রার্থনা, বিশেষত সৌভাগ্যের জন্য মনসার সন্তুষ্টি কামনা তাদের প্রাত্যহিকতার অঙ্গ। চাঁদ সওদাগর ও মনসার বিরোধ-সংক্রান্ত লোকপুরাণের পূর্বাপর ঘটনা দ্বারাই আবর্তিত হয় তাদের পেশা ও সাংস্কৃতিক জীবন। বেদেরা বিশ্বাস করে পুরাকথার সঙ্গে তাদের জীবন-নিয়তি বা ভবিতব্য সংযুক্ত। পেশাগত বাস্তবতা ও জীবনাচরণের স্বতন্ত্রতার কারণেই ভারতীয় উপমহাদেশে বেদে সম্প্রদায় এক অদ্ভুত ধর্ম-শঙ্কর জাতি। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে ওলাদেবী, সত্যপীর প্রমুখ ধারণাকে উপলক্ষ করে যে সাহিত্যধারা সূচিত হয়েছিল, বাংলার বেদে সম্প্রদায়ের মধ্যে ওই ধর্ম সমন্বয়ের আশ্চর্য প্রকাশ ঘটেছে।

Dhaka University Institutional Repository

তিন

ভারতীয় আদিবাসী কৌমগোষ্ঠীগুলির মধ্যে জীবিকার দিক থেকেও বেদেরা ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্যের ধারক। অন্যান্য আদিবাসীদের মতো সহজ এবং নিরাপদ পেশায় এরা অভ্যস্ত নয়। অভ্যন্তরীণ গোত্র বিন্যাসের ভিত্তিতে বেদেদের পেশাগত তারতম্য নির্ধারিত হয়। তবে সাপ-নির্ভর জীবিকা প্রায় সব বেদেরই আদি পেশা। বেদেরা সাপ ধরে এবং সাপের বিষ সংগ্রহ করে চিকিৎসকদের কাছে বিক্রি করে। তারা বিশ্বাস করে মা মনসা তাদের জীবিকা অর্জনের জন্যই সাপকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। আর্থিক সংকটকালে তারা ভিক্ষা করে চাল, নগদ পয়সা ও পরিধেয় বস্ত্র সংগ্রহ করে। বেদেদের জীবিকার সঙ্গে জড়িত রয়েছে নানা ছল ও চাতুরী। পেশাগত স্বার্থেই পশু-পাখি শিকার বেদে পুরুষদের জীবনের এক অনিবার্য অংশ। আহার্য সংগ্রহের জন্য সাপ, শূকর, সজারু, শিয়াল, ইঁদুর, খরগোশ, ব্যাঙ, গোসাপ এবং নানাপ্রকার পাখি শিকার করে এরা। আরেকদল বেদে প্রশিক্ষণ দেওয়া বানর ও ভালুকের খেলা এবং যাদু দেখিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে। বেদে-কৌমের মেয়েরা মাটির ঝুমঝুমি, খেঁজুর পাতার থলে ইত্যাদি হস্তশিল্প-নির্ভর দ্রব্যাদি তৈরি ও বিক্রি করে। বিচিত্র কৌশলে ভদ্র গৃহিণীদের ঠকিয়ে নানারকম জিনিসপত্র আদায়ে তারা পারঙ্গম। তারাশঙ্কর তাঁর স্মৃতিকথায় সভ্য বেদেদের সম্পর্কে লিখেছেন, 'এরা সব কেউ সাজত সন্ন্যাসী, কেই সাজত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, কপালে তিলক, গায়ে তুলসী বা রুদ্রাক্ষের মালা, হাতে কমণ্ডলু, বেশ সংস্কৃত শ্লোক আউড়ে এসে দোরে দাঁড়াত... বাড়ীর মঙ্গল হোবে রাম। সাধু বিদায় করো রাম। বলেই যেত, ব'লেই যেত— রাজ্য পাবে, পুত্র পাবে, মনের মত পত্নী পাবে। তেমন ভক্তিমান দেখলে সঙ্গে সঙ্গে ঝুলির মধ্যে হাত ঢুকিয়ে মুষ্টিবদ্ধ হাত বাড়িয়ে বলত— ধরো, ধরো। রামজী স্বপ্ন দিয়া তুমকো দেনেকো লিয়ে, ধরো। গৃহস্থ শঙ্কিত হয়ে হাত বাড়াত। পেত একটা তামার মাদুলী। সঙ্গে সঙ্গে সাধু বলত— দে দক্ষিণা। একশো-পঞ্চাশ-পঁচিশ-পাঁচ। শেষে এক টাকায় এসে চোখ রাঙা করে বলত— ভস্ম ক'রে দেব। শাপ দেব।' [৫] বেদে মেয়েরাও সাজ-গোজ ও নাচ-গান দিয়ে পুরুষদের সম্মোহিত করে বড়ো কিছু আদায়ে পারঙ্গম। মোট কথা বেদেদের জীবিকার সাথে কিছুটা ছল-চাতুরী ও ভেলকিবাজী সংযুক্ত।

এক দল বেদের জীবন ও জীবিকা সম্পর্কে তারাশঙ্কর তাঁর *আমার কালের কথায়* লিখেছেন, 'আর আসত সত্যকারের বেদের দল। তাবু, গরুর গাড়ী, গরু, মোষ, ঘোড়া, কুকুর নিয়ে আসত এক-একটা দল; দলে পুরুষে নারীতে পঞ্চাশ ষাট থেকে চার পাঁচশো পর্যন্ত লোক আসত। নানা ধরণের বেদে দেখেছি। সে কালে বছরে তিনটে চারটে দল আসতই। একেবারে বর্বর, একফালি নেংটি পরা, কালো কষ্টিপাথরের মত দেহ, তারা আসত — পায়ে হেঁটে আসত, সঙ্গে থাকত কিছু গরু মহিষ আর এক পাল দারুণ হিংস্রদর্শন কুকুর; এসে গ্রামপ্রান্তে গাছতলায় বাসা গাড়ত, প্রান্তরে প্রান্তরে শিকার ক'রে আনত খরগোশ, সজারু, ইঁদুর, গোসাপ, শেয়াল, বড় বড় ধামিন সাপ। ...দুপুরে স্তব্ধ গৃহদ্বারে হাঁক উঠত এ খোকার মা, ঝুমঝুমি লেবি? কিনলেও বিপদ, না-কিনলেও বিপদ, কোনক্রমে ঝগড়া বাধিয়ে কিছু-না-কিছু কেড়ে নিয়ে পালত।' [৬] সাপকে কেন্দ্র করেই প্রধানত পরিচালিত হয় বেদেদের জীবিকা। এ জন্য তারা সাপ ধরে, সাপের বিষ সংগ্রহ করে, সাপের খেলা দেখায়। তারা এরকম আচরণ করে যে তাতে বোঝা যায় তারা মন্ত্র-তন্ত্রের সাধক, যা মূলত তাদের জীবিকাকে নিরাপদ ও নিশ্চিত করবার পন্থা মাত্র। এ-সব মন্ত্রের ভয় দেখিয়ে কিংবা মন্ত্র দ্বারা বশীভূত করার ছলে তারা গ্রামবাসী মানুষের কাছ থেকে অর্থ আদায় করে নেয়। অন্যদিকে, খেলা-দেখানো সাপ বুড়ো হয়ে গেলে সেগুলোকে নদীর ধারে ছেড়ে দিয়ে আসাই বেদেদের প্রথা। কেননা, দেবী মনসার সন্তান হিসেবে সাপের প্রতি তারা লালন করে এক গভীর শ্রদ্ধা ও মমতা।

Dhaka University Institutional Repository

চার

বেদে সম্প্রদায়ের জীবনাচার বিচিত্র সব বিশ্বাস দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ধর্মে মুসলমান হয়েও হিন্দু আচরণে তারা মূলত অভ্যস্ত। চাঁদ সওদাগর ও মনসার লোক-পুরাণের গণ্ডিতে তাদের জীবনাচরণ আবদ্ধ। তাদের ধর্মাচার, উৎসব, নৃত্যগীত— সকল কিছুতেই শিব এবং মনসার প্রবল উপস্থিতি লক্ষণীয়। দেবাদিদেব মহাদেব বেদেকুলে বাবা অভিধায় সম্ভাষিত। অপরদিকে মনসা তাদের মা। সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল বেদে ষষ্ঠীর ব্রত করে, কালী ও দুর্গাকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে। চম্পক নগর তাদের কাছে পবিত্র একটি স্থান হিসেবে পরিচিত। কারণ চম্পকনগরেই মা মনসার আসন।

বেদে কৌমের প্রত্যেক গোত্রেই একজন সর্দার থাকে, শিরবেদে অভিধায় তার পরিচয় চিহ্নিত। বেদেরা বিশ্বাস করে যে, মা মনসার কৃপায় ও ইচ্ছায় বেদেকুলের মঙ্গল, সম্ভ্রম ও মর্যাদা রক্ষার জন্য বিষবেদে গোত্রে একজন করে নাগিনী কন্যা প্রেরিত হয়। মা মনসাই তাকে পূজা প্রাপ্তির জন্য পাঠিয়ে দেন। মায়ের স্থানে পূজা দেবার অধিকার কেবল ওই নাগিনীকন্যারই আছে। আধিপত্যের প্রশ্নে গোত্রে শিরবেদেদের পরে নাগিনী কন্যার স্থান। বেদেকুলের দিক নির্দেশনার জন্য একটি বিশেষ সময়ে কন্যার ওপর ভর করেন মা মনসা। তখন কন্যার বাস্তব বুদ্ধি লোপ পায়; মনসার বক্তব্যেরই প্রতিধ্বনি করে তার কণ্ঠ। বেদে সম্প্রদায়ের মধ্যে শিরবেদে যেমন সকল দণ্ডমুণ্ডের কর্তা তেমনি নাগিনীকন্যাও প্রবল অধ্যাত্ম-ক্ষমতার অধিকারী। কৃষ্ণাপঞ্চমীর রাতে শিরবেদে ঘরের দরজা বন্ধ করে প্রদীপ জ্বেলে, ধূপ পুড়িয়ে মা মনসার পূজায় বসে। ছুরি দিয়ে বুক চিরে সে রক্ত নিবেদন করে মনসাকে। মনসা শিরবেদের প্রার্থনায় তুষ্ট হলেই বেদেকুলে নাগিনী কন্যা প্রেরণ করেন। একজন শিরবেদের ক্ষমতাকালে কয়েকজন নাগিনীকন্যার আবির্ভাব ঘটতে পারে। শিরবেদে আর নাগিনী কন্যার মধ্যে সর্বদা বিরোধপূর্ণ সম্পর্ক বিরাজ করে, কখনো-বা তা সংঘাতেও রূপ নেয়।

আষাঢ়ের শুক্লাপঞ্চমী বা নাগপঞ্চমীর দিনে মনসা বা বিষহরির পূজা করে বেদেরা। বেদেদের আস্তানায় মা মনসার আসন থাকে। তাকে কেন্দ্র করেই বেদেদের পূজা পালিত হয়। মাকে প্রথম পূজা দেওয়ার অধিকার নাগিনীকন্যার। নাগিনীকন্যা পূজা সম্পাদন করলেই পূজা করার অধিকার শিরবেদের। শিরবেদের পরে সকল বেদে মায়ের পূজা দিতে পারে। মনসার পূজায় ধূপ-ধূনা পুড়িয়ে, চিমটা, বিষম চাকি ও তুমড়ি-বাঁশি বাজিয়ে বেদেরা গান করে। বেদেরা পূজা-পার্বণে নিজেদের তৈরি মদ খায়। পূজা শেষে গোটা বেদে পাড়া অংশ নেয় নাচ-গানের আসরে। নারী-পুরুষ একত্র নেচে গেয়ে আনন্দ করে। তারাশঙ্করের নিজ জেলা বীরভূমের প্রায় সর্বত্রই নাগপঞ্চমীর দিনে মনসার পূজা হয়। সেখানে প্রচুর মনসামন্দিরও রয়েছে। এ-সব মন্দিরে সমাজের নিম্নবর্গের মানুষেরাই সাধারণত পূজা দেয়। নাগপঞ্চমীর দিনে পল্লির বধূরা বেহুলার স্মরণে শ্বশুরালয় থেকে পিতৃগৃহে যায়, উপবাস করে ও অর্ঘ্য নিবেদন করে। তাদের বিশ্বাস চম্পাই নগরে মনসার মূল আসন এবং এই বিশ্বাসেই তারা সেখানে পূজা পাঠায়। মনসা পূজার বিস্তৃতি, চাঁদসওদাগরের প্রচলিত মিথের জনপ্রিয়তা ও বেদে সম্প্রদায় কর্তৃক তার ব্যাপক ব্যবহার এই অঞ্চলে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত।

যাযাবর স্বভাবী বেদেরা নিজেদের প্রতিটি অভিযাত্রার পূর্বে মনসার পূজা সম্পন্ন করে। এছাড়া প্রতিদিন তাদের গোত্রপতি শিরবেদে ও নাগিনী কন্য সন্ধ্যায় মনসার আসনে ধূপ-ধূনা জ্বালিয়ে গান গেয়ে বাদ্য বাজিয়ে পূজা করে। জীবিকার প্রয়োজনে তাদের প্রধান যাত্রা শুরু হয় ভাদ্রের শেষে বিষহরির পূজার মধ্য দিয়ে। বছরের এই সময়ে সব গোত্রের বেদেই বিষহরির নাম নিয়ে যাত্রার শুভসূচনা করে। এই সময়ে নৌকায় বা হাঁটা পথে কাঁধে ভার নিয়ে দেশ-দেশান্তরে ঘুরে বেড়ায় তারা, এই অভিযাত্রাই তাদের কুলপ্রথা। শীতের শেষে, তাদের বিশ্বাসমতে যখন গরুড় পাখিরা উড়ে যেতে শুরু করে তখন তারা আবার স্বভূমিতে প্রত্যাবর্তন করে। 'গড়ুর

Dhaka University Institutional Repository

পাখির বংশধর। নাগকুলের জননী আর গড়ুর পক্ষীর জননী— দুই সতীন। সৎভাইদের বংশে বংশে কালশত্রুতা সেই আদিকাল থেকেই চলে আসছে। সৃষ্টির শেষদিন পর্যন্ত চলবে। তাই এ মীমাংসা হয়তো দেবকুলের করে যাওয়া মীমাংসা। শীতের কয়েক মাস পৃথিবীতে অধিকার গড়ুর-বংশের। তারা আকাশ ছেয়ে ভেরী বাজিয়ে এসে পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে— বিলে নদীতে পুকুরে; ধানভরা মাঠে ধান খাবে। তারপর ফাল্গুন যাবে, চৈত্রের প্রথমে গরমের আমেজ ভরা বাতাস আসবে দক্ষিণ থেকে; মাঠের ফসল শেষ হবে; তখন তারা আবার উড়বে— গগনভেরী পাখিরা নাকারা বাজিয়ে চলবে আগে আগে! তখন আবার পড়বে নাগেদের কাল।'[৭] ফাল্গুনের শেষে শীতে নিদ্রা যাওয়া সাপেদের ঘুম ভাঙানোর দায়িত্ব নিতে হয় বেদেদের। প্রথমেই তারা সাঁওতালী বনভূমিতে আগুন লাগিয়ে ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন করে দেয় বনভূমি। মাটির নীচের সাপ তখন আগুনের উত্তাপে জেগে ওঠে। সাপের এই ঘুম ভাঙাতে গিয়েও বেদেরা নানা পৌরাণিক বিশ্বাস ও সংস্কারের দ্বারা পরিচালিত হয়। এভাবে আগুন লাগিয়ে নানা প্রকার পাখি, যেমন— জল মুরগী, হাঁস, তিতির, মরালী, কাঁদাখোঁচা, হাড়িচাচা এবং বণ্যপ্রাণী খরগোশ ও সজারু ধরে তারা। শিকারের এই মহোৎসবে অন্তত একটি হলেও সাপ ধরে তারা। এরপর ধৃত পাখি ও পশুর রান্না করা মাংস খেয়ে এবং নেচে -গেয়ে মা বিষহরির পূজা সম্পন্ন করার মধ্য দিয়ে সাপ ধরা ও সাপের বিষ সংগ্রহ করার শুভ সূচনা করে বেদেরা। ফাল্গুনের শেষে এ পূজা পরিচালনার দায়িত্ব থাকে নাগিনী কন্যার ওপর। নাকাড়া ও চিমটে বাজিয়ে, হাঁস ও পায়রা বলি দিয়ে মহাসমারোহে বেদেরা এই পূজায় অংশগ্রহণ করে। জাগরণের রাতে পূজার পর তারা মদ মাংস খেয়ে খুব আনন্দ করে, সাপ নিয়ে খেলা করে এবং গান গায়। শীতের শেষে গরমে গুহাবাসী সাপেরা বেরিয়ে আসে বলে এই বিশেষ মৌসুমের পূজা বেদে কৌমে জাগরণের পূজা নামে পরিচিত। জাগরণের দিন সাপ ধরা পড়লে বেদেরা একে মঙ্গলের লক্ষণ হিসেবে বিবেচনা করে। তারা মনে করে তাদের সবকাজে মনসার ইচ্ছা ও অনিচ্ছা সম্পৃক্ত। তাই যে কোনো কাজ সম্পন্ন করবার সময় তারা পরম ভক্তিসহকারে মনসার কৃপালাভে প্রয়াসী হয়।

ভারতের বিচিত্র সব আদিবাসীদের মধ্যে বেদেরা তাদের জীবনাচার, ধর্ম, সংস্কার, খাদ্য, পেশা ইত্যাদি সব কিছুতেই অন্যান্য আদিবাসী গোষ্ঠীর তুলনায় বিচিত্র ও বিভিন্ন। যুগ যুগ ধরে তারা লালন করে আসছে মিশ্র ধর্মীয়-সংস্কৃতি। বেদেরা যেমন নামাজ আদায় করে, তেমনি মা মনসার পূজাও করে। পেশাগত তন্ত্র-মন্ত্র উচ্চারণের সময়ও বেদেরা আল্লাহ্-রাসুল ও দেবদেবীর দোহাই দেয়, তাঁদের নাম স্মরণ করে। তারাশঙ্করের 'বেদেনী' গল্পে শম্ভুর নামাজ পড়ার দৃশ্যটি প্রসঙ্গত স্মরণীয়।[৮] বেদেদের সম্পর্কে তারাশঙ্করের দেয়া তথ্য তাদের জীবনাচারের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তারাশঙ্কর সামাজিক ও নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে গভীরভাবে বেদে কৌমের জীবনধারা পর্যবেক্ষণ করেছিলেন।

পাঁচ

বেদে সম্প্রদায়ের জীবনাচার ও সমাজ-ব্যবস্থার ভিত্তি মূলত তাদের কৌম-নির্ভর উপকথার উপর প্রতিষ্ঠিত। মনসাকেন্দ্রিক নানা সংস্কার ও উপকথাই তাদের জীবনের নিয়ন্ত্রক। উপকথা-আশ্রিত বিশ্বাসই তাদের প্রধান চালিকাশক্তি। ভারতীয় আদিবাসীদের মধ্যে বেদেগোষ্ঠী ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ও সমন্বয়ের এক অনন্য দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছে। অসংখ্য অন্ধ বিশ্বাস এবং ওই বিশ্বাস-উদ্ভূত ভয়ই নিয়ন্ত্রণ করে বেদে-জীবন। তাদের জীবনের প্রত্যয়সমূহও খুব অদ্ভুত। বেদেগোষ্ঠীর বিশ্বাস তাদের আদিপুরুষ শিরবেদের ভুলের জন্যই লক্ষীন্দরকে কালনাগিনী দংশন করেতে সক্ষম হয়েছিল।[৯] সেই থেকে চাঁদ সওদাগরের দ্বারা বিতাড়িত হয়ে আদি শিরবেদে

Dhaka University Institutional Repository

স্বভূমি ছেড়ে অভিশাপ নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। তারই উত্তরপুরুষ বেদে সম্প্রদায় হারিয়ে ফেলে বংশানুক্রমিক মন্ত্রগুণ। অর্থাৎ, সাপ আর অভিশাপের গণ্ডিতেই আবর্তিত হয় বেদেদের জীবন। অবশ্য মা মনসার কৃপায় তারা পুনরায় ফিরে পায় আবাস, জাত-কুল, মন্ত্রগুণ এবং জীবিকার নানা বিদ্যা।

বেদেদের বিশ্বাস চাঁদসওদাগর অভিশাপ দিলেও মা মনসা তাদের অনন্যসহায়। বিষহরির কৃপায় তাই তাদের গোত্রে যুগ যুগ ধরে নাগিনী কন্যারা মনুষ্য কন্যারূপে জন্ম গ্রহণ করে। পাঁচ বছর বয়সে বেদে সমাজে নাগিনী কন্যা বিধবা হয়। ষোল বছর বয়সে সে নাগ মাহাত্ম্য অর্জন করে। তাই বেদেসমাজে বিধবাদের ষোল বছরের আগে পুনর্বিবাহ হয় না। *নাগিনী কন্যার কাহিনী* উপন্যাসে সবলা ও পিঙলা মনসার প্রেরিত সেই নাগিনী কন্যা। তারা বিয়ে করতে পারে না ; মনসার পূজা করে এবং বেদেগোষ্ঠীর মঙ্গলের জন্য যা করণীয় তা সম্পাদনে সচেষ্ট থাকে। মনসার নির্দেশমতো বেদে সমাজ পরিচালনার দায়িত্ব তাদের। জৈবিক কামনা তাদের জন্য সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। মনসার একান্ত স্নেহাস্পদা এই নাগিনী কন্যা। বেদেরা মনে করে কালনাগিনী লক্ষীন্দরকে দংশন করে বেহুলাকে স্বামী-হারা করেছিল বলেই বেহুলার শাপে কালনাগিনীর নিজের বংশে নাগ জন্মে না। অন্য বংশের নাগ-জাত সন্তান জন্ম দেয়। সেই সূত্রে নাগিনী কন্যাও অভিযুক্ত। তাই তার বিয়ে হয় না; বিয়ে হলেও সন্তান হয় না; সন্তান হলেও সেই সন্তান 'ভুক্ষু' (অর্থাৎ ভক্ষণকারী) হয়।

বেদেদের প্রচলিত উপকথায় এবং ধ্রুপদী পুরাণেও আছে যে, বাসুকীর ফণার উপরে সমগ্র পৃথিবী দুলছে।[১০] আবহমান কাল ধরে বেদেদের গানে গানে চলে আসছে সে কথা।—

বাসুকী দোলায় মাথা দোলে চরাচর রে—
তুই ঢল্ ঢলে পড়রে!
সমুদ্র-মন্থনে দোলে ও সাত সাগর রে—
তুই ঢল্ ঢলে পড়রে![১১]

বিচিত্র সংস্কার-কুসংস্কারের বেড়াজালে আবদ্ধ বেদে সম্প্রদায়ের জীবনাচার। বেদেদের ঝাঁপিতে সাপ মরলে তারা সেটাকে তাদের কৃত পাপের ফল হিসাবে গণ্য করে। নিজ গোত্রের নিয়ম-কানুনের বাইরে কিছু করলে সর্দার বা গোত্র কর্তৃক কঠিন শাস্তির বিধান বেদে কৌমে প্রচলিত ছিল। বেদেগোষ্ঠীর জীবিকার নানা গোপন রহস্য রয়েছে। রহস্যমণ্ডিত তন্ত্র-মন্ত্র দিয়ে তারা মানুষকে সম্মোহিত করে। এ-সব গোপন বিষয় বাইরে প্রকাশ করা বেদেদের জন্য নিষিদ্ধ। তাদের জীবন মূলত সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রিত হয় নানা ধরনের সংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস দ্বারা। তাদের সমাজে পেশাগত এমন বাধ্যবাধকতার প্রচলনও ছিল যে, সাপে কাটার সংবাদ শোনামাত্র তারা ঘটনাস্থলে চিকিৎসার জন্য উপস্থিত হবে। তাদের চিকিৎসা-ব্যবস্থা হচ্ছে তন্ত্র, মন্ত্র ও জড়িবুটির চিকিৎসা। সর্পদংশনের ঘটনা যদি নিয়তি-নির্ধারিত না হয়ে থাকে, তাহলে চিকিৎসা অব্যর্থ সুফল লাভে সক্ষম।

বেদে গোষ্ঠীর জীবনধারার সঙ্গে গভীরভাবে মিশে আছে নৃত্য-গীত। তারা গানে-গানে তাদের গোষ্ঠীগত ইতিহাস ও উপকথার বর্ণনা করে। নৃত্য-গীত তাদের জীবিকারও একটি বড় উপাদান। বেদে নারীর ঐতিহ্যগত নৃত্য ও সুললিত দৈহিক হিল্লোল পেশাগত স্বার্থে সম্পন্ন গৃহস্থ পুরুষের মনোযোগ আকর্ষণে ব্যবহৃত হয়। তাদের গোষ্ঠী-গীতির প্রায় সবটাই জুড়ে আছে কৌমের উৎসব-সংক্রান্ত উপকথা আর মনসা-চাঁদ সংক্রান্ত বিরোধ-কথা। দৃষ্টান্ত লক্ষণীয়:

Dhaka University Institutional Repository

জয় বিষহরি গ! জয় বিষহরি!
চাঁদো বেনে দণ্ড দিল
তোমার কৃপায় তরি গ!
অ—গ!
চম্পাই নগরের ধারে
সাঁতালী পাহাড় গ!
অ—গ! ...[১২]

বেদে সংস্কৃতির এক সমৃদ্ধ উপাদান এ সকল গান। বেদে নারীরা সাপের খেলা দেখাতে বা বাঁদর নাচাতে সাপের ফণার তালে তালে হেলে দুলে নেচে এসব গান পরিবেশন করে থাকে। এ-সব গানের মধ্যে মনসার ভাসান গানেরই আধিক্য। তাদের মিথাশ্রিত গান পল্লির গৃহস্থ বধূদের চোখে জলের বন্যা বইয়ে দিতে সক্ষম। বেদেরা নিজেরা এসব গান রচনা করে পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে শোনা উপকথা ও বিশ্বাসকে অবলম্বন করে। তাই তাদের প্রবল অন্ধবিশ্বাসের জগৎটা এসব গানে অকপটভাবে মূর্ত হয়ে ওঠে।

বেদে নারীরা সারাদিন জীবিকার জন্য গ্রামে গ্রামে খেলা দেখায়, পণ্যসামগ্রী বিক্রি করে। কিন্তু সূর্যাস্তের পূর্বে অবশ্যই তাদের গৃহে ফিরে আসতে হয়। এটাই কৌমের বিধান। কোনো কারণে যথাসময়ে ফিরতে ব্যর্থ হলে কোনো সৎ গৃহস্থের বাড়িতে যে সে আশ্রয় নিয়েছিল তা প্রমাণ করতে হয় বেদে নারীকে। অন্যথায় ওই নারীর ওপর নেমে আসে কঠিন শাস্তি। এছাড়া এক গোত্রের ছেলে-মেয়ের অন্য গোত্রে বিয়ে হলেও তাদের পতিত বলে গণ্য করা হয়।

ছয়

প্রাচীন কাল থেকেই নিষ্কর ভূমিতে বেদেরা অস্থায়ী ঘর-বাড়ি তৈরি করে বসবাস করে আসছে। জমিদার বা সরকারকে তাদের খাজনা দিতে হত না।[১৩] চাঁদ সওদাগরের সঙ্গে বিবাদের পর বিতাড়িত হয়ে বেদেরা মনসার আশ্রয় লাভ করে। তখন থেকেই বেদেরা মনসার নির্দেশে দেবী-প্রদত্ত ভূমিতে বসবাস করছে। ফলে অন্য কাউকে খাজনা দেওয়ার কোনো যুক্তি বেদেরা খুঁজে পায় না। জীবন ধারণের ন্যূনতম প্রয়োজন মেটানোর মধ্যেই বেদেদের সন্তুষ্টি সীমায়িত। বেদে জনগোষ্ঠী কখনোই কৃষিকাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়নি। তবে অন্যের জমি থেকে তার ফসল কুড়ায় এবং কখনো কখনো ফসল চুরিও করে।

প্রকৃতির দান এবং নিজস্ব সংস্কারকে অবলম্বন করে হাজারো প্রতিকূলতার মধ্যেও বেদে সম্প্রদায় সুদীর্ঘকাল তাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল। ভদ্র সমাজের মানুষের কাছাকাছি বসবাস করলেও তারা ভিন্ন সংস্কৃতির প্রভাবমুক্ত ছিল দীর্ঘকাল। কিন্তু সভ্যসমাজের শোষণ ও লালসার জাল থেকে বেশিদিন নিজেদের মুক্ত রাখা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। কখনো-কখনো ধণিক শ্রেণির ভোগের শিকারও হতে হয় বেদে নারীদের।[১৪] বেদেদের যাযাবর মানসতার জন্যই কৃষিকাজে তারা অনাগ্রহী । ফলে ভূ-সম্পত্তির অধিকারী হওয়ার বাসনাও তাদের মধ্যে দেখা যায় না। কৃষিজীবী কাহার ও সাঁওতাল সম্প্রদায়ের যেখানে ভূমির প্রতি পরম শ্রদ্ধা ও সাগ্রহ দৃষ্টি লালন করে, যাযাবর বেদেরা সেখানে সম্পূর্ণ পৃথক মানসিকতার অধিকারী এক আদিবাসী গোষ্ঠী। বেদেদের এই যাযাবরবৃত্তির কারণে তাদের অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তাও ছিল সার্বক্ষণিক। ফলে সভ্যতা, অর্থনীতি ও রাজনীতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এদের স্বকীয়ত্বে ভাঙন সৃষ্টি হয়েছে স্বভাবতই। পরিবর্তিত বিশ্বব্যবস্থা ও আধুনিক বিজ্ঞানের নানা আবিষ্কার

Dhaka University Institutional Repository

বেদেদের জীবনধারায়ও পরিবর্তন এনেছে। আধুনিক জটিল আর্থনীতিক ব্যবস্থার 'সুদ সংস্কৃতি' গ্রাস করেছে তাদের কৌম সমাজকে। বর্তমানে নিজস্ব সমাজেও তারা অপেক্ষাকৃত ধনী বেদেদের দ্বারা সুদের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত হয়।[১৫]

আপাত দৃষ্টিতে মনে হবে বেদে সম্প্রদায়ের জী বনে আধুনিক আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবর্তন কোনো প্রভাব বিস্তার করেনি। কিন্তু সকলেরই জানা আছে যে, সমাজস্তরের একটি পর্যায়ে বড় পরিবর্তন হলে সমাজের সর্বক্ষেত্রে পরোক্ষভাবে হলেও তার অনিবার্য প্রভাব পড়ে। তাই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর পৃথিবী ব্যাপী যে ভাঙা-গড়া, অস্তিত্ব সংকট ও মূল্যবোধের পরিবর্তন হচ্ছিল; বেদেগোষ্ঠী স্বভাবতাই তার প্রভাবমুক্ত থাকেনি। তারা ভূমি, রাজনীতি ও অর্থনীতির সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত না হয়েও ওইসব প্রভাপবিস্তারী ঘটনার শিকার হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী আধুনিক সময় মানব জীবনে নিয়ে আসে নতুনতর জটিলতা ও বাস্তবতা। সেইসঙ্গে আসে বিনোদনের আধুনিক সব চমকপ্রদ উপকরণ। সভ্যতার ছোঁয়ায় পাল্টে যায় মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি। ফলে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে মানুষ আর বেদেদের সাপের খেলা, যাদু কিংবা ভেল্কিবাজিতে আনন্দ পায় না। যুগের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা বিজ্ঞানেও পরিবর্তন সাধিত হয় ব্যাপক । ফলে বেদেদের জড়িবুটি ও ওঝাগিরিতে ভাটা পড়ে। এভাবে এদের আর্থ-অবস্থা ও জীবিকায় নেমে আসে বিপর্যয়।[১৬] অস্তিত্বের প্রশ্নে ভারতীয় বেদেসম্প্রদায় ইতিহাসের এই পর্বে নিজেদের কৌম জীবনসীমা-উৎকেন্দ্রিক ভিন্নতর পেশায় মনোনিবেশ করতে বাধ্য হয়, কখনো উদ্যোগী হয় স্বীয় পেশায় নতুন মাত্রা সংযোজনে । এতদ্‌সত্ত্বেও প্রকৃতির এই সরল কৌম সন্তানেরা জটিল আধুনিক জীবনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে না পেরে নিক্ষিপ্ত হয় অস্তিত্ব রক্ষার কঠিন সংগ্রামে।

অনার্য অধ্যুষিত রাঢ় অঞ্চলই ছিল বেদে সম্প্রদায়ের বৃহৎ বিচরণ ক্ষেত্র। উত্তরকালে রাঢ় অঞ্চল শাক্ত, তান্ত্রিক ও সহজিয়া বৈষ্ণব ধর্মের লীলাক্ষেত্র হয়েছে। নিম্নবর্গীয় জীবনে এই গ্রহণ-বর্জনের একটা প্রবল আন্দোলন তৈরি হয়েছিল বিভিন্ন ধর্ম ও কৌমজনতার সহাবস্থানের কারণে। বেদে সম্প্রদায়ও এর ব্যতিক্রম নয়। এরই ফলে হিন্দু ধর্মের নিম্ন পর্যায় ছাড়াও বৌদ্ধ ও মুসলিম ধর্মের সঙ্গেও তাদের সংযোগ স্থাপিত হয়। এছাড়া রাঢ় অঞ্চলে ধর্মঠাকুরের প্রতিপত্তির কারণে বেদেদের ওপর তারও প্রভাব পড়েছে ব্যাপকভাবে। আবার কখনো কখনো সামাজিক পরিবর্তিত পরিস্থিতির কারণে বেদেরা ধর্মান্তিরিত হতেও বাধ্য হয়েছে।[১৭] ওইসব কারণে অন্যান্য আদিবাসীর মতো বেদেদের জীবনেও নেমে এসেছে অনিবার্য পরিবর্তন। আর এটাই বেদে কৌমের সামাজিক জীবনের ট্রাজেডি।[১৮] কারণ আদিবাসীদের গোষ্ঠীগত মৌলিক জীবনচর্চা প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হতে থাকলে তা থেকেই আসে সামাজিক গোষ্ঠীগত অবক্ষয়।

ব্যাপক বংশ বিস্তারের ফলে জনসংখ্যার আধিক্যও ঘটেছিল বেদেদের গোষ্ঠীগত জীবনে। ফলে একই পেশায় বর্ধিত জনসংখ্যার সংকুলান হয়নি জমিদারদের দেওয়া নিষ্কর ভূখণ্ডে। ফলে অনেকেই তখন ভিন্ন পেশা গ্রহণে বাধ্য হয়েছে। আবার একথাও সমভাবে সত্য যে, কালিক অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বেদেদের পেশাগত জীবনেও রুচি-পরিবর্তনের ধারা সূচিত হয়। এ-কথাও বহুলাংশে সত্য যে, টিকে থাকার জন্যই বেশিরভাগ বেদে বৃত্তি বদল করেছিল।

সাত

নৃবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুসন্ধান-ক্ষেত্র হচ্ছে সামাজিক বিবর্তন। সমাজ ক্রমপরিবর্তশীল। আর এই পরিবর্তন প্রক্রিয়াটি বিচ্ছিন্নভাবে ঘটে না। এর পেছনে থাকে নানা কারণ। রাজনৈতিক পরিবর্তনও প্রভাব ফেলে আর্থনীতিক পরিবর্তনে। আর্থনীতিক পরিবর্তন সমাজ-জীবনের পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করে। ভারতীয় সমাজ

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবস্থায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে এই আর্থনীতিক পরিবর্তন এসেছিল বহুমাত্রিক রূপ নিয়ে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতে বাণিজ্য ও শিল্পপুঁজির প্রসার ঘটিয়েছিল। ফলে সনাতন জীবনধারায়ও গুণগত পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এতে সমাজের সর্বস্তরে একটা প্রবল আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। ভেঙে পড়ে গ্রামীণ ক্ষুদ্রও কুটির শিল্প, হ্রাস পায় কৃষির ওপর নির্ভনশীলতা। আরও উত্তরকালে বাজার নির্ভর অর্থনীতির সূচনায় নির্দিষ্ট পেশার মানুষ স্বীয় পেশার বাইরে যেতে বাধ্য হয়। বেদে সম্প্রদায়ের জীবনেও ওইসব সমভাবে প্রভাব বিস্তার করেছ এবং তাদের নিজস্বতায় আঘাত হেনেছে। নগদ উপার্জন, পেশাগত বৈচিত্র্যের চমক এবং নতুন জীবনের আস্বাদ লাভের অভিপ্রায়, সর্বোপরি অস্তিত্ব রক্ষার জন্যই তারা ভিন্ন পেশা সন্ধানে বাধ্য হয়েছে।

যেকোনো আদিবাসী গোষ্ঠী যখন সভ্য জগতের কাছাকাছি এসে তাদের বৃত্তি পরিবর্তন করে, তখন তাদের স্বকীয়তা অপহৃত হয়। উচ্চবিত্ত শ্রেণী স্বার্থ চরিতার্থতার জন্য তাদের ব্যবহার করে। আধুনিক প্রতিযোগিতামূলক আর্থনীতিক বাজারে প্রবেশ করে সরল এ জনগোষ্ঠী হয়েছে বঞ্চনার শিকার। পেশাগত পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব এড়াতে পারেনি তারা কখনোই। বৃত্তি বদলের ফলে স্বীয় সংস্কৃতি, জীবনাচার ও ঐতিহ্য হারিয়ে উন্মূলিত এক জনগোষ্ঠীতে রূপান্তরিত হয়েছে বেদেরা। এভাবে তারা পরিণত হয়েছে বাংলার এক লুপ্তপ্রায় সম্প্রদায়ে। তারাশঙ্কর ওই সত্যকেই আভাসিত করেছেন পাঠকে সম্মুখে; বলেছেন 'আজকাল অনেকেই এদের জানেন না'।[১৯] বেদেদের বিলুপ্তির জন্য একক কোনো কারণ হয়তো দায়ী নয়, তবে সার্বিক সামাজিক বিবর্তন ধারায় আদিম বৃত্তিগত পরিবর্তনই এদের বিলুপ্তির জন্য যে দায়ী, তা অস্বীকার করবার উপায় নেই।

অদম্য সাহস আর অফুরন্ত প্রাণশক্তি নিয়ে অসাধারণ অভিযোজনক্ষম বেদে কৌম প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করে দীর্ঘকাল টিকেছিল। কিন্তু মানুষের গড়া যান্ত্রিকতার ক্রমবর্ধমান আগ্রাসনে এদের স্বীয় সংস্কৃতি, অর্থনীতি ও জীবনমানে আসে প্রচণ্ড আঘাত। সেই আঘাতে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে তারাশঙ্করের সমকালেই (১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত) চরম বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয় উপমহাদেশীয় ঐতিহ্যের ধারক বিচিত্র এই কৌম সম্প্রদায়।

তথ্যনির্দেশ

১ (a) Bedyas, *Asiatic Societies Researches*, vol. viii, page- 458; (b) E.T. Dalton; *Descritive Ethnology of Bengal*, 1974 edn, page-554

২ ড. অতুল সুর; *ভারতের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়*, ১৯৮৮, সাহিত্যলোক, কলকাতা, পৃ. ৭১-৭২

৩ দীপালী ঘোষ; *ভারত কোষ (৫ম খণ্ড)*, বেদিয়া, ১৯৭৩, পৃ. ১৫৯

৪ রঞ্জিতকুমার মুখোপাধ্যায়; *তারাশঙ্কর ও রাঢ় বাংলা*, প্র. প্র. ১৯৮৭, নবার্ক, কলকাতা, পৃ. ৮৮

৫ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়; *আমার কালের কথা*, তারাশঙ্কর রচনাবলী, দশম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃ. ৪৪১

৬ *আমার কালের কথা*, প্রাগুক্ত পৃ. ৪৪০

৭ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়; *নাগিনী কন্যার কাহিনী*, বাক্ সংস্করণ, ১৯৯৩, কলকাতা, পৃ. ১০৪-৫

৮ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বেদেনী', *তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ (২য় খণ্ড)*, সম্পাদনা- জগদীশ ভট্টাচার্য, ১৯৯৮, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, পৃ. ২৩৭

৯ মনসার সাথে বিবাদে চাঁদ সওদাগর ছয় পুত্র ও সাতডিঙা মধুকর হারিয়েছে। গণকেরা বলেছে চাঁদের শেষ পুত্র লক্ষীন্দরের মৃত্যু হবে সর্পাঘাতে। চাঁদ সওদাগর তবুও হার মানেনি। লক্ষীন্দরের বিয়ে হলো, লোহার নিশ্ছিদ্র বাসরঘর তৈরি হল। চাঁদের বন্ধু ধন্বন্তরী বা আদি শিরবেদে বিশ্বম্ভরকে দায়িত্ব দেওয়া হল 'সাঁতালী' পাহাড় রক্ষার। মনসার প্রেরিত নাগেরা 'সাঁতালী'র সীমানার ধারে এসে থমকে দাঁড়িয়েছিল। শিরবেদে বুঝেছিল, তাড়িয়েও দিয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে নাগিনী যখন শিরবেদে বিশ্বম্ভরের মৃত কন্যার রূপ ধরে এসেছিল, তখন তৃষ্ণার্ত পিতৃহৃদয় ছলনায় মজেছিল। বুকে টেনে নিয়েছিল কন্যারূপী কালনাগিনীকে। তখন নাগিনী ঘুম পাড়ানী গান গেয়ে শিরবেদেকে ঘুম পাড়িয়ে দংশন করল লক্ষীন্দরকে। এ ভুলের জন্যই চাঁদ সওদাগর তাঁকে দণ্ড দিয়েছিল। বেদেরা মন্ত্রগুণ ও সম্মান হারিয়ে সমাজে অচ্ছুৎ হয়ে রইল। দ্র. *নাগিনী কন্যার কাহিনী*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০-২৭

১০ বাসুকির ফণার ওপর পৃথিবীর ভার বহনের এই প্রসঙ্গটি মাইকেল মধুসূদন দত্তের *মেঘনাদ বধকাব্য* এর প্রথম সর্গে উল্লেখিত হয়েছে এভাবে—

"... ফণীন্দ্র যেমতি,

Dhaka University Institutional Repository

বিস্তারি অযুত ফণা, ধরেন আদরে
ধরারে।..."

দ্র. 'মেঘনাদ বধ', *মধুসূদন রচনাবলী*, সাহিত্য সংসদ, দ্বাদশ মুদ্রণ, ১৯৯৩, কলকাতা পৃ. ৩৫

[১১] তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়; *নাগিনী কন্যার কাহিনী*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮

[১২] তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর *নাগিনী কন্যার কাহিনী* উপন্যাসে জানিয়েছেন যে, বেদেরা বিশ্বাস করে তাদের বসবাসের জন্য মা বিষহরি তাদরে সনদ দিয়েছেন। তাই তারা মানুষকে কোনো প্রকার খাজনা দিত না। দ্র. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়; *নাগিনী কন্যার কাহিনী*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭

[১৩] 'বেদের মেয়ে' গল্পে তারাশঙ্কর তথ্য দিয়েছেন, সমাজের উচ্চবিত্তরা বেদে নারীদের রাতে ভোগ করে দিনে চিনতেও পারে না। আবার সরকারী বড় কর্তাদের মনোরঞ্জনের জন্য বেদে নারীদেরকে বাংলোয় নিয়ে যাওয়া হতো। তারাশঙ্কর সমাজতাত্ত্বিকের দৃষ্টিতে গভীরভাবে *এসব প্রত্যক্ষ করেছেন বলেই বাস্তব জীবনচিত্র এঁকেছেন*। দ্র. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বেদের মেয়ে', *তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ (৩য় খণ্ড)*, সম্পাদনা- জগদীশ ভট্টাচার্য, ১৯৯৭, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, পৃ. ৯১-৯২

[১৪] *নাগিনী কন্যার কাহিনী* উপন্যাসের বেদে-গোত্র প্রধান গঙ্গারাম সুদে তার গোত্রের গরীব লোকদের টাকা ধার দিত। গঙ্গারাম অর্থ দিয়ে মানুষ বশ করার আধুনিক কৌশলেরই আশ্রয় নিত। তারাশঙ্করের নিবিড় প্রত্যক্ষণলব্ধ এ তথ্য নির্ভরযোগ্য। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়; *নাগিনী কন্যার কাহিনী*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৭

[১৫] ক. 'লোক-সংস্কৃতি গবেষণা' (তারাশঙ্কর-সংখ্যা); সম্পাদক : সনৎকুমার মিত্র, কার্তিক-পৌষ, ১৪০৪, পৃ. ৪৩৬
খ. উত্তরকালে রচিত অদ্বৈত মল্লবর্মণ-এর *তিতাস একটি নদীর নাম* উপন্যাসেও ধীবর সম্প্রদায়ের সমাজে বহিরারোপিত ঋণও সুদ সংস্কৃতি অনুপ্রবেশের প্রতিক্রিয়া রূপায়িত হয়েছে।

[১৬] তারাশঙ্করের *নাগিনী কন্যার কাহিনী* উপন্যাসে আমাদের জানিয়েছেন যে, গঙ্গারাম কামাক্ষা থেকে ডাকিনী বিদ্যায় সিদ্ধ হয়ে এসেছে। এতে ধর্মের শতধারার মিশ্রণের আভাস মিলে যা বেদে জীবনে প্রভাব বিস্তার করেছিল। দ্র. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়; *নাগিনী কন্যার কাহিনী*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৩

[১৭] তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়; *আমার কালের কথা*, তারাশঙ্কর রচনাবলী, দশম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃ. ৪৩৯

[১৮] 'লোক-সংস্কৃতি গবেষণা' (তারাশঙ্কর-সংখ্যা); পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩৫

[১৯] তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়; *আমার কালের কথা*, তারাশঙ্কর রচনাবলী, দশম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃ. ৪৪১

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
সাঁওতাল কৌম

ভারতীয় বিভিন্ন আদিবাসী নৃ-গোষ্ঠীর অন্যতম বৃহৎ প্রতিনিধি সাঁওতাল সম্প্রদায়। প্রাক্-দ্রাবিড় তথা আদি অস্ট্রাল[১] শ্রেণিভুক্ত এই আদিবাসী গোষ্ঠীর মৌল নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যসমূহ কালিক ধারাবাহিকতায় ক্রমবিবর্তিত হয়েছে। সুতরাং বর্তমান কালের সাঁওতাল জনগোষ্ঠী মূলত সমাজ-অর্থনীতি-সংস্কৃতির সুদীর্ঘকালব্যাপী সংঘটিত বহুমাত্রিক জটিল পরিবর্তনশীলতারই ফল। সাঁওতালদের নৃতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য অনুধাবনের জন্য এদের উদ্ভব ও বিকাশের প্রকৃতি বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

'সাঁওতাল' নামকরণের উৎস নির্ধারণে অনিবার্যভাবে বহুবিধ মতভিন্নতার সম্মুখীন হতে হয়। কেননা, নৃতাত্ত্বিকগণ অদ্যাবধি এ বিষয়ে কোনো তর্কাতীত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেননি। Skrefsnud-এর মতে, 'সাঁওতাল কথাটির উদ্ভব ঘটেছে সুঁতার (soonter) থেকে'[২]। কিংবদন্তিসূত্রে প্রাপ্ত তথ্যানুসারে সাঁওতালদের পূর্ব নাম ছিল খাববার। 'খর' শব্দটি 'হর' শব্দ থেকে উদ্ভূত যার অর্থ 'মানুষ'। 'সাঁওতালরা যখন মেদেনীপুরের সাঁওত পরগণায় এসে বসবাস শুরু করে তখন তাদের নাম হয় সাঁওতাল। 'বৃহদ্ধর্মপুরাণে' উল্লেখিত 'খর' জাতিই হল সাঁওতাল উপজাতি । ... প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে আমরা যে 'নিষাদ' জাতির উল্লেখ পাই তাদের সাথেও সাঁওতালদের নৃতাত্ত্বিক সাযুজ্য দুর্লভ নয়।'[৩]

আদি-অস্ট্রালদের ন্যায় সাঁওতালরাও খর্বাকার, দীর্ঘশিরস্ক, গাত্রবর্ণ কালো, নাক চেপটা, ঠোঁট মোটা, চুল কোঁকড়ানো এবং দেহের উচ্চতা মাঝারি ধরনের। এছাড়া আরেকটি বিষয়ে আদি-অস্ট্রালদের সঙ্গে সাঁওতালদের যথেষ্ট মিল পরিলক্ষিত হয়। তা হচ্ছে আদি-অস্ট্রালদের রক্তে 'এ' এগ্লুটিনোজেনের (A Agglutinogen) শতকরা হার যেমন বেশি, সাঁওতালদেরও তেমনি। [৪] সাঁওতালদের পূর্ব-ভারতে এসে বসতি স্থাপনের পূর্ব-ইতিহাস আজও অনাবিষ্কৃত। কিংবদন্তি থেকে জানা যায় যে, সাঁওতালরা উত্তর-পূর্ব দিক থেকে পূর্ব বঙ্গের মধ্য দিয়ে পশ্চিম অভিমুখে ছড়িয়ে পড়েছিল।[৫] সাঁওতালদের লোককাহিনীতে হিহিড়ি-পিহিড়ি, খোজকামান, হারাতা পর্বত, সাসাংবেদা এবং চায়ে-চম্পা নামক বিভিন্ন স্থানের নাম পাওয়া যায়। ধারণা করা হয় হারাতা বা জরপী পার্বত্য অঞ্চলকেই পরেশনাথের পাহাড় বলা হয়। কারণ এখনও তারা পরেশনাথের পাহাড়কে 'বারাংবুড়ু দেবতা' বলে কল্পনা করে। আবার অনেক গবেষক চায়ে-চম্পাকেই সাঁওতালদের আদি-বসতি অঞ্চল হিসেবে অনুমান করেছেন। চায়ে-চম্পা বর্তমান হাজারিবাগ মালভূমির উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত। প্রকৃত অর্থে তখনো সাঁওতালরা বিক্ষিপ্তভাবে বসবাসে অভ্যস্ত ছিল।[৬] কালক্রমে তারা পশ্চিমবঙ্গের মেদেনীপুর, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম, হুগলী ও মালদহ জেলায় বসতি স্থাপন করে। তবে সাঁওতালদের বাসস্থান কেবল ওইসব অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল না। পশ্চিমবঙ্গ অপেক্ষা ওড়িশার ময়ূরভঞ্জে, বর্তমান ঝাড়খণ্ডের সাঁওতাল পরগণা, হাজারিবাগ এবং মানভূম জেলায় অধিক সাঁওতাল বাস করত। চায়ে-চম্পা থেকে হিন্দু-আগ্রাসনসহ নানা বৈরি পরিস্থিতির শিকার হয়ে সাঁওতালরা এসব অঞ্চল তথা বাংলা দেশ পর্যন্ত বসতি বিস্তৃত করে।[৭] ব্রাডলে-বার্ট বলেন, 'মুসলমান

Dhaka University Institutional Repository

শাসনের শেষদিকে পর্যন্ত পাহাড়িয়া সাঁওতাল এবং ভূইয়া প্রভৃতি আদিবাসী গোষ্ঠী বর্তমান সাঁওতাল পরগণার অধিত্যকা অঞ্চলে বসতির সন্ধানে দলে দলে আসা যাওয়া করেছে।[৮]

আদি-অস্ট্রাল গোষ্ঠীভুক্ত জনসমষ্টি 'অস্ট্রিক' ভাষা শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত ছিল। সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর ভাষাও 'অস্ট্রিক' ভাষা শ্রেণীর অন্তর্গত।[৯] সাঁওতালদের ভাষাকে খেরওয়াড়ী ভাষা বলা হয়। খেরওয়াড়ী ভাষা অদ্যাবধি তার স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছে। মুন্ডাদের সঙ্গে সাঁওতালদের ভাষাগত ঐক্য রয়েছে। হডসন মনে করেন — হো, সাঁওতালি, ভূমিজ, কুরুখ ও মুন্ডারি হল কোল ভাষার উপভাষা।[১০] আর কোলারীয় উপভাষাগুলির মধ্যে মুন্ডারি, সাঁওতালি এবং হো হচ্ছে প্রধান। গ্রিয়ারসনের মতে, 'মুন্ডা ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে সাঁওতালি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ।[১১] বিহারি ভাষা সাঁওতালদের ভাষার ওপর কেবল শব্দগত প্রভাব ফেলেছে। আর বাংলা ভাষার প্রভাবও অতি-সাম্প্রতিক কালেরই বিষয়। অন্যান্য আদিবাসী গোষ্ঠীর মতো সাঁওতালরাও দ্বিভাষী। পারিবারিক জীবনে নিজস্ব (খেরওয়ারী) ভাষা ব্যবহার করে এবং বৈষয়িক প্রয়োজনে স্থান-কাল-পাত্র ভেদে হিন্দি, তেলেগু ও বাংলা ভাষা ব্যবহার করে। সাঁওতাল আখড়াগুলোতেও যে ঝুমুর গান হতো সেগুলোর বাংলায় প্রতিবর্ণীকৃতরূপ নিম্নরূপ :

ছোট মোট বাঙন বেটী ভাঁড়ায় পড়ে চুল
মোচড়ে বান্ধিব কেশ কদম ফুলের তুল।[১২]

এসব ঝুমুর গানে বাংলা শব্দের মিশ্রণ অনেকটা সুস্পষ্ট। মুন্ডা ভাষাগোষ্ঠীর উপভাষাগুলির মধ্যে সাঁওতালিই প্রধান এবং এ ভাষাই সর্বাধিক ব্যবহৃত ভাষা। মুন্ডারি ভাষার কোনো নিজস্ব লিপি নেই। 'রোমান' লিপিই এ ভাষায় ব্যবহৃত হয়।

দুই

সাঁওতালদের ধর্মবোধ মূলত আচার নির্ভর। অন্যকথায় তাদের আচরিত সংস্কৃতিই তাদের ধর্ম। অরণ্যচারী এই আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে প্রতিনিয়ত প্রকৃতির বহুবিধ প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে যুঝতে হয়। এক্ষেত্রে তাদের নির্ভরযোগ্য আশ্রয় বিভিন্ন অতিপ্রাকৃত শক্তির কল্পনা। ফলে সাঁওতালরা ব্যাপকভাবে পূজা-অর্চনার সংস্কৃতিকে আত্তীকৃত করে নেয়। এ-সকল প্রথার সাহায্যেই বিগঠিত হয়েছে সাঁওতালদের ধর্মীয় সংস্কৃতি। তাদের যেখানে সীমাবদ্ধকতা কিংবা অপারগতা সেখানেই তারা পরিত্রাণের উদ্দেশ্যে শক্তিমান কাল্পনিক দেবতাকে পূজা দেয়। সাঁওতাল সম্প্রদায় প্রধানত সূর্য[১৩] উপাসক। তাদের জাতীয় দেবতা 'মারাঙ বুরু'। প্রাচীনকালে 'মারাঙ বুরু'র আনুকূল্য লাভের প্রত্যাশায় নরবলি দেওয়া হত। বর্তমানকালে অবশ্য নরবলির বিকল্পে লাল ফুলের অর্ঘ্য দেওয়া হয়। খ্রিস্টধর্মে যেমন ত্রিত্ববাদ, হিন্দু ধর্মে যেমন ত্রি-ঈশ্বর, তেমনি সাঁওতাল ধর্ম-বিশ্বাসে ত্রয়ী হচ্ছেন 'মারাঙ বুরু', তার ভাই 'মনিকো' ও বোন 'জহের আরা'।[১৪] এই বোঙাদের জন্য শালকুঞ্জে নির্দিষ্ট পূজা স্থান আছে। সাঁওতালদের নিজস্ব কোনো শাস্ত্র বা ধর্মগ্রন্থ নেই। বিভিন্ন লোককাহিনী থেকে তাদের দেব-দেবী, পূজা-পার্বণ, ধর্মবিশ্বাস ও সংস্কার সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। বহুকাল আর্য ধর্মের সংস্পর্শে থাকার কারণে সাঁওতালদের মধ্যে আর্য-হিন্দু ধর্মের ব্যাপক প্রভাব পড়েছে। আর্য -হিন্দুদের মত সাঁওতালরাও অসংখ্য দেবদেবীর পূজা করে। রাঢ় অঞ্চলে সাঁওতালদের ধর্মজীবনে হিন্দুর নানা পূজা পার্বণের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। কোনো কোনো আর্য দেবদেবী কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত হয়ে যেমন আদিবাসীদের ধ্যান ধারণার নিকটবর্তী হয়েছে, তেমনি অনার্য দেবদেবী সম্পর্কিত চিন্তা-চেতনা পরিবর্তিত হয়ে আর্যসমাজের ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে মিশে গেছে। সাঁওতালদের ধর্মবিশ্বাস মূলত তাদের কৃষিনির্ভর সরল অরণ্যজীবনের লৌকিক বিশ্বাস। সাঁওতালদের ধর্মগুরুকে বলা হয় 'নায়েক'। এই

Dhaka University Institutional Repository

নায়েকই সব ধরনের ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করেন । প্রত্যেক সাঁওতাল পরিবারের আবার দুটি করে বোঙা আছে— 'ওরাক বোঙা' বা গৃহদেবতা এবং 'আবগে-বোঙা' বা গোত্র দেবতা। গৃহকর্তা গৃহদেবতার নাম গোপন রাখেন এবং মৃত্যুকালে পরিবারের জ্যেষ্ঠ ছেলের কাছে ওই নামটি প্রকাশ করে যান।[১৫]

সাঁওতালরা বছরে পাঁচটি প্রধান অনুষ্ঠান পালন করে থাকে। এগুলি হল : পৌষ মাসে ফসল তোলার সময় নৃত্য-গীত ও পানাহারের মধ্য দিয়ে 'সোহারায়' উৎসব, মাঘ মাসে বন থেকে ঘর ছাওয়ার খড় সংগ্রহের জন্য 'মাঘ-সিস' পর্ব, ফাল্গুন মাসের অমাবস্যায় রঙিন পিচকিরির মাধ্যমে রঙ ছিটিয়ে বসন্ত-উৎসব, আষাঢ় মাসে নায়েক-এর তত্ত্বাবধানে মুরগি সংগ্রহ করে শালকুঞ্জর নির্দিষ্ট স্থানে পূজার মাধ্যমে 'এরিক সিম' পর্ব পালন, ভাদ্রমাসে ভাল ফসলের প্রত্যাশায় দেবতার কৃপালাভের উদ্দেশ্যে 'হাড়িয়া সিম' পূজা এবং অগ্রহায়ণে বোঙার নামে শূকর বা ভেড়া বলি দিয়ে সকল গ্রামবাসী মিলে উৎসবমুখর পান-ভোজন উৎসব।[১৬]

উল্লিখিত হয়েছে সাঁওতালদের ধর্ম-বিশ্বাস বিভিন্ন লোকাচার তথা ভয়, বিস্ময়, আত্মরক্ষার প্রবল ইচ্ছা প্রভৃতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। শক্তির প্রসন্নতা লাভ এবং অপশক্তির প্রকোপ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যই তাদের ওইসব লোকবিশ্বাস ও পূজা পার্বণের আয়োজন। অগ্নির দাহিকা শক্তি, প্লাবনের ভয়াবহতা অথবা ঝড়ের ভয়ঙ্কর মূর্তি তাদের চিন্তালোকে অনিষ্টকারী দানবীয় শক্তির প্রতীকরূপেই কল্পিত।[১৭] প্রাকৃতিক শক্তির বিভিন্ন পর্যায়কে প্রকৃতির কোলে লালিত সরল আদিবাসী সাঁওতালরা দেবতা ও অপদেবতারূপে কল্পনা করে এবং তাদের সাহায্য প্রাপ্তি ও অপকারিতা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য নাচগানের মাধ্যমে বিভিন্ন ব্রত পালন করে। সাঁওতালদের সব রকমের পূজাপার্বণেই নৃত্য একটি অপরিহার্য বিষয়। নৃত্য তাদের জীবনাচরণের একটা বিশাল অংশ জুড়ে আছে। নৃত্যের দ্বারা দেবতাদের মনোরঞ্জন করা তাদের যেমন ধর্মীয় কাজের মূল অংশ তেমনি তাদের প্রাত্যহিক জীবনেও জীর্ণতা দূরীকরণে নৃত্যের এবং আনন্দ-যাপনে মদ্যপানের আয়োজন অপরিহার্য।

তিন

ভারতীয় উপমহাদেশে বিভিন্ন অরণ্যচারী অনার্য কৌমগোষ্ঠী ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতায় সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, আর্থনীতিক কারণে আর্য-সভ্যতা দ্বারা প্রবলভাবে প্রভাবিত হয়েছে। ফলে তাদের নিজস্ব অস্তিত্ব-সংকট হয়ে উঠেছে অনিবার্য। যুগপৎ তাদের নিজস্ব ধর্মীয় সংস্কৃতিও হয়েছে শুদ্ধতা বিবর্জিত, মিশ্রণদুষ্ট। সভ্যতার আলোকিত মানুষের প্রকট-প্রখর আলোক বিচ্ছুরণে আদিবাসী মানুষের আপন স্বচ্ছন্দ অন্ধকার কেটে গিয়ে তাদের স্বাজাত্যবোধও বিসর্জিত হয়েছে। ক্ষুধা নামক রাক্ষসের মুখ-গহ্বরে অবক্ষয়িত হয়েছে ধর্ম, সংস্কৃতি, স্বকীয় জীবনধারা ; বদলে গেছে তাদের ঐতিহ্যগত নিজস্বতা[১৮]। সামাজিক, সাংস্কৃতিক, আর্থনীতিক বিবর্তনের ফলে সাঁওতালরা কালক্রমে যেমন আর্য-হিন্দু সভ্যতার সঙ্গে একীভূত হয়ে পড়েছে, তেমনি জীবিকা, জীবনাচরণ এবং চেতনায়ও পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। রমেশচন্দ্র দত্তের মতে, 'সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে এই অর্ধ-হিন্দু অদিবাসীরা প্রতিদিনই হিন্দুধর্মের নিকটবর্তী হচ্ছে। তাদের মধ্যে যারা বেশি অগ্রসর ও সম্মানিত, তারা যে ইতোমধ্যেই হিন্দু ধর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি গ্রহণ করেছে একথা বলা চলে। পক্ষান্তরে, যারা অতিশয় পশ্চাৎপদ, তারাও হিন্দু ধর্মের আচার-বিচারের কিছু না কিছু গ্রহণ করেছে।'[১৯] বহুকাল ধরে সাঁওতাল কৃষ্টির সঙ্গে হিন্দু কৃষ্টির সংমিশ্রণ ঘটেছে, যার ফলিত রূপ প্রত্যক্ষ হয় সাঁওতালদের আচরিত ধর্ম, বিবাহপ্রথা, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ইত্যাদি প্রাত্যহিক জীবনাচরণের নানা ক্ষেত্রে। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, সাঁওতালরা বহু হিন্দু গ্রামে সমবেত হয়ে হিন্দুদের সঙ্গে একত্র দুর্গাপূজা ও হোলি উৎসবেও যোগদান করে।[২০]

Dhaka University Institutional Repository

সাঁওতালদের মৃতদেহ দাহ করা হয়। নিকট আত্মীয়রাই শবদেহ চারপাইতে বহন করে দাহের জন্য নিয়ে যায়। মৃত ব্যক্তিকে স্নান করানো থেকে শ্মশানঘাটে নিয়ে যাওয়া পর্যন্ত নানারকম উপাচার সাঁওতাল কৌমে পালন করা হয়। এর প্রায় সবই অনেকটা হিন্দু ধর্মের অনুকরণে সম্পন্ন হয়ে থাকে। সাঁওতালরা নদী বা জলাশয়ের ধারে চিতা সাজায়। মৃতদেহ অর্ধেক পোড়ানো হলে তারা মারাঙ বুরু দেবতার উদ্দেশে ভাত-মাংস রান্না করে তিন রাস্তার সঙ্গম স্থলে রেখে দেয়।[২১] সাঁওতালদের ধারণা পরলোকে তাদের কৃতকর্মের বিচার হয়। তারা পরজন্মে বিশ্বাসী এবং মৃত্যুর পর পূর্বকৃত কর্মের ফলাফলে আস্থাশীল।[২২] তাদের বিশ্বাস জন্মের সময় ঈশ্বর যতটুকু খাদ্য বরাদ্দ করে দেন তা ফুরিয়ে গেলেই মানুষের মৃত্যু ঘটে। সাঁওতাল সম্প্রদায়ে কোনো নবজাতক শিশুর মৃত্যু ঘটলে তাকে অনানুষ্ঠানিকভাবে মাটিতে পুঁতে ফেলার রীতি প্রচলিত।

বিবাহের ক্ষেত্রে সাঁওতালরা নিজ গোত্রের বাইরে বিয়ের ঘোর বিরোধী। সাঁওতাল কৌমে নানাপ্রকার বিয়ে প্রচলিত থাকলেও অভিভাবকদের মাধ্যমে বিয়ে আয়োজনের প্রথাই বেশি প্রচলিত। ডাল্টনের মতে, 'with such freedom of intercourse, it follows that marriages are generally love matches, and, on the whole, happy ones; but it is considered more respectable if the arrangements are made by the parents or gurdians without any acknowledge reference to the young people, The price to be paid for the girl, overgain five rupees.[২৩] সাঁওতাল সমাজে বিবাহের মাধ্যমে পাত্রীর গোত্রান্তর ঘটে। সাধারণত একটি বিয়েই অধিক প্রচলিত, সঙ্গত কারণে প্রথম স্ত্রীর অনুমতি সাপেক্ষে দ্বিতীয় বিয়ে করা যেতে পারে। বিবাহের রীতি-পদ্ধতি অনেকটা হিন্দুদের মতোই। আদিবাসী এই সমাজে নারীকে যথেষ্ট মর্যাদার সঙ্গে দেখা হয়। ধান-দূর্বা, সিঁদুরের ব্যবহার এবং বিয়ের দিন বর-কনের উপবাস থাকা ইত্যাদি হিন্দু রীতির অনুসরণে সম্পন্ন হয়। শিক্ষিত সমাজের মতো সাঁওতালদের দাম্পত্য-সম্পর্কও বেশ দৃঢ়। স্বামীকে সাঁওতাল নারীরা দেবতারূপে কল্পনা করে।

চার

সাঁওতালদের জীবনধারার সঙ্গে মিশে আছে একটি ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়া। কারণ আদিবাসী জনগোষ্ঠী নিজেদের সুবিধা মত প্রকৃতিকে কাজে লাগানোর জন্য যেসব উপায় অবলম্বন করে তার মূলে রয়েছে ঐন্দ্রজালিক বিশ্বাস। প্রাচীনকালে সাঁওতালরা শিকারের উপরই নির্ভরশীল ছিল। দলবদ্ধভাবে তীরধনুক নিয়ে তারা শিকারে যেত। সাঁওতালদের মধ্যে জেলে শবর বা নিষাদ এবং কিরাতও আছে। বনের ফলমূল, শিকার-করা পাখি ও পশুর মাংস খেয়ে তারা অতীতে জীবনধারণ করত। উত্তরকালে সামন্তশ্রেণি সাঁওতালদের দিয়ে উষর ভূমি চাষযোগ্য করে তোলে। সাঁওতালরা পরিশ্রমী বলে তাদের জমি পত্তন দিয়ে কৃষিকাজে নিযুক্ত করত ওই শ্রেণি। ফলে একসময় কৃষিই তাদের প্রধান পেশায় রূপান্তরিত হয়। সাঁওতাল কৌমে মেয়ে-পুরুষ একত্র কৃষিতে অংশ নেয়। তবে মাটি কর্ষণের কাজটি মূলত পুরুষদের এবং বীজ বোনা ও ফসল তোলার কাজটি মেয়েদের। কেননা, মেয়েদেরকে সাঁওতালরা উর্বর শক্তির উৎস বলে বিশ্বাস করে। আর অধিক ফসলের প্রত্যাশায় তারা এ কাজটি করে থাকে। সাঁওতাল সমাজে কৃষির মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় যত পূজা পার্বণ হয় তা মেয়েরাই সম্পন্ন করে। অধিকাংশ সাঁওতাল কৃষিজীবী হলেও সামাজিক-রাজনৈতিক বাস্তবতার পীড়নে অনেক সাঁওতালকে চা-বাগানের কুলির কাজও নিতে হয়েছে। অধিক পরিশ্রমী হিসেবে সাঁওতাল নারী-পুরুষ উভয়েরই যথেষ্ট সুখ্যাতি আছে। গোত্রভেদে কাজের ক্ষেত্রে সাঁওতালদের কিছু বাধা-নিষেধ আছে। এ ক্ষেত্রে তারা অনেকটা ধর্মীয় বিশ্বাসের অনুসারী।

Dhaka University Institutional Repository

সাঁওতালরা যথেষ্ট সৌন্দর্য ও পরিচ্ছন্নতা প্রিয়। তাদের ঘর-বাড়ি, মেঝে, ঘরের দেওয়াল, বাড়ির আঙিনা সবকিছু বেশ পরিষ্কার ও শিল্পশোভন হয়ে থাকে। সমগ্র আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে সাঁওতাল সংস্কৃতিই সবচেয়ে সমৃদ্ধ। ইতিহাসের এক বিশেষ পর্যায় থেকে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের প্রধান খাদ্য হয়ে ওঠে ভাত। বনের আলু সিদ্ধ করেও তারা খায়। এ-ছাড়া মাছ, কাঁকড়া, শূকর, ইঁদুর, মুরগি, কাঠবিড়ালি, গোসাপ, পাখি, লাল পিপড়া, বন্যপ্রাণী প্রভৃতি তারা আদিকাল থেকে এখনো খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। সাঁওতালদের মধ্যে মাংস শুকিয়ে খাওয়ার প্রবণতাও লক্ষণীয়। তাদের কিছু ট্যাবু (Taboo) রয়েছে। যেমন, হাঁসদাকরা হাঁস খায় না, মুরমরা নীল গাভীর মাংস খাওয়া থেকে বিরত থাকে, কিসকুরা গোত্রভুক্ত ছেলে-মেয়েদের মধ্যে বিয়ে দেয় না, কোনোকোনো গোত্র টিকটিকি মারে না, আতপ চাল খায় না। এসব ট্যাবু তারা মেনে চলে। মদ এদের প্রিয় পানীয়। স্থানীয় ভাষায় এরা মদকে হাড়িয়া বলে। সাঁওতালরা ভাত বা মহুয়া ফুলের রস পচিয়ে নিজেরাই মদ তৈরি করে। মদ সম্পর্কে সাঁওতাল সমাজে অনেক গাথা, উপগাথা প্রচলিত আছে। তারা পূজা-পার্বণ, নাচ-গান, বিয়ে সব অনুষ্ঠানেই প্রচুর মদ পান করে।

সাঁওতাল গোত্রগুলোর মধ্যে তাদের পূর্বপুরুষ কিংবা টোটেম সম্পর্কিত ধারণা ভিন্ন রকমের। যেমন, হাঁসদা গোত্রের উদ্ভব হাঁস থেকে। হেমবরম সুপারি থেকে, মুরমু নীল গাভী থেকে, মারনদী ঘাস থেকে এবং টুডু বাদ্যকর থেকে উদ্ভূত। সাধারণত হাঁসকেই সাঁওতালদের টোটেম হিসাবে ধরা হয়।[২৪]

পাঁচ

প্রায় সব আদিবাসী সমাজব্যবস্থাতেই একটি স্বকীয় সামাজিক কাঠামো থাকে। কৌমের প্রত্যেককে সুশৃঙ্খলভাবে স্ব-স্ব সমাজ-ব্যবস্থার বিধি-বিধান মেনে চলতে হয়। গোষ্ঠী-সংস্কৃতি যেহেতু সমাজ-সংহতির নিয়ামক সেহেতু গোষ্ঠী-প্রধানকে অবজ্ঞা করবার সাহস সমাজের কারো কারো না। সাঁওতাল সমাজ-ব্যবস্থায়ও ওই রকম প্রশাসনিক ধারা প্রাচীনকাল থেকেই বিরাজমান। সাঁওতালদের গ্রাম প্রধানদের নাম 'মাঁঝি', উপ-প্রধান 'পরামানিক', মাঁঝির কর্মাধ্যক্ষ ও গ্রামবাসীর নৈতিক অভিভাবক হলেন 'যোগ-মাঁঝি', প্রধান পূজারীর নাম 'নায়েক', উপ-পূজারীর নাম 'কুমুদ-নায়েক', আর রয়েছে 'গোড়াইৎ পেয়াদা'— যে উর্ধ্বতন সবার আদেশ পালন করে।[২৫] সাঁওতাল সমাজ এই প্রশাসনিক কাঠামোর মধ্যে বেশ নির্বিঘ্নে এবং শান্তিপূর্ণভাবে পরিচালিত হয়। তাদের সরল আরণ্যক সমাজে জীবন-যাপনের জন্য যা চাহিদা তা অরণ্যচারী আদিম এই সন্তানেরা বন-জঙ্গল থেকেই সংগ্রহ করে নেয়। সভ্যতার আলোকপাতের ফলে উত্তরকালে আর্থনীতিক বোধ, সম্পত্তির ধারণা, স্বাধিকার চেতনা ইত্যাদি মৌল বিষয়গুলি তাদের চেতনালোকে আলোড়ন তোলে। নিজস্ব লোকবিশ্বাস কেন্দ্রিক সমাজে কৃষি ও শিকারনির্ভর সমাজজীবন যথেষ্ট স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ ছিল সাঁওতালদের । অরণ্যপ্রীতি তাদের মধ্যে প্রবল। ফলত অরণ্যত্যাগে তারা বরাবরই অনাগ্রহী। এই অরণ্যপ্রীতিকে তাদের নির্জ্ঞান দেশাত্মবোধের বহিঃপ্রকাশরূপে ধরে নেয়া যায়। যে কোনো সমাজ-ব্যবস্থায়ই ভাঙন বা বিবর্তনের মূলে কাজ করে আর্থনীতিক ও রাজনৈতিক পটপরিবর্তন। ইতিহাসের এক বিশেষ পর্বে সাঁওতাল সমাজ-ব্যবস্থায়ও এই ভাঙনের বীজ রোপিত হয়। ভারতীয় উপমহাদেশের ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ভারসাম্যহীনতা সাঁওতাল সমাজ-ব্যবস্থার ভাঙনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।[২৬]

১৭৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশীর প্রহসনমূলক যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতনের মাধ্যমে গোটা ভারতবর্ষে ব্রিটিশ বানিজ্যশক্তির প্রতিনিধি প্রতিষ্ঠান ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।[২৭] দেওয়ানী লাভ থেকে কালক্রমে তারা রাজশক্তিতে অধিষ্ঠিত হয়। শুরু হয় তাদের পুঁজিবাদী বাণিজ্য ও আর্থনীতিক আগ্রাসন।

Dhaka University Institutional Repository

আর্থ-রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির লোলুপ দৃষ্টি সমগ্র ভারতবর্ষের ন্যায় রাজমহল থেকে হাজারীবাগ ও মুঙ্গেরের সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে।[২৮] ওই সময় থেকেই কোম্পানির অর্থলোভী কর্মচারি ও তাদের দেশীয় পুঁজিবাদী বাণিজ্য-সহায়ক মহাজন ও জমিদার শ্রেণি সরলমনা আদিবাসী পাহাড়ি কৌম গোষ্ঠীগুলোর উপর সীমাহীন শোষণ চালাতে থাকে। বীরভূম, বাঁকুড়া, ভাগলপুর, বর্ধমান, মেদেনীপুরের পশ্চিমাংশ ও ময়ূরভঞ্জের শ্বাপদ-সংকুল অরণ্য-অঞ্চল পর্যন্ত কোম্পানি-শাসনের জান্তব থাবা বিস্তার লাভ করে। জমিদার, মহাজন এবং কোম্পনির কর্মচারি-শ্রেণির কাছে সরল বিশ্বাসী আরণ্যক সাঁওতাল জনগোষ্ঠী অসহায় জিম্মিতে পরিণত হয়। ফলে ভাঙন ধরে তাদের স্বকীয় সমাজ-সংস্কৃতিতে ; পরিবর্তন আসে ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনাচারে।

১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে লর্ড কর্নওয়ালিশ 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইন' প্রণয়ন করলেন।[২৯] এই আইনের বাস্তবায়নের ফলে অরণ্যচারী সাঁওতালগোষ্ঠী অবাধ কর্ষণযোগ্য জমি ও জঙ্গলের উপর তাদের অধিকার হারায়। অথচ জঙ্গলকে সর্বদা তারা নিজেদের সম্পত্তি মনে করত এবং একে স্বাধীনভাবে ব্যবহার করা প্রাপ্য অধিকার বলে জানত। জঙ্গল ও জমির ওপর অধিকার হারানোয় তাদের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়। ওই সময়পর্ব থেকেই জীবন ধারণের জন্য তারা মরিয়া হয়ে মহাজন-জমিদার-রাজকর্মচারি ও সমতলবাসীর অস্থাবর সম্পত্তি লুটতরাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে। 'চিরস্তায়ী বন্দোবস্ত' আইন বাস্তবায়নের পর প্রাণান্ত শ্রমের বিনিময়ে জঙ্গল পরিষ্কার করে চাষযোগ্য জমি তৈরি করেছে সাঁওতালরাই, অথচ তারা ওই জমি থেকে ক্রমশ উচ্ছেদ হতে থাকে। ফলে সমগ্র সাঁওতাল কৌমে ক্রমান্বয়ে অসন্তোষ ও বিক্ষোভ দানা বাঁধতে থাকে।

এরও আগে, ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে ক্যাপ্টেন ব্রুক আদিবাসী পাহাড়িয়াদের দমন করবার জন্য সসৈন্যে অগ্রসর হয়েছিলেন। কিন্তু সাঁওতালরা অরণ্যের ভিতর থেকে তীর ছুঁড়ে কয়েকজন সৈন্য হত্যা করে ইংরেজ বাহিনীকে ফিরে যেতে বাধ্য করে।[৩০] ১৭৭৯ খ্রিস্টাব্দে ক্লিভল্যান্ড ভাগলপুরের কালেক্টর নিযুক্ত হয়ে আসেন। তিনি সাঁওতালদের অসন্তোষ দূর করবার জন্য কৌশল অবলম্বন করেন। সরল বিশ্বাসী মানুষগুলির মন জয় করে তাদের আয়ত্তে আনতে প্রয়াসী হন তিনি এবং কিছুটা সাফল্যও লাভ করেন।[৩১]

পরবর্তীকালে শাসক-শ্রেণি শাসন ও শোষণ প্রক্রিয়া সহজতর করবার জন্য একটি পাহাড়ি উপনিবেশ স্থাপনে প্রয়াসী হয়। নাম রাখা হলো 'দামিন-ই-কোহ', যার অর্থ পাহাড়ের প্রান্তদেশ। প্রথমে অরণ্যচারী সাঁওতালরা তাদের স্বাধীন বিচরণ ক্ষেত্র ছেড়ে নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ হতে চায়নি। কিন্তু বণিকের মানদণ্ড শাসকের রাজদণ্ডে পরিণত হতে কালবিলম্ব ঘটল না। অমানুষিক নির্যাতন শুরু হলো সাঁওতালদের ওপর। বিদেশী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হলো সাঁওতালরা। নেতৃত্ব দিল তিলকা মাঁঝি। সাঁওতালদের ওপর দেশীয় শাসক ও শোষক গোষ্ঠীর অন্যায়-অত্যাচারের চরম প্রতিশোধ গ্রহণে তারা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হল এবং নিজেদের সংঘবদ্ধ করে অনেকটা আধুনিক গেরিলা যুদ্ধের প্রক্রিয়ায় শাসক-শ্রেণিকে ভীত ও অতিষ্ট করে তুলল।[৩২] ক্লিভল্যান্ডের মৃত্যুর পর সাঁওতালদের ওপর ইংরেজদের অত্যাচার নির্যাতন বর্ণনাতীতভাবে বৃদ্ধি পায়। তখন বিদ্রোহী আদিবাসীদের ধরার জন্য অরণ্য চষে বেড়ায় ব্রিটিশ সৈন্য। কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তিকে না-পেলে ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দিয়ে তারা ক্ষান্ত হতো। এ-সময় সাঁওতালদের সঙ্গে কোম্পনি সৈন্যের খণ্ড খণ্ড যুদ্ধ সংঘটিত হয়, অনেক সাঁওতাল ওইসব যুদ্ধে ধরা পড়ে, অনেকে নিহত হয়। এ-ধরনেরই এক যুদ্ধে সাঁওতাল-বিদ্রোহের আদি নেতা তিলকা মাঁঝিকে ধরে ব্রিটিশ সৈন্যরা পাশবিক নির্যাতনের পর ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করে।[৩৩] কিন্তু এতে বিদ্রোহ প্রশমিত হয় না, বরং বিস্তার লাভ করল সর্বত্র। এ-সময় শাসকগোষ্ঠী কিঞ্চিৎ অনুধাবন করতে সমর্থ হয় যে, চাপিয়ে দেওয়া পীড়নমূলক অর্থনীতির কুপ্রভাবেই আদিবাসী মানুষ মরণযন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠেছে। স্বীয়

Dhaka University Institutional Repository

সমাজ-ব্যবস্থা, জীবিকার্জন পদ্ধতি, ধর্ম ও জীবনাচরণের ওপর আঘাত প্রতিহত করবার জন্য অরণ্যবাসী মানুষ দ্রোহাগ্নির স্ফুলিঙ্গে পরিণত হয়। সুচতুর ইংরেজরা এর প্রতিক্রিয়ায় সাময়িকভাবে বিদ্রোহীদের বীরভূমের পাহাড় ও জঙ্গল কেটে চাষাবাদের সুযোগ করে দেয়। সাঁওতালরা এভাবেই 'দামিন-ই কোহ'র পূর্বপ্রান্তে সগড়ডাঙা, পিপড়া ও আমগাছিয়াতে প্রথম গ্রাম তৈরি করল । ১৮০৯ খ্রিস্টাব্দে দুমকা ও ১৮১৮ সালে গোড্ডা মহকুমাতেও বসতি স্থাপন করল তারা। ইতোমধ্যে তাদের নতুন করে গড়ে তোলা এইসব আবাসস্থলেও হিন্দু জমিদার ও মহাজনরা নিজেদের ভূমিলোলুপ হাত প্রসারিত করে। তারা ক্রমাগত পাহাড়ি এলাকা অধিগত করতে থাকায় 'দামিন-ই কোহ'র চারপাশে সীমানা নির্ধারণ করবার দায়িত্ব দেওয়া হয় জন পেটিওয়ার্ডের ওপর। ১৮৩২-৩৩ খ্রিস্টাব্দে পিলপা দ্বারা স্থায়ীভাবে 'দামিন-ই-কোহ' অঞ্চল গঠিত হয়।[৩৪] এই 'দামিন-ই-কোহ' অঞ্চলে গোত্র পঞ্চায়তের মাধ্যমে একটি বিশেষ সমাজকাঠামো তৈরি ও চালু হয়। সাঁওতালদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে অল্পদিনের মধ্যেই এই অঞ্চল ঐশ্বর্যমণ্ডিত হয়ে উঠলে ঘটনাচক্রে বিচ্ছিন্ন সাঁওতালরা দলে দলে জড়ো হয়ে বৃহত্তর সাঁওতাল গোষ্ঠী পুনর্গঠনে সক্ষম হয়। কিন্তু ব্রিটিশ রাজনীতি ও অর্থনীতির লাগামহীন স্বার্থপরতার অপরিহার্য পরিণাম হিসাবে এখানেও হিন্দু মহাজন ও ব্যবসায়ীদের আবির্ভাব ঘটে। ফলত সরল আদিবাসীরা পুনরায় জড়িয়ে পড়ে জটিল আর্থনীতিক ফাঁদের আবর্তে। দাদন, বন্ধক, নিলাম, ঠিকা মুজুরি, সুদ ও তেজারতি ইত্যাদি আর্থনীতিক কুটিলতায় ইতিহাসের এই পর্বে সাঁওতালরা ক্রমান্বয়ে জমি শস্য মহিষ সবকিছু হারিয়ে বংশানুক্রমে কৃতদাসে পরিণত হতে থাকে। এই সময় থেকেই সাঁওতাল, মুন্ডা, ওঁরাও হোওঁ প্রভৃতি আদিবাসী গোষ্ঠী পুনরায় সংক্ষুব্ধ হতে থাকে।[৩৫] সাঁওতালদের শ্রমলব্ধ লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের সবটাই স্থানান্তরিত হতে থাকে ইংরেজ কুঠি মহাজন ও ব্যবসায়ীদের ঘরে। জমি তৈরির সময় তাদেরকে নিষ্কর জমি ভোগের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও, পরে প্রতিশ্রুতির বরখেলাপ করে তাদের চাষবাসের জমির ওপর ব্যাপকহারে করারোপ করা হয়। 'দামিন-ই-কোহ থেকে ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দে খাজনা আদায়ের পরিমাণ ছিল ২০০০ টাকা। কিন্তু ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৪৩৯১৮ টাকা ১৩ আনা ৫॥ পয়সায়।[৩৬] এই তথ্য থেকেই শোষণ আর নিপীড়নের মাত্রা অনুধাবনযোগ্য।

ছয়

সাঁওতালদের বহুদিনের পুঞ্জীভূত যন্ত্রণার ঐতিহাসিক বহিঃপ্রকাশ ঘটে ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে। এ-সময় সাঁওতাল কৃষকদের বিদ্রোহ ও বিক্ষোভ প্রতিরোধে সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হয় ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী। সমগ্র ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসে এটি একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। সাঁওতাল কৌমের যুগলভ্রাতা সিধু ও কানহুর নেতৃত্বে প্রথমে সাঁওতালেরা আক্রমণ করে জমিদার মহাজনদের, পরে ইংরেজ সৈন্যদের। সংগ্রামে পরাস্ত হলেও তারা কৃষকসভার মাধ্যমে পরবর্তীকালে আবার সংগঠিত হতে থাকে। সাঁওতাল কৃষকদের সঙ্গে অন্যান্য কৃষকরাও ওই বিদ্রোহে একাত্মতা ঘোষণা করেছিল। ফলে সাম্প্রদায়িকতার সীমানা ছাড়িয়ে বিদ্রোহ সার্বজনীন রূপ লাভে সক্ষম হয়।[৩৭] ডাব্লু ডাব্লু হান্টার তাঁর *দ্য অ্যানালস অব্ রুরাল বেঙ্গল* গ্রন্থে সাঁওতাল বিদ্রোহ সম্বন্ধে লিখেছেন, 'সমতল ভূমি দিয়ে কলিকাতা অভিমুখে যাত্রার সাধারণ নির্দেশ শিবিরে প্রচারিত হয় এবং ১৮৫৫ সনের ৩০ শে জুন এই বিশাল অভিযাত্রা শুরু হয়। নেতাদের শুধু দেহরক্ষীর সংখ্যাই ছিল ৩০ হাজার জন। এটি পৃথিবীর প্রথম এবং বৃহৎ গণ-অভিযান ছিল।[৩৮] আদিবাসীরাই ভারতবর্ষের প্রকৃত স্বদেশী। তাদের আত্মত্যাগ ইতিহাসের এক অম্লান অধ্যায়। বুর্জোয়া ঐতিহাসিকেরা সাঁওতালদের এই আত্মত্যাগের ইতিহাসকে 'হাঙ্গামা' বলে প্রচার করেছেন। তাঁদের ভাষায় এটি ছিল আদিম ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ মাত্র। কিন্তু ইতিহাস কখনো চাপা থাকে না।

Dhaka University Institutional Repository

ভি. বাঘবাইয়া ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দের সাঁওতাল বিদ্রোহ সম্পর্কে লিখেছেন, 'বিভিন্ন আদিম জাতির সঙ্গে সংগ্রামের অঙ্গ হিসাবে নানা জটিলতার কিছুটা পূর্ব অভিজ্ঞতার পর ব্রিটিশ ইন্ডিয়া কোম্পানির সরকারকে সম্ভবত বৃহত্তম আদিবাসী অভ্যুত্থানের, ১৮৫৫ সালের সাঁওতাল জাতির বিদ্রোহের সম্মুখীন হতে হলো। এর আগে অবধি ব্রিটিশরা জানত না আদিবাসীদের সঙ্গে সংঘাতের অর্থ কি, সুতরাং এবার ব্রিটিশদের এই সমস্যা মোকাবেলা করবার জন্য খুব ভাল ভাবে তৈরি হতে হলো। এ জন্যই আমরা দেখতে পেলাম সাঁওতালদের সঙ্গে এবং প্রায় একই সময় এ দেশের আরেকটি উপজাতি, মুন্ডাদের সঙ্গে আচরণে ব্রিটিশরা আরো বেশি সতর্ক, আরো বেশি যত্নবান হযেছে।'[৩৯] সাঁওতাল বিদ্রোহ বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা নয়। স্বদেশ, স্বজাতি ও স্বসংস্কৃতির প্রতি সরল প্রকৃতির এই মানুষদের ছিল প্রগাঢ় মমত্ববোধ। স্বরাজ প্রতিষ্ঠার জন্যই সাঁওতালরা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছিল। স্বাধীনচেতা এ গোষ্ঠী কোনোদিন পরাধীন থাকতে চায়নি। সামগ্রিক অবস্থা এমন পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল যে, সেদিন সাঁওতালদের বিদ্রোহ করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। ওই বিদ্রোহের সময়ে সাঁওতালদের জীবন কতটা সংকটাপন্ন ছিল এবং তাদের দেশপ্রেম কতটা গভীরে প্রোথিত ছিল তার প্রমাণ মেলে সমসাময়িক একটি গানে—

আমরা প্রজা, সাহেব রাজা, দুঃখ দেবার যম
তাদের ভয়ে হটবো মোরা এমনি নরাধম?
মোরা শুধু ভুগবো?
না, না মোরা রুখবো?[৪০]

এ গানের মধ্যে সাঁওতালদের সামগ্রিক চেতনার আপোষহীন সংগ্রাম আর স্বরাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্নই প্রতিফলিত হয়েছে। সারল্য, শ্রমনিষ্ঠা, সত্যনিষ্ঠা এবং স্বাধিকার চেতনা ছিল সাঁওতালদের মজ্জাগত প্রবণতা। সাঁওতাল বিদ্রোহের সূচনা থেকেই তাদের মধ্যে সচেতনভাবে স্বাধিকারবোধ কাজ করেছিল। পুলিশ মহাজন আর শাসক শ্রেণির অত্যাচারের স্মৃতি তাদের মধ্যে দেশপ্রেমকে প্রবলতর করে তোলে। এ কথা বলা বাহুল্য যে, সাঁওতালরা বিদ্রোহ করেছিল স্বাধীনতার জন্য। পরবর্তীকালে ডব্লিউ জি আর্চার লিখেছেন— 'এটা এখন সকলেই স্বীকার করেন যে, সাঁওতাল বিদ্রোহের একটা গভীরতর, অন্ততপক্ষে অতিরিক্ত কারণ হচ্ছে সাঁওতালদের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ; যখন তাদের মাথার উপর কোনো উৎপীড়ক প্রভু চেপে বসেনি সেই প্রাচীন অতীত দিনের স্বপ্ন; হয়তোবা প্রাগৈতিহাসিক যুগের সেই স্মৃতি, যখন কোনো কোনো পণ্ডিতের মতে সাঁওতালরা নিজেরাই ছিল গাঙ্গেয় উপত্যকার একচ্ছত্র প্রভু এবং আর্য আক্রমণকারীদের দ্বারা তখনও সেখান থেকে তাড়া বিতাড়িত হয়নি। যাই হোক না কেন, কোনো কোনো সময় সাঁওতালদের মধ্যে 'খেরওয়াড়ী' নামে একটা আন্দোলন দেখা যায়। 'খেরওয়াড়ী' সাঁওতালদের প্রাচীন নাম এবং সাঁওতালদের মনে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত হয়ে আছে সেই অতীত দিনের স্মৃতি, যখন তারা চম্পা দেশে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে বাস করত; কাউকে খাজনা বা কর দিতে হত না, কেবল সর্দারগণকে সামান্য কিছু বার্ষিক খাজনা দিলেই চলত।' [৪১] এর থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, সাঁওতালদের বিদ্রোহ সাম্রাজ্যবাদী শোষক ইংরেজ বাহিনীর বিরুদ্ধে পরিকল্পিত এবং সচেতন সংগ্রাম। এটা কোনো আকস্মিক ঘটনামাত্র নয়। কালিক-গতিধারায় বিশ্বের সবকিছুতেই আসে বিবর্তন। বিশ্বরাজনীতি, অর্থনীতি, সভ্যতার নতুন নতুন যান্ত্রিক উদ্ভাবন সর্বোপরি মানুষের জীবনধারায়ও আসে পরিবর্তন। আরণ্যক সমাজেও এর ব্যত্যয় ঘটেনি। বাংলার স্বাধীনতা হৃত হওয়ার পর থেকে আদিবাসীদের উপর নেমে আসে অকথ্য নির্যাতন। বিপর্যস্ত হতে থাকে তাদের স্বাভাবিক জীবনগতি। ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থার আগ্রাসনে

Dhaka University Institutional Repository

সাঁওতালদের সামগ্রিক জীবনে দেখা যায় ব্যাপক পরিবর্তন। বহুমাত্রিক আর্থনীতিক শোষণের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয় তারা। প্রাচীনকাল থেকে যে নৃ-গোষ্ঠী ভূমিনির্ভর আরণ্যক জীবনে অভ্যস্ত, ভূমি থেকে উন্মূলিত হয়ে তারা পেশা পরিবর্তনে বাধ্য হয়। জমিদার, মহাজন ও শাসক শ্রেণির শোষণের ফলে হাজার বছরে গড়া ঐতিহ্যিক জীবনধারা থেকে বিচ্যুত হয়ে তারা ভূমিহীন শ্রমজীবীতে রূপান্তরিত হয়। ব্রিটিশ সরকার প্রবর্তিত ভূমি আইন সাঁওতালদের শোষণের সহজ শিকারে পরিণত করে। যা তাদেরকে আদি পেশা থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। সাঁওতাল তথা আদিবাসী সম্প্রদায়ের ওপর আরেকটি বড় আঘাত ছিল ব্রিটিশ সরকারের বন-সংরক্ষণ নীতি। ওই নীতিবলে বনের ওপর আদিবাসীদের সার্বিক অধিকার হরণ করা হয় অন্যায়ভাবে। জীবিকার জন্য অনন্যোপায় হয়ে সাঁওতালরা তখন থেকে কৃষিজীবী থেকে শিল্প-কারখানা ও বাসা-বাড়ির মুজুরে পরিণত হয়ে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত জীবন বেছে নিতে বাধ্য হয়। অরণ্য-নির্ভর মানব সন্তান অরণ্যের জন্মগত অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে এভাবেই।

তথ্যনির্দেশ

১ ড. অতুল সুর, *বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়*, ১৯৭৯, জিজ্ঞাসা, কলকাতা, পৃ. ২৩

২ আবদুস সাত্তার, *আরণ্য জনপদে*, ১৯৬৬, জলি বুকস, ঢাকা, পৃ. ২৫৯

৩ ড. অতুল সুর: *ভারতের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়*, ১৯৮৮, সাহিত্যলোক, কলকাতা, পৃ. ২০০

৪ ড. অতুল সুর, *বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়*, ১৯৭৯, জিজ্ঞাসা, কলকাতা, পৃ. ২৩

৫ *পাকিস্তানের উপজাতি*, ১৯৬৩, পাকিস্তান পাবলিকেশনস, পাকিস্তান সেক্রেটারিয়েট, ঢাকা, পৃ. ১

৬ ডক্টর মুহম্মদ আবদুল জলিল, *বাংলাদেশের সাঁওতাল সমাজ ও সংস্কৃতি*, ১৯৯১, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ৬

৭ ড. অতুল সুর: *ভারতের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়*, ১৯৮৮, সাহিত্যলোক, কলকাতা, পৃ. ১৯৯-২০০

৮ সুবোধ ঘোষ, *ভারতের আদিবাসী*, ১৩৫৫, ন্যাশনাল বুক এজেন্সী, কলকাতা, পৃ. ২৭

৯ ড. অতুল সুর, *বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়*, ১৯৭৯, জিজ্ঞাসা, কলকাতা, পৃ. ২৪

১০ *পাকিস্তানের উপজাতি*, ১৯৬৩, পাকিস্তান পাবলিকেশনস, পাকিস্তান সেক্রেটারিয়েট, ঢাকা, পৃ. ১০

১১ *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১১

১২ *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১২

১৩ আবদুস সাত্তার, *আরণ্য জনপদে*, ১৯৬৬, জলি বুকস, ঢাকা, পৃ. ২৮০

১৪ *পাকিস্তানের উপজাতি*, ১৯৬৩, পাকিস্তান পাবলিকেশনস, পাকিস্তান সেক্রেটারিয়েট, ঢাকা, পৃ. ১০

১৫ *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০

১৬ *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০

১৭ অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাঁকুড়ার মন্দির*, ১৩৭১, শিশু সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, পৃ. ৩২-৩৪

১৮ অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩১-৩২

১৯ *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩২

২০ *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৪

২১ *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৫

২২ Dalton, Edward Tuite, *Tribal History of Eastern India*, 1978, Cosmo Publicatiobs, New Delhi, p. 218

২৩ *পূর্বোক্ত*, p. 215

২৪ আবদুস সাত্তার, *আরণ্য জনপদে*, ১৯৬৬, জলি বুকস, ঢাকা, পৃ. ২৭০-৭২

২৫ *পাকিস্তানের উপজাতি*, ১৯৬৩, পাকিস্তান পাবলিকেশনস, পাকিস্তান সেক্রেটারিয়েট, ঢাকা, পৃ. ৯

Dhaka University Institutional Repository

[২৬] 'সামাজিক সংহতি ভেঙে পড়ার ব্যাপারে প্রথম দুটি কারণ হলো— ১. হিন্দু সমাজভুক্ত হওয়ার প্রক্রিয়া; ২. খৃস্টান ধর্ম গ্রহণ করা... এর ফলে উপজাতীয় সমাজে বাঙন সম্ভব হয়েছে।' সুবোধ ঘোষ, *ভারতের আদিবাসী*, ১৩৫৫, ন্যাশনাল বুক এজেন্সী, কলকাতা, পৃ. ১৮৩

[২৭] ভীষ্মদেব চৌধুরী, *তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়ের উপন্যাস: সমাজ ও রাজনীতি*, ১৯৯৮, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ৪

[২৮] ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে, *সাঁওতাল গণসংগ্রামের ইতিহাস*, ১৯৯৬, পার্ল পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃ. ৮

[২৯] ভীষ্মদেব চৌধুরী, *তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়ের উপন্যাস: সমাজ ও রাজনীতি*, ১৯৯৮, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ৯

[৩০] ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯

[৩১] পূর্বোক্ত, পৃ. ৯-১০

[৩২] পূর্বোক্ত, পৃ. ১১

[৩৩] পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩-১৪

[৩৪] পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯-২০

[৩৫] সুবোধ ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃ.৪০-৪১

[৩৬] ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬

[৩৭] পূর্বোক্ত, ভূমিকাংশ দ্রষ্টব্য

[৩৮] বলা হয় মাও-সে-তুঙের লং মার্চই প্রথম লং মার্চ। কিন্তু সাঁওতালদের এ লং মার্চ মাও-সে-তুঙ এর বহুপূর্বেই ঘটেছিল। পূর্বোক্ত, ভূমিকাংশ দ্রষ্টব্য

[৩৯] পূর্বোক্ত, পৃ. ৩-৪

[৪০] হোসেন উদদীন হোসেন, *বাংলার বিদ্রোহ*, ১৯৪৭, বিদ্যাপ্রকাশ, ঢাকা, পৃ. ১৩৪

[৪১] ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

তারাশঙ্করের উপন্যাসে কৌমজীবনের রূপায়ণ

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম পরিচ্ছেদ

হাঁসুলীবাঁকের উপকথা উপন্যাসে কাহার জীবনের রূপায়ণ

হাঁসুলীবাঁকের উপকথা তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস এবং সমগ্র বাংলা সাহিত্যেরও একটি কালজয়ী সাহিত্যকর্ম। উপন্যাসটিতে সমাজগতি তথা ইতিহাসের গতিরেখা অসামান্য নৈপুণ্যে রূপায়িত হয়েছে। এতে একদিকে যেমন বাংলার সামাজিক রূপান্তরের চিহ্ন অঙ্কিত হয়েছে তেমনি ওই রূপান্তর-প্রক্রিয়ায় যে কৌম-জনগোষ্ঠীকে অবলম্বন করে উপন্যাসখানি বিকশিত হয়েছে, সেই শ্রেণির সামগ্রিক জীবনধারাও বস্তুনিষ্ঠ ও অনুপুঙ্খ রূপায়ণে প্রতিভাসিত হয়েছে। উপন্যাসটিতে কাহার নামে পরিচিত একটি আদিম জনগোষ্ঠীর উদ্ভব, বিকাশ ও পরিণতি ইতিহাসশাসিত কালের পরিচর্যায় শিল্পসৃজন করেছেন তারাশঙ্কর। কাহারকৌমের অবিমিশ্র বাস্তব অর্থাৎ আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবনের স্বরূপ তথা ওই আদিম গোষ্ঠীর টোটেম, প্রত্নপ্রতিমা (archeytypes) এবং উপকথা-উদ্ভূত বিশ্বাস ও জীবনসত্য *হাঁসুলীবাঁকের উপকথায়* জীবন্ময় হয়ে উঠেছে।

কোপাই নদী যেখানে হাঁসুলীর মত বাঁক নিয়েছে তার তীরেই বাঁশবাদী গ্রাম। নদীর তীরটি নিবিড় বাঁশঝাড় দিয়ে ঘেরা বলেই এর নাম বাঁশবাদি। আড়াইশত বিঘার এই গ্রামে মাত্র ত্রিশঘর কাহার আদিবাসীর বাস। দুটি পুকুরের চারধারে এদের বসতি। অপেক্ষাকৃত ভদ্রলোকের বৃহৎ গ্রাম জাঙালের অবস্থান বাঁশবাদির উত্তরে। পশ্চিমে গ্রামের গা ঘেঁষে বেলতলায় কাহারদের দেবতা কালারুদ্রের সহচর বাবাঠাকুরের আসন। নৃতাত্ত্বিকদের আলোচনায় আদিবাসী কাহার সম্প্রদায়ের কোনো শাখা-গোষ্ঠীর উল্লেখ না থাকলেও তারাশঙ্কর *হাঁসুলীবাঁকের উপকথা*-য় কাহারদের স্থানীয় দুইটি গোষ্ঠীর কথা উল্লেখ করেছেন। এরা হচ্ছে বেহারা কাহার ও আটপৌরে কাহার। ১২৫০ বঙ্গাব্দে নীলকর সাহেব মেস্তর জনকিন্স জাঙাল ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল পত্তন নেন। তিনি নীল চাষের সুবিধার জন্য বেহারা কাহারদের দিয়ে পুকুর কাটান। উত্তরকালে নীলকর সাহেবরা জমি হাসিল ও নীল চাষের কাজেও কাহারদের শ্রম ব্যবহার করে । মূলত ওই সময় থেকেই বাঁশবাদিতে কাহার সম্প্রদায়ের বসতি গড়ে ওঠে। যে-সব কাহার ইংরেজ নীলকরদের কেবল পাল্কী বহন করত তাদেরকে বলা হত বেহারা কাহার। আর কাহারদের যে-অংশ অষ্ট-প্রহর নীলকরদের লাঠিয়াল বাহিনী হিসেবে বউ-ঝিসহ চাকরান-ভোগীর মতো কাজ করত তাদেরকে বলা হত আটপৌরে কাহার। পেশাগত কারণে কাহার সম্প্রদায় দুটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত হলেও তাদের ধর্মভিত্তি ও 'করণ-কারণ' ছিল অভিন্ন। জনকিন্সের সময় থেকেই এই দুই গোষ্ঠী কাহারদের মধ্যে গোষ্ঠীগত শ্রেষ্ঠত্বের দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। আটপৌরেরা অষ্ট-প্রহরের কর্মী বলেই নিজেদেরকে বেহারা কাহারদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করত। জনরোষ ও ঐতিহাসিক নীল-বিদ্রোহের পর নীলকুঠি উঠে গেলে চৌধুরীকর্তারা এই অঞ্চলের মালিকানা করায়ত্ত করেন। কাহাররা পূর্বের ন্যায় চৌধুরীকর্তাদের বাড়িতেই বেহারা ও প্রহরীর কাজ করত। এ-সূত্রে চৌধুরীকর্তাও তাদের বসবাসের 'ভিটাপত্তনি' বহাল রাখেন। এভাবে বহুকাল ধরে দুটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত কাহার সম্প্রদায় বাঁশবাদিতে বসবাস করে আসছে। যে 'বর্তমান'-সময়পটে উপন্যাসের সূচনা হয়েছে তাতে দেখা যায়, বেহারা কাহারদের মাতব্বর বানোয়ারি আর আটপৌরে কাহারদের মাতব্বর

Dhaka University Institutional Repository

পরম। কোশকেঁধে বেহারা কাহার অপেক্ষাকৃত বেশি পরিশ্রমী এবং সংখ্যায়ও তারা অধিক। নীলকর সাহেবদের আমল থেকেই মূলত কৃষিজীবী এই আদিবাসী সম্প্রদায় ভদ্রশ্রেণীর সেবাদাস হিসেবে কাজ করে আসছে। তাদের জীবনের ঘটে যাওয়া সব ঘটনাকেই তারা নিজেদের ভাগ্যলিখন বলে মনে করে। তাদের দেবতা কালারুদ্র। এই কালারুদ্রই তাদের ভালমন্দের নিয়ন্তা। প্রাত্যহিক জীবনের সবকিছুর সঙ্গে তারা দেবতার সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টির কার্যকারণ সম্পর্ক খুঁজে বের করে। কালারুদ্র প্রকৃতপক্ষে শিবেরই স্থানিক রূপান্তরিত দেবতা। কর্তাবাবা বা বাবাঠাকুর তাঁর সহচর। বাঁশবনের ধারে শেওড়া ঝোঁপের মধ্যবর্তী বেলতলাই ব্রহ্মদৈত্যতলা। এখানেই অদৃশ্য কর্তাবাবার অবস্থান। বাবা ঠাকুর এখান থেকেই কাহার সম্প্রদায়কে প্রতিপালন, শাসন ও রক্ষা করেন। কাহারদের বিশ্বাস ওই বেলতলাতে গেরুয়া বসন ও দণ্ডধারী কর্তাবাবা পায়ে খড়ম, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা ও ধবধবে পৈতার শোভা নিয়ে ন্যাড়া মাথায় সারা রাত ঘুরে বেড়ান। কাহারদের সুরক্ষা ও শাস্তিবিধান কর্তাবাবার কর্তব্য। বাঁশবাদির কাহারদের জীবনপরিক্রমার কেন্দ্রস্থল বাবাঠাকুরের অবস্থানস্থল ওই বেলতলা। হাঁসুলীবাঁকের বাঁশবাদিতে কাহার গোষ্ঠীর প্রতিটি ক্রিয়াকর্মের মধ্যেই বাবাঠাকুরের সন্তুষ্টি অসন্তুষ্টির প্রশ্ন জড়িত। এই আদিবাসী গোষ্ঠীর নিজস্ব ধর্মবিশ্বাসকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয় তাদের জীবন। কাহারদের অতিলৌকিক বিশ্বাস, কুসংস্কার আর ধর্মবোধের মধ্যেই তাদের জীবন গণ্ডিবদ্ধ। হাঁসুলীবাঁকের বাঁশবনের ঘন অন্ধকারের মতোই তাদের জীবন অন্ধবিশ্বাস আর পূর্বপুরুষের 'রীতকর্মে'র ধারাবাহিকতায় চলমান। বাঁশবনের নিচের জমাট অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসা 'আলো'কে তারা পাপ আর অধর্মের সংকেত মনে করে। বাঁশবাদির বাঁশবন আর ঘন জঙ্গলের অন্ধকারের মধ্যে কাহারদের বেড়ে ওঠা এবং এই অন্ধকারকে ঘিরেই তাদের জীবন। 'কালারুদ্দুর' আবাসস্থলও অন্ধকার অরণ্যে এক অতিলৌকিক আবহ তৈরি করে রেখেছে। 'কালারুদ্দু' বা কালারুদ্রকে কাহাররা 'বুড়ো শিব' নামেও ডাকে। বেলতলার বাবাঠাকুরেরও দেবতা এই 'কালারুদ্দু'। কালারুদ্রের প্রধান ভক্ত নিচু জাতের লোকই হয়ে থাকে — আদিকাল থেকেই গোষ্ঠীগত এই নিয়তি কাহারদের জীবনবিশ্বাসের অংশ। তাদের বিশ্বাস ও নিয়তির নিগূঢ় পরিচয় সুচাঁদ পিসির বিবৃত উপকথায় বিধৃত হয়েছে উপন্যাসে। কাহারদের বিশ্বাস প্রাকৃতিক দুর্যোগ, অকাল মৃত্যু, ফসল না হওয়া বা অধিক ফলন ইত্যাদি সবকিছুই বাবা ঠাকুরের ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর নির্ভরশীল। আর তাই বেলতলার মহারাজ কর্তাবাবার প্রতি সমগ্র কাহার গোষ্ঠীর এত ভয়। কর্তাবাবার সন্তুষ্টি বিধানে তারা তৎপর। সব আদিবাসী সম্প্রদায়ের মতো কাহার সম্প্রদায়েরও নিজস্ব গোষ্ঠীজীবনের শাসন-শৃঙ্খলের পরিচয় প্রকাশিত হয়েছে *হাঁসুলী বাঁকের উপকথার* কাহারদের গোষ্ঠীজীবনেও। বাবাঠাকুরের পূজা পরিচালন ও তাঁকে তুষ্ট রাখার দায়িত্বও অনেকটা গোষ্ঠীপ্রধান বনওয়ারীর ওপর ন্যস্ত। তথাপি বেলতলার মহারাজ অদৃশ্য কর্তাবাবা কাহার সম্প্রদায়ের কাছে অধিক জীবন্ত। কর্তাবাবার প্রতি কাহারকৌমের ভয়মিশ্রিত অতিলৌকিক বিশ্বাস দ্বারাই পরিচালিত হয় তাদের জীবন। দেবতা কালারুদ্র যদিও কাহারদের কাছে অধিকতর শক্তিমান তবু কালারুদ্রের চেয়ে বাবাঠাকুরকেই তারা বেশি উপলব্ধি করে। কেননা বাবাঠাকুর অধিক জাগ্রত। কাহারদের বিশ্বাস বেলতলায় অবস্থান করে কাহারকুলকে সর্বদা বাবাঠাকুরই রক্ষা করে যাচ্ছেন সকল আপদ থেকে। কাহারদের কাছে বাবাঠাকুর কালারুদ্রেরই ছায়া। কাহারদের সমাজ-জীবন, অর্থনীতি, কৃষি, পেশা, ঘর-বাড়ি নির্মাণ, 'অঙ' অর্থাৎ রঙের খেলা বা প্রেমের খেলা ইত্যাদি সবকিছুই নিষেধ বা সম্মতির বেড়াজালে আবদ্ধ। ভয় আর শঙ্কাপূর্ণ হলেও বাবাঠাকুরের 'থান' ওই বেলতলাই তাদের মহাপবিত্র স্থান।

Dhaka University Institutional Repository

দুই

হাঁসুলী বাঁকের কাহার পাড়ার জীবনে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য ভয়মিশ্রিত উপকথা, সংস্কার আর লৌকিক বিশ্বাস। দেবতা কালারুদ্র, বেলতলার মহারাজ কর্তাবাবা আর তাদের পিতৃপুরুষদের নিয়েই তৈরি হয়েছে কাহারদের উপকথা। হাঁসুলী বাঁকের 'আদ্যিকালের বুড়ি' কথক সুচাঁদ পিসি হেসে-কেঁদে, নেচে-গেয়ে অথবা ঝগড়ার ভঙ্গিতে বিবৃত করে ওইসব উপকথা। আর উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র পাগল, ছড়া আর গানে অর্থাৎ সুর ও ছন্দে সে-সব উপকথাকেই ভিন্ন আঙ্গিকে উপস্থাপন করে। উপকথাগুলোর অভ্যন্তরেই নিহিত রয়েছে কাহারদের জীবনবিধান। কালারুদ্র আর তার সহচর বাবাঠাকুর-কেন্দ্রিক উপকথা সর্বদা তাদের মুখে মুখে প্রচারিত হয়। কাহার সম্প্রদায় হাঁসুলী বাঁকে ঘটে যাওয়া যে-কোনো ঘটনার সঙ্গেই ওইসব উপকথার যোগসূত্র খোঁজে, পেয়েও যায়। উপন্যাসেরও শুরু হয়েছে কর্তাবাবা সম্পর্কিত একটি উপকথা দিয়ে। বাঁশবনের ভেতর থেকে ক্রমাগত শিস ধ্বনিত হওয়ায় — কাহারদের ধারণা জন্মে যে, কর্তাবাবা কোনো কারণে রুষ্ট হয়েছেন বলেই ব্রহ্মদৈত্যতলার 'থান' থেকে শিস ধ্বনিত হচ্ছে। তাদের আশঙ্কা তিনি বেলতলার জঙ্গল থেকে চলে যাচ্ছেন। নদীর ধার দিয়ে চলে যাবার সময় কাহারদের শিস দিয়ে জানিয়ে যাচ্ছেন তাঁর প্রস্থানের কথা। এর প্রাথমিক কার্যকারণ সূত্রও তারা খুঁজে বের করে। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস কর্তার থানে ত্রুটিযুক্ত পাঁঠা বলি দেওয়া হয়েছিল বলেই কর্তাবাবা ক্ষেপেছেন। কর্তাবাবার অসন্তুষ্টিই কাহারকৌমের সবচেয়ে বিপদের কথা। এ ধারণার সরব সমর্থক কাহারদের উপকথার কথক সুঁচাদ বুড়ি। সুঁচাদের মুখে দেবতারই সাবধানবাণী যেন ধ্বনিত হয় এভাবে,

'ভাল লয়, ভাল লয়, এ কখনো ভাল লয়।' [১] কাহারদের উপকথায় আছে বাবার দয়ায়ই হাঁসুলী বাঁকের সমৃদ্ধি। তিন পুরুষ আগে চৌধুরীরা সামান্য গৃহস্থ আর সাহেবদের নীলকুঠির গোমস্তা ছিল। নীল কুঠির অবস্থাও তখন বিলুপ্তির পথে। একদিন শুরু হল কোপাইয়ের বান। রাতে এল তুফান। অন্ধকার সেই ঝড়-জলের রাতে সবকিছু ভাসতে লাগল। সাহেব-মেম গাছে চড়ে বসল। নদীতে আলোকোজ্জ্বল সুসজ্জিত নৌকা দেখা গেল। নৌকা এসে থামল হাঁসুলী বাঁকের দহের মাথায়। সাহেব সেই নৌকা ধরতে গেলেন মেমের নিষেধ না শুনে। তখন মেমও নামল জলে। কিন্তু তখন হঠাৎ বাবার থান থেকে বেরিয়ে এলেন 'কত্তা'। সুঁচাদ শিহরিত কণ্ঠে বলতে থাকে সেই উপকথা : 'এই ন্যাড়ামাথা, ধবধব করছে রঙ, গলায় রুদ্দাক্ষি, এই পৈতে, পরনে লাল কাপড়, পায়ে খড়ম— কত্তা জলের উপর দিয়ে খড়ম পায়ে এসে বললেন— কোথা যাবে সায়েব? নৌকো ধরতে? যেয়ো না, ও নৌকা তোমার লয়। সায়েব মানলে না সে কথা। বললে—পথ ছাড়, নইলে গুলি করেঙ্গা। কত্তা হাসলেন,— বেশ, ধরাঙ্গা তবে নৌকো।' [২] সাহেব-মেম নৌকা ধরতে গেল আর কোমরজল হয়ে গেল অথৈ জল। ডুবে মরল সাহেব-মেম। চৌধুরী সাহেবের কাছেই গাছে চড়ে ছিলেন। বাবা তাকে নেমে আসার আদেশ দিলেন। চৌধুরী তখন ভয়ে কম্পমান। তিনি দেখলেন যে, জল মাত্র হাঁটু পর্যন্ত। 'কত্তা হেসে বললেন— ওরে বেটা, ভয় নাই, নাম্। তুই ডুববি না। ...ও নৌকো তোর। আমার পূজো করিস, দেবতার কাছে মাথা নোয়াস, অতিথকে জল দিস, ভিখিরীকে ভিখ দিস, গরীবকে দয়া করিস, মানুষের শুকনো মুখ দেখলে মিষ্টি কথা বলিস। যখের কাছে ছিলেন লক্ষ্মী, তোকে দিলাম। যতদিন আমার কথা মেনে চলবি— উনি অচলা হয়ে থাকবেন। অমান্যি করলে ছেড়ে যাবেন, আর নিজেই ফল ভোগ করবি'। [৩] সেই কর্তাকেই এত অপমান। তাঁর পূজো হয় খুঁতো পাঁঠায়? এরপর আর 'কত্তা' থাকবেন কি করে, চলে যাচ্ছেন— তাই শিস দিয়ে জানিয়ে যাচ্ছেন। কত্তা বাবার দয়ায়

Dhaka University Institutional Repository

চৌধুরী পেলেন যক্ষের ধন, হলেন কাহারদের মনিব। কিনলেন জলের দামে সমগ্র কুঠির জমিদারি। কর্তা বাবা তখন থেকেই থাকতেন শ্যাওড়া বনের বেলতলায়। কাহারদের দেখাশোনার জন্যই ওই বেলতলায় আশ্রয় গ্রহণ করলেন তিনি। কাহাররা বলে সাহেবদের আমল ছিল তাদের সুখের সময়। সেই সাহেবরা গেল, এলো চৌধুরী। বানের জল নেমে গেলে জীবন সংগ্রামে যেসব কাহার বেঁচে রইল তারা এল স্বগ্রামে। এসে দেখে তারা নিঃস্ব। ঘর-দুয়ার নেই, জমি নেই, বাড়ি নেই। কাহারদের তখন চরম দুর্দিন। চৌধুরী তখন নতুন জমিদার। সুচাঁদের ভাষ্যে হাঁসুলী বাঁকের উপকথায় আছে সেই দিন—'কাহারেরা বুক চাপড়িয়ে কেঁদেছিল, সে কান্নায় পূজো-বাড়ির ঢাকের বাদ্যি ঢাকা প'ড়ে যেয়েছিল। যে প্যাটের জ্বালায় গাঁ ছেড়ে দিয়ে ভিখ মাগতে গিয়েছিল কাহাররা, কুটুমবাড়িতে 'নেনো' হয়ে ছিল এতদিন মা, সেই প্যাটের জ্বালা পাসরণ হয়ে গেল। হাঁড়ি চড়ালে না ; 'আন্না-বান্না' দূরে থাক, পূজো-বাড়ির পেসাদ— সেও কেউ মাগতে গেল না। তা'পরে হল কি মা, শেষকালে 'নউমী' পূজোর দিনে সে এক অবাক কাণ্ড ! হঠাৎ চৌধুরী বললেন— যা, ভিটেগুলো তোদের ছেড়ে দিলাম, ভিটে থেকে তোদের বাস তুলে দোব না, সে বজায় রাখলাম। ওই চাকরানটুকু রইল, কালে-কস্মিনে পাল্কির দরকার হ'লে বইতে হবে। তবে জমি পাবি না। হ্যাঁ, কৃষাণি মান্দেরী কর্—থাক্। কাহাররা তবে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। পিতিপুরুষদের ভিটে থাকল 'মন্তরায়' এই ভাগ্যি। ...সেও তোমার ওই কত্তা মশায়ের দয়া। চৌধুরীকে তিনি স্বপন দিয়ে দিয়েছিলেন অষ্টমির 'আতে'—মানুষকে ভিটে ছাড়া করতে নাই। কাহারদিগে তুলে দিলে আমার 'ওষ' হবে তোর ওপর।' [৪] হাঁসুলী বাঁকের কাহাররা জানে বেলতলার কর্তাবাবা কাহারদের সর্বময় কর্তা। তাই তারা কর্তার রোষ দৃষ্টিকে, ক্ষুণ্ন হওয়াকে ভায় পায়। এর প্রতিকারে তারা কর্তার 'থানে' পূজো দেয়, আসর বসায়। সেই আসরে সুচাঁদ কর্তার মহিমার উপকথা বিবৃত করে।

শিসকে কেন্দ্র করে আশঙ্কা ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র কাহার পাড়ায়। কৌমের এই মহাসংকটকালে করালীর পলিত কুকুর কালুয়ার সহসা নাক-মুখ দিয়ে রক্ত উঠে মরে যাওয়াকে কাহারেরা কর্তার ক্ষোভের প্রতিক্রিয়া হিসেবে ধরে নেয়। নাকে কাটা দাগ দেখে তারা বুঝে ফেলে কর্তা খড়ম দিয়ে চেপে মেরেছে কালুয়াকে। করালী তার কুকুরের মৃত্যুর পর অনুসন্ধানে বের হয় কে এমন করে কামড়ে মারল তার কুকুরকে? কে এমন করে শিস দেয় বাঁশবনে? অবশেষে বাঁশবনের চারদিকে আগুন লাগিয়ে শিস প্রদানকারী এবং তার কুকুরের দংশনকারী বিচিত্র বর্ণের চন্দ্রবোড়া সাপকে মেরে ফেলে করালী। বাঁশবনে আগুন দেখেও কাহাররা ভাবে কর্তার রোষেই সেখানে আগুন জ্বলছে। চন্দ্রবোড়াটিকে আগুনে পুড়িয়ে মারার পর কাহাররা আবিষ্কার করে, এটি কর্তাবাবার বাহন। সাপটির মৃত্যু তাদের কাছে এক ভয়াবহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। আদিকালের সব বিধান সুচাঁদের স্মৃতিতে সঞ্চিত। সেই বিধান দিল পূজা চাই। প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য কর্তাবাবার পূজো দিতে হবে— 'ফুলে বেল পাতায়, তেলে-সিঁদুরে, ধূপে-প্রদীপে, আতপে-চিনিতে, দুধে রম্ভায়, মদে মাংসে, কাপড়ে দক্ষিণায় — সমারোহ ক'রে পূজো।' [৫] যে করেই হোক বাবাঠাকুরকে সন্তুষ্ট করতে হবে। তাঁর বাহনকে পুড়িয়ে মারার অপরাধে কাহারকুল মহাপাপিষ্ঠ হল। তাদের উপকথা সে কথাই বলে। কর্তাবাবার পূজায় তাঁর 'থান' পরিষ্কার করবার সময় সেয়াকুলের ঝোঁপ থেকে কালকেউটে বের হলে কাহাররা করজোড়ে প্রণাম করে। কাহারদের ধারণা কেউটেটি বাবাঠাকুরের বাহনের সঙ্গী। করালীর কৃত পাপের দায় থেকে মুক্তির জন্য কৌমের মাতব্বর হিসেবে বনওয়ারীকে উদ্যোগ নিতে হল। কিন্তু মহাপাপের যথাযোগ্য

Dhaka University Institutional Repository

শাস্তি না দিয়ে বনওয়ারী করালীকে পাখীর সাথে বিয়ে দিয়ে গ্রামে ফিরিয়ে আনে চন্দনপুর থেকে। বনওয়ারী বাবা ঠাকুরের 'থানে' প্রণাম করে ভয়ে ভয়ে কল্পনা করে বাবাঠাকুরের রুদ্র মূর্তি।

আদিম আরণ্যক অন্ধকারের সঙ্গে লুকিয়ে থাকা কাহারদের উপকথা, লৌকিক বিশ্বাস আর কুসংস্কারের কাহিনী তাদের জীবনের সঙ্গে আষ্টে-পৃষ্টে আবদ্ধ। এই লৌকিকতা আর কুসংস্কারগুলোই তাদের জীবনের গতিপথের নিয়ামক। কাহারদের বিশ্বাস কালারুদ্রের প্রধান ভক্ত হয় নিচু জাতের লোক। তাদের ধারণা বান গোসাই বা বাবাঠাকুরের পুণ্যেই কাহাররা নিচু জাতের হয়েও কালারুদ্রের পূজা করতে পারে। নইলে তাদের কী সাধ্য ছিল বাবার স্থানে যাওয়ার। বানগোসাই বর চেয়ে নিয়েছিলেন কালারুদ্রের সঙ্গে তারও পূজা হবে।

কৃষিজীবী কাহারগোষ্ঠী তাদের কৃষি জীবনের সঙ্গেও সম্পৃক্ত করেছে নানা কল্পকাহিনী। এসবে বিশ্বাস নিয়েই চলে তাদের কৃষিকাজ। চুরি করা থেকে দেবতার উদ্দেশে পূজা নিবেদন, সবকিছুই তাদের সংস্কারের বেড়াজালে আবদ্ধ। কুমারী মাটিকে চাষযোগ্য করার পূর্বে দেবতার উদ্দেশে তারা পূজা দেয়। ভাল ফসলের জন্য এবং উৎপন্ন ফসল তুলেও দেবতার সন্তুষ্টির জন্য তারা আয়োজন করে পূজার। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঘনঘটায়ও কাহাররা কালারুদ্রের মহিমা প্রত্যক্ষ করে —'যুদ্ধের ব্যাপার কালারুদ্রের মন মহিমা। তিনিই লাগান যুদ্ধ। তার চড়কের পাকে ঘটে বড় বড় ব্যাপার। আকাল আসে, মহামারণ আসে। যুদ্ধও এসেছে।' [৬] কালের অগ্রযাত্রায় সভ্যতার আলোকোজ্জ্বল চন্দনপুর তাদের উপকথার দক্ষিণপুরী। উপকথায় আছে —'সবদিক পানে চেয়ে দেখো, মন চায়তো হাঁটতেও পার, কিন্তু দক্ষিণ দিক পানে চেয়ে দেখো না ; ও দিকে, ও পথে হেঁটো না।' [৭] চন্দনপুর বাঁশবাদির উত্তরে হলেও এটিই কাহারদের জীবনে নিষিদ্ধ 'দক্ষিণপুরী'। ওখানে গিয়েই সবাই জাত খোয়ায়। ওই দিক থেকেই তাদের ধ্বংস আর অধর্ম নেমে আসে। কাহারদের বিশ্বাস কর্তা তাঁর বেলগাছে বসে রুদ্রাক্ষের মালা জপেন আর হাঁসুলী বাঁকের দিকে দৃষ্টি রাখেন। তিনি প্রসন্ন হলে কাহারদের সমৃদ্ধি সুনিশ্চিত। আবার তাঁর কুদৃষ্টি পড়লে রোগ, শোক, অজন্মা থেকে তাদের মুক্তি নেই। বেলতলার দহে বাবা স্নান করেন মনের সুখে। বনওয়ারীর কালো বউ সেখানে পড়েছিল বলে বাবার বাহন তাকে দহে ডুবিয়ে মেরেছে। হাঁসুলী বাঁকের উপকথায় প্রেতযোনির অস্তিত্ব স্বীকৃত। কাহাররা সেসব চোখে দেখেছে। বাঁশবনে, হাঁসুলী বাঁকের মাঠে জলার পাশে, ঘরের কোণে দাঁড়িয়ে তারা কাঁদে, গান গায়, কেউ ঘরের চালে পা ঝুলিয়ে বসে, কেউ মাঠে মাঠে আগুন নিয়ে খেলা করে। আবার কেউ পথ ভুলিয়ে অন্যপথে নিয়ে যায়, যে পথে রয়েছে নিশ্চিত অপমৃত্যু। আর আছে নিশির ডাক ; পরিচিতদের রূপ ধরে যে নিয়ে যায় মৃত্যুর দিকে। এসব প্রেতাত্মা মায়া অথবা হিংসার বশে হাঁসুলী বাঁকের মাঠে-ঘাটে ঘুরে বেড়ায়। কোপাইয়ের কূলে কূলে, হাঁসুলী বাঁকের মাঠে-মাঠে বাঁশবাদির ঘন পল্লবের নিচে হাঁসুলী বাঁকের এইসব উপকথার অলৌকিক জগৎ প্রেতলোক-পরলোক পর্যন্ত বিস্তৃত।

তিন

হাঁসুলী বাঁকের কাহারদের আর্থনীতিক জীবন বিপর্যস্ত হলেও তাদের পূজা-পার্বণ-নৃত্য-গীত কোনকিছুরই কমতি নেই। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় রাঢ়-পল্লির মানুষ। হিন্দু-সমাজের উচ্চ বর্ণের দেবতার পাশাপাশি অন্ত্যজ শ্রেণির নানা লৌকিক দেব-দেবীর পূজা-অর্চনার কথা তিনি জানতেন। লৌকিক বিশ্বাস, কুসংস্কার, ভীতিসংকুল জীবন আর পিতৃপুরুষের কথার প্রতি বিশ্বাসই যে কাহারদের কৌম জীবনের নিয়ামক তাও তাঁর জানা ছিল। কাহারেরা দেবতার পূজা দিয়েছে ভক্তিমন্ত হয়ে, নানা উপকরণে সজ্জিত করেছে বাবা

Dhaka University Institutional Repository

ঠাকুরের থান। এ-সব তারাশঙ্করের চোখে দেখা বলেই কাহারদের সংস্কৃতিজীবন তথা নৃত্য-গীত, পূজা-পার্বণের চমৎকার বর্ণনা তিনি উপস্থাপন করেছেন *হাঁসুলী বাঁকের উপকথা* উপন্যাসে। চৈত্র সংক্রান্তিতে বার্ষিক গাজন উৎসবের মাধ্যমে কাহাররা তাদের প্রধান দেবতা কালারুদ্রের পুজো দেয়। এতে প্রধান ভক্ত চড়কের পাটায় গজালের ডগায় শয়ন করে। সে আগুনের ফুলের ওপর নাচে। চড়কের পাটায় চড়ে কাহার পাড়া ঘুরে আবার এক বছরের জন্য বাবা যান জল-শয়ানে কালিদহের মাঝে। হাড়ি, ডোম, বাউরি, কাহার নিচু জাতের যে কেউ কালারুদ্রের ভক্ত হতে পারে। কাহার প্রধান বনওয়ারী গাজনের পাটায় শুয়ে কাহারকুলের মঙ্গল কামনা করে। নানা বর্ণিল সাজে এই পুজো হয়। সদগোপ মহাশয়রাও এই গাজনে শামিল হন।

দেবতা কালারুদ্রের সহচর বেলতলার কর্তাঠাকুরকেও তারা ঘটা করে পুজো করে; পাঁঠা, ভেড়া, হাঁস বলি দেয় তাঁর উদ্দেশে। মদ কাহারদের পূজার অন্যতম উপকরণ। পুজোয় তারা অর্ঘ্য দেয় মুগসিদ্ধ, বরবটি সিদ্ধ আর এক বোতল পাকি মদ।

নবান্নে কাহারদের উল্লাস চিরদিনের। ভদ্রলোকের পুজোতেও তারা আনন্দ করে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে। তবে নবান্ন-উৎসব তাদের কৌম জীবনের প্রথানুসারেই উদ্‌যাপিত হয়। গাজন, ধর্মপূজা, আমুত্তি বা অম্বুবাচি, মা বিষহরির পূজা, ভদ্র মাসে ভাজো পরব, আগ্রহায়ণ মাসে নবান্ন, পৌষ মাসে লক্ষ্মী পূজা কাহারদের ধর্মজীবনের প্রধান পার্বণ। কাহার নারীরা মঙ্গলচণ্ডী ব্রত পালন করে ; ওই ব্রত-অনুষ্ঠানে তারা নানা দ্রব্য তৈরি করে আনন্দ করে, নিজেরা খায় এবং অন্যকে খাওয়ায়। এছাড়া কাহারকৌমে মনসা ও বান গোঁসাইয়ের পূজারও প্রচলন আছে। জলের দেবতা ইন্দ্রের কাছে জল চেয়ে তারা ইঁদ পুজোও করে। এই পুজো সদ্‌জাতিরা আয়োজন করলে কাহাররা সানন্দে কায়িক শ্রম নিয়োগ করে উৎসবকে প্রাণবন্ত করে তোলে।

হাঁসুলী বাঁকের প্রচলিত উপকথার মুখ্য গায়েন পাগল আর কথক নসুবালা। তারা নিজেরাই ঘেটু ও ভাজোতে গান বাঁধে আর নেচে নেচে গায়। রাতে মেয়েদের আলাদা আসরে বসে সুচাঁদ প্রধান গায়েন হিসেবে উপকথার গানও পরিবেশন করে। এক্ষেত্রে স্মরণীয় যে, উত্তরকালের রচনা *শুকসারী-কথা* (১৯৬৭)-তে তারাশঙ্কর *হাঁসুলীবাঁকের* নসুবালা, সুচাঁদ ও করালীকে পুনরায় ফিরিয়ে এনেছিলেন উপন্যাসের পটে।। আদিকালের অন্ধকার আরো ঘনীভূত হয় যখন কাহারপাড়ায় রাত নামে। কেরসিনের ক্ষীণ আলোয় কাহাররা তখন কর্তা ঠাকুরের নাম দিয়ে মজলিস বসায়। ছেলেরা রাতে ঢোল বাজিয়ে ধর্মরাজের 'বোলাম' (স্তবগান), মনসার ভাসান, ভাদু-ভাঁজোর গান ও মা দশভূজার পাঁচালী গায়। শুধু ধান কাটার সময়ে কাহারপাড়ায় পুজো-পার্বণে কিছুটা ভাটা পড়ে কর্মব্যস্ততার জন্য।

কাহার পাড়ায় সন্ধ্যার অন্ধকারের সঙ্গে আদিকালের অন্ধকার মিশে যে অন্ধকার নামে তার ভয় থেকে বাঁচার জন্য দল বেঁধে ঘেটু গান পরিবেশিত হয়। কাহারপাড়াতে বেশ কিছু ঘেটু গানের দল আছে। এতে একদল অপর দলের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামে। কাহার জীবনের বাস্তবচিত্র ফুটে ওঠে এই ঘেটু গানে। অসংখ্য ঘেটু গানের উল্লেখ আছে আলোচ্য উপন্যাস *হাঁসুলীবাঁকের উপকথায়*। সমসাময়িক কাহার জীবন নিয়েও ঘেটু গান রচিত হয়। যেমন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ নিয়ে রচিত একটি ঘেটু গান :

সায়েব লোকের লেগেছে লড়াই
ষাঁড়ের লড়াইয়ে মরে উলখাগোড়াই

Dhaka University Institutional Repository

ও হায়, মরব মোরাই উল্‌খাগোড়াই।[৮]

আবার চন্দনপুরে রেললাইন নির্মাণের ফলে সৃষ্ট কাহারদের সমস্যা নিয়েও তারা ঘেটু গান তৈরি করে :

লালমুখো সায়েব এল কটা কটা চোখ—
দ্যাশ-বিদ্যাশ থেকে এল দলে দলে লোক—
— ও সায়েব আস্তা—
ও সায়েব আস্তা বাঁধালে— কাহার কুলের অন্ন ঘুচালে
পাল্কী ছেড়ে র‍্যালে চড়ে যত বাবু লোক।
— ও সায়েব আস্তা—[৯]

দিবসের শ্রমক্লান্ত কাহাররা রাতে মদ খেয়ে নেচে গান গায়, হাসি তামাসা রঙ্গ-ব্যঙ্গে মেতে ওঠে। বিনোদনের বড় মাধ্যম তাদের কাছে এটাই। পাগল, নসুবালা আর সুচাঁদ মাতিয়ে রাখে এ-সব আসর। নসুবালা গান ধরে :

লষ্টচাঁদের ভয় কি লো সই, কলঙ্ক মোর কালো ক্যাশে—
কলঙ্কিনী রাইমানিনী — নাম রটেছে দ্যাশে-দ্যাশে।[১০]

হাঁসুলী বাঁকের 'গানের কোকিল' পাগল সেই সুরে সুরে মিলিয়ে গাইতে গাইতেই আসরে এসে যোগ দেয়।

শ্যাম কলঙ্কের বালাই লয়ে—
ঝাপ দিব সই কালী দহে;
কালীলাগের প্রেমের পাঁকে মজব আমি অবশেষে![১১]

—গানগুলি হাঁসুলী বাঁকের প্রাণ। এসব গান ও ছড়ায় ছড়িয়ে আছে কাহার সংস্কৃতির বিচিত্র উপকরণ। ভাজোঁ পার্বণ কাহারদের আরেকটি আনন্দ উৎসব। ইন্দ্র রাজার পূজার শেষ স্থানটির মাটি নিয়ে এসে কাহাররা বেদি তৈরি করে জিতাষ্টমীর দিন ভাঁজো সুন্দরীর পুজো করে। ভাঁজো পার্বণের দিন কাহার পাড়ায় সারাক্ষণ চলে রঙের খেলা অর্থাৎ প্রেমের খেলা। তখন তাদের আনন্দের সীমা থাকে না। লতা-পাতা ফুলে ভাঁজোর বেদি সাজিয়ে মেয়ে পুরুষ সবাই আকণ্ঠ মদ পান করে নাচে, গান গায়, তামাসা করে। নিয়ম আছে ওই রাতে সবাইকে নির্ঘুম থাকতে হয়। এ-উৎসবে কাহাররা কাউকে কিছুতে বাধা দেয় না। এটি পিতৃপুরুষের বিধান। সারারাত মদে, ঢোলে-মাদলে চলে উন্মাতাল নাচ আর গান। পাগল ভাজোর গান ধরে :

কোন ঘাটেতে লাগায়াছ 'লা' ও আমার ভাঁজো সখি হে !
আমি তোমায় দেখতে পেছি না।
তাইতো তোমায় খুঁজতে এলাম হাঁসুলীর ই বাঁকে—
বাঁশবনে কাঁশবনে লুকাল্‌ছ কোন্ ফাঁকে !
ইশারাতে দাও হে সখি সাড়া
তোমার আ-ঙা পায়ে লুটিয়ে পড়ি গা
ও আমার ভাঁজো সখি হে ![১২]

Dhaka University Institutional Repository

চার

হাঁসুলী বাঁকের কাহারদের যেমন বিচিত্র উপকথা, তেমনি বিচিত্র তাদের জীবন। বাঁশবাদির বাঁশবনের অন্ধকারে তারা ঢেকে রাখে না তাদের প্রেম ভালবাসা আর জৈবিক আকর্ষণকে। কাহারদের প্রেম ভালোবাসায় লজ্জা, ভয় কিংবা পাড়া-প্রতিবেশীর ঘৃণার পরোয়া নেই। জৈবিক তাড়নাই তাদের কাছে মুখ্য। সেজন্য মাঝে মাঝে কাহারদের তরুণী মেয়ে বানের জলে খরস্রোতা কোপাই নদীর মতো ক্ষেপে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে। হাঁসুলী বাঁকের বাঁশবনের বেষ্টনীতে প্রাগৈতিহাসিক কালের আঁধার বাসা বেঁধে থাকে। সুযোগ পেলেই ওই অন্ধকার দ্রুত ধাবিত হয় কাহার বসতির মধ্যে। সেই অন্ধকারে কোপাইয়ের বানের মতোই হারিয়ে যায় কাহার নর-নারী। নিন্দা হয়, কিন্তু নিন্দনীয় কাজ মাত্রই অপরাধ নয় কাহার-সমাজে। কাহার নর-নারী যখন 'অঙের খেলায়' অর্থাৎ প্রেমের খেলায় মেতে ওঠে তখন তারা কোন কিছুর বাধা মানে না। তাদরে প্রেম দেহজ চেতনা-সমৃদ্ধ। তাই তো দেখা যায়, হাঁপানী-রোগী স্বামী নয়ানকে ছেড়ে পাখি গিয়ে ওঠে করালীর ঘরে। বন্যা ও দুর্যোগের রাত্রে কাহার বধূ পতি-বদল করে এক গাছ থেকে অন্য গাছে গিয়ে আশ্রয় নেয়। পাখির মা বসন্ত চৌধুরীদের ছেলের সঙ্গে প্রেমের খেলায় মাতে। পাখির চেহারায় চৌধুরীদের ছেলের সাদৃশ্য স্পষ্ট ; তাতেও কারো উদ্বেগ বা লজ্জা নেই। এ-ধরনের উদ্বেগ বা লজ্জা কাহার জীবনে বেমানান। করালীর মা তিন বছরের শিশু করালীকে রেখে পরপুরুষের সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছিল। কাহারদের মাতব্বর বনওয়ারী পরমের বউ কালোশশীর সঙ্গে বটতলার আদিম অন্ধকারে হারিয়ে যেতে পিছপা হয় না। হাঁসুলী বাঁকের প্রচলিত উপকথায় আছে তুফান বানে ঝাঁপ দিয়ে যুবতী বউ পালায় যার ওপর তার মন পড়ে তার কাছে। চন্দনপুর রেললাইনে খাটতে এসে ঘর ছেড়েছে, জাত দিয়েছে বহু কাহার মেয়ে। খুটি আর বেলে নামের দু-জন দেশত্যাগ করেছে মুসলমান রাজমিস্ত্রির সঙ্গে। 'অঙের' নেশায় তারা সন্তানকে পর্যন্ত ভুলে যায়। সিধু আর 'জগধাত্তি' ঘর ছেড়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের ভালবাসার পুরুষরা তাদের সঙ্গে নেয়নি, এখন তারা ঝিয়ের কাজ করে আর রাত্রিতে সেজে গুজে ভিন্ন রূপ ধারণ করে। কাহার পাড়ায় এসব নিয়ে কারো লজ্জা বা ঘৃণা নেই। যেন সবই স্বাভাবিক। রঙের খেলার প্রসঙ্গে পাখি জগৎকে বলেছিল— 'যার সঙ্গে মেলে মন, সেই আমার আপনজন'।[১৩]

কোপাই নদীর মতো পাগলামি কাহার মেয়েদের কখনোই যায় না। রাত্রিকালে জাঙ্গাল আর চন্দনপুরের ছোকরারা শিস ও সিটি দেয়, উঠানে ঢিল ছুঁড়ে ইশারা জানায় কাহার মেয়েদের। মা-বাবা, পিসি-মাসি জানলে সমস্যা হয়না, স্বামী, ভাই কিংবা ননদ শুনলে সমস্যা বাধে। কাহারদের যৌন-জীবনের শিথিলতার পরিচয় এই উপন্যাসের নানা স্থানে ছড়িয়ে আছে। 'বউয়ের রোজকার, বিটীর রোজকার' কাহার-পাড়ায় 'শাক-ঢাকা মাছ'।[১৪] এ-সবকে তারা স্বাভাবিকভাবে বিধির বিধান বলেই মানে। কাহারদের বিশ্বাস সৎ জাতির সেবা করা ও ময়লা আবর্জনা ধারণ করাই তাদের কাজ। ঈশ্বর তাদের এই জন্মে ভদ্রলোকের কাজ করার জন্যই পাঠিয়েছেন, কেননা— 'কাহারদের মেয়েরা সতী হলে ভদ্রজনের পাপ ধরবে কারা, রাখবে কোথা?'

কাহার পাড়ার পারিবারিক-জীবনেও আছে ভয়াবহ কিংবদন্তির অস্তিত্ব। বনওয়ারীর পূর্বপুরুষ স্ত্রীকে পরপুরুষগামী হতে দেখে বুকের ওপর চেপে বসে পাথর দিয়ে মাথা ছেঁচে মেরেছিল। রতনের পূর্বপুরুষ চড় দিয়ে মেরে ফেলেছিল নিজের বোনকে। পরমের পূর্বপুরুষ তার স্ত্রীকে হাতে-পায়ে বেঁধে মুখে কাপড় চেপে ধরে মেরেছিল। গুপীর পূর্বপুরুষ তার স্ত্রীকে মেরেছিল বিষ খাইয়ে। হাঁসুলী বাঁকের কাহার নারী-পুরুষদের চেতনায় ঐতিহ্যগত এইসব মানসিকতা এখনো বহমান। কাহার-পুরুষ স্ত্রীর বর্তমানে পুনরায় বিয়ে করলে

Dhaka University Institutional Repository

কিছুই করার থাকে না প্রথমার। শাঁখা আর নোয়া খুলে গালাগাল দিতে দিতে স্বামীগৃহ ত্যাগ করে চলে যেতে হয় তাকে ; খুঁজে নিতে হয় অন্য কোনো কাহার-পুরুষের ঘর। সতীনের ঘর কাহার মেয়েদের অসহ্য। স্বামী বিয়ে না করে কোনো মেয়েকে ঘরে এনে রাখলে তাদের আপত্তি থাকে না। কিন্তু বিয়ে করলে তারা সহ্য করে না। কারণ স্বামীর ওপর কাহার নারীরা নির্ভরশীল নয়। রূপ-যৌবন এবং পরিশ্রম করার সামর্থ্যের কারণেই তারা কোনো-না -কোনো কাহার পুরুষের ঘরে ঠাঁই করে নিতে পারে।

হাঁসুলী বাঁকের উপকথার কাহার মেয়েদের মধ্যে বিরল ব্যতিক্রম বনওয়ারীর স্ত্রী গোপীবালা আর পাখির মা বসন্ত। বসন্তের ব্যতিক্রমতার কিঞ্চিৎ পাখির মধ্যেও পরিলক্ষিত। বনওয়ারী সুবাসীকে বিয়ে করলেও গোপীবালা বনওয়ারীর সংসারে থেকে যায় কাহার নারীর দীর্ঘকালের ঐতিহ্য ভঙ্গ করে। অন্যদিকে পাখির মা তার মনের মানুষ চৌধুরী বাড়ির ছেলের কথা আজীবন ভুলতে পারেনি। মনের মানুষের মৃত্যুর পর অন্য কোনো ঘর বাঁধেনি সে। পাখিও করালীর সুবাসী-হরণ সহ্য করতে না পেরে আত্মাহুতি দেয়। সহজেই ধারণা করা যায় যে, কাহার নারীদের আচরণ সর্বদাই জৈব-প্রবৃত্তি দ্বারা সম্পন্ন হয় না।

যৌন জীবনের শৈথিল্য কাহারদের কাছে তেমন গর্হিত নয়। আলোচ্য উপন্যাসের নারী-পুরুষ সম্পর্কই প্রমাণ করে তাদের অসংযত জৈব তাড়নার দিকটি। তারাশঙ্কর-সৃষ্ট *হাঁসুলী বাঁকের উপকথা*-র কৌমজীবন সংশ্লিষ্ট এমন অবাধ যৌনাচারকে কোনো-কোনো সমালোচক অতিরঞ্জিত ও আরোপিত বলে মনে করেছেন। তবে তা সমর্থনযোগ্য নয়। 'ভারতের নানা স্থানের বিভিন্ন কৌম সমাজের গতিবিধি, রীতিনীতি এক প্রকার নয়। তাবৎ গোষ্ঠীর সকল সংবাদ আমাদের নখদর্পণে নেই, তবে নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে টোডা, কুরুম্ব, মুন্ডা, মরিয়া, রাজবংশী, মুড়ুয়ার, খানিয়া এবং তিব্বতীয়দের মধ্যে স্ত্রীলোকের বহুপতিত্ব, পরপুরুষ গমন, অবিবাহিত যুবক-যুবতীর মিলন কিছু দুর্লভ ঘটনা ছিল না।' [১৫] প্রাচীন যুগের নিচু জাতের সামাজিক নীতিবন্ধনে যে শৈথিল্য ছিল চর্যাপদ ও অন্যান্য প্রাচীন রচনায় তার প্রমাণ মেলে। সুতরাং কৌম জীবনের উক্ত জীবনাচার অসংগত ও আরোপিত নয়। তারাশঙ্কর তাঁর উপন্যাসে-গল্পে বেদে, কাহার, বাউরি, বাগ্দি প্রভৃতি অন্ত্যজ শ্রেণির যে প্রেমের কথা বলেছেন, সে-সব তাদের প্রবল জীবনী শক্তির সঙ্গে মানানসই। এদের আচরণ তথাকথিত সভ্য মানুষের মত বিবেক-তাড়িত, সংশয়ের দ্বন্দ্ব-জর্জরিত নয়।

পাঁচ

ভারতীয় সকল আদিবাসীর পোশাক পরিচ্ছদ আর ঘরবাড়ি সাদামাটা ও সংক্ষিপ্ত ধরনের। কাহারদের ঘরবাড়ি পোশাক পরিচ্ছদও সেরকম। আড়ম্বর বা বিলাসিতা কৌমজীবনে সম্পূর্ণভাবে অনুপস্থিত। কাহারদের বসতি অবশ্য স্থায়ী। তারা অন্যান্য যাযাবর আদিবাসীর মত জীবন যাপন করে না। পিতৃপুরুষের বাস্তুভিটার প্রতি তাদের গভীর মমত্ববোধ এই উপন্যাসেও প্রকাশিত। কৃষিজীবী এই জনগোষ্ঠী চাষযোগ্য সমতল উর্বর স্থানে বসবাস করতে পছন্দ করে। মাটির দেওয়াল এবং খড়ের ছাউনি দিয়ে এদের বসত ঘর তৈরি হয়। তাদের ঘর বানে ডোবে, ঝড়ে ওড়ে, আবার গড়েও ওঠে। বাঁশবাদির বাঁশ, মাটি, হাঁসুলীবাঁকের নদীর ধারের 'সাবুই'-এর দড়ি এবং খড় তাদের ঘর তৈরির প্রধান উপকরণ। বাবাঠাকুরের বারণ আছে বলে কোঠা ঘর তারা তৈরি করে না। কাহারদের বিশ্বাস কোঠা ঘরে শয়ন করার অধিকার সদগোপ আর বাবুদের। মাটির দেওয়াল তারা রং আর গিরিমাটি দিয়ে সাজায়। ঘর তৈরির ব্যাপারেও কাহারদের কিছু সংস্কার আছে। তাদের ধারণা বাবার নিষেধ উপেক্ষা করে কোঠা ঘর তৈরি করলে নিশ্চিত

অপঘাত মৃত্যু আসে। কোঠা ঘর তৈরি তাই তাদের কাছে পাপের শামিল। উপন্যাসে দেখা যায় করালীর নির্মীয়মাণ কোঠা ঘর কাহার পাড়ার অমঙ্গল আশঙ্কায় বনওয়ারী ভেঙে ফেলে।

Dhaka University Institutional Repository

পোশাক-পরিচ্ছদও কাহার পুরুষদের খুবই সংক্ষিপ্ত। চাষের সময় পুরুষেরা অর্ধেক দিন গামছা পরেই কাটিয়ে দেয়। বাকি সময় তারা ছয় হাত সমান মোটা কাপড় অর্থাৎ ধুতি পরে। অবসরে বাইরে গেলে তারা হাঁটু বহরের কাপড় পরে এবং কোচাটি উল্টে নিয়ে কোমরে গুঁজে দেয় এবং ভাঁজ-করা গামছা কাঁধে ঝোলায়। বিয়েতে পালকি নিয়ে গেলে গামছাটি তারা ক্ষারে কেঁচে নেয়, সযত্নে রক্ষিত পুরোনো ফতুয়া গায়ে দেয়। কাহার মেয়েরা সাজতে পছন্দ করে। শাড়িই তাদের একমাত্র পরিধেয় বস্ত্র। মোটা কাপড়ের তিনটি শাড়ি হলেই একজন কাহার নারীর বছর চলে যায়। তবে বাইরে যাওয়ার জন্য তাদের মিহি ফুলপাড়ের শাড়ি চাই। এই কাপড়ের জন্য অবশ্য তাদের খুব একটা ভাবতে হয় না, নিজেরাই খেটে যোগাড় করে নেয়। ঘর-দুয়ার আর জামা-কাপড় থেকে কাহারদের সরল জীবন-যাপনের একটি ছবি পাওয়া যায়। যুদ্ধের বাজারে সবকিছুর দাম বাড়লেও সামান্য কাপড়ের জন্য কাহাররা সবচেয়ে বেশি উদ্বিগ্ন হয়।

ছয়

বেহারা কাহারদের আদি পেশা ছিল পালকি বহন। ইংরেজ আমলে কাহাররা ইংরেজ সাহেব-মেমদের পালকি বহনের সুবাদে বেহারা প্রতি দশ বিঘা করে জমি পেত চাষের জন্য। আবার নীল চাষের যুগে নীল চাষ করলে বিঘা পাঁচেক চাষের জমি বরাদ্দ ছিল তাদের জন্য। কাহারদের আরেক গোত্র আটপৌরে কাহাররা সাহেবদের আট প্রহরের বাঁধা চাকরান হিসেবে খাটত। নীল চাষের যুগে এরাই লাঠি হাতে নীলের জমি দখল করত জমিদারের হয়ে। আটপৌরে কাহাররা লাঠি হাতে পাহারা দিত আর বেহারা কাহাররা নীল চাষে বিরত সাধারণ গৃহস্থের জমির ফসল চষে লুঠ করে নিয়ে আসত। বেহারা কাহার ছিল চাষের কাজে দক্ষ। 'জ্ঞান গঙ্গা' ও বিয়ের পালকি বহনের কাজেও ডাক পড়ত তাদের। ইংরেজদের নীল কুঠি উঠে গেলে বেহারা কাহারদের পালকি বহনের কাজ কিছুটা কমে আসে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে হাঁসুলী বাঁকের চৌধুরীরা সমগ্র সাহেবডাঙা কিনে নিলে কৃষিকর্মে দক্ষতার জন্য নতুন জমিদারের কাছ থেকেও তারা জমি বরাদ্দ পায়। এই সময় আটপৌরেরা কিছুটা সমস্যায় পড়েছিল। কারণ তারা ছিল অপেক্ষাকৃত কৃষিশ্রম বিমুখ। ফলে নানা প্রকার অনৈতিক কাজ, বিশেষত চৌর্যবৃত্তির সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে তারা। তবে চৌধুরীদের বাড়িতে আটপৌরেদের আদি পেশা তখনো বজায় ছিল। উত্তরকালে বেহারাদের পালকি বহনের কাজ আরও হ্রাস পায়। তবে 'জ্ঞান-গঙ্গা' ও বিয়েতে তাদের ডাক পড়ত অনিবার্যভাবে। এছাড়া তার বহনের কাজে তাদের কদর বজায় ছিল সর্বদা। দেড় মন বোঝা নিয়ে অনায়াসে তারা দশ ক্রোশ পথ যেতে পারত। ক্রমে কাহাররা বেশি মাত্রায় কৃষি নির্ভর হয়ে পড়ে। *হাঁসুলী বাঁকের উপকথা* উপন্যাসে দেখা যায় জমিদার ঘোষদের জমি তারা ভাগে চাষ করে। এছাড়া ঘর ছাওয়ার মৌসুমে তারা বাবুদের ঘর ছেয়ে দেয়। এক্ষেত্রে কাহারদের বেশ সুনাম। গৃহ নির্মাণে তারা বাবুই পাখির মতোই দক্ষ।

কাহার মেয়েরাও পুরুষের পাশাপাশি কৃষিকাজে অংশ নেয়। মেয়েরা 'চন্ননপুরে' দুধ বিক্রি করতে যায়। কেউ কেউ সেখানে বাবুদের বাড়িতে ঝি-এর কাজও করে। কাহার জনগোষ্ঠী মূলত একটি কৃষিজীবী জনগোষ্ঠী। জমিতে প্রাণপাত করেও তারা সব সময় ভূমি মালিকদের কাছ থেকে

Dhaka University Institutional Repository

যথোপযুক্ত মূল্য পায় না। নানা অজুহাতে তাদের ঠকানো হয়। *হাঁসুলী বাঁকের উপকথায়* আদিবাসী এই জনগোষ্ঠী তাদের স্বগ্রাম বাঁশবাদির বাইরে অন্য কোন কাজ করাকে জাত খোয়ানোর শামিল বলে মনে করে। চন্দনপুরের নগদ উপার্জন তাদের কাছে পাপের পথ বলেই পরিগণিত। তাই তারা শত বঞ্চনা সয়েও বাঁশবাদি কেন্দ্রিক কৃষি নির্ভর জীবন যাপনেই বেশি স্বচ্ছন্দ। জমিদার মহাজনরা সব সময় তাদের স্বার্থে কাহারদের ব্যবহার করেছে। কাহাররা নিম্ন মানের জমিই চাষের জন্য বন্দোবস্ত পেত। মাটির রুক্ষতা, জলের অপ্রতুলতা, প্রাকৃতিক বিপর্যয় কাহারদের কৃষিকর্মের নিত্য বৈরি। আবার কোনো দুর্যোগে ফসল কম হলে ভূমি মালিক ফসলের পূর্ণ অংশ দাবি করে। ফলে, কাহাররা তাদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হয়। কৃষি-জীবনে কাহার সম্প্রদায় সামন্ততান্ত্রিক অপব্যবস্থার শিকার হয়েছে সর্বদা। উত্তরকালে উপন্যাসের উপান্ত-পর্বে যুদ্ধের প্রভাবে সমাজে আলোড়ন দেখা দিলে পরিবর্তন ঘটে ভূমি মালিকের দৃষ্টিভঙ্গির। জাঙালের বাবুরা এবং ঘোষ পরিবারও ওই সময় কৃষিনির্ভরতা পরিহার করে ব্যবসা-বাণিজ্যে মনোযোগ দেয়। ফলে নতুন এক ধরনের শিল্প-উপনিবেশ তৈরি হয়। কাহারদের কৃষিনির্ভর জীবনে এর প্রভাব পড়ে গভীরভাবে। তথাপি পিতৃপুরুষের 'রীতকর্মে' বিশ্বাসনির্ভর কাহার গোষ্ঠী তাদের আদি পেশা কৃষিতেই প্রাণপণে স্থির থাকতে চেয়েছে। কিন্তু কাহার গোষ্ঠীর উদ্ধত চরিত্র 'ডাকাবুকো যুবক' করালী আবহমান কাহার সংস্কৃতির অনিবার্য ভাঙনের প্রতীক হয়ে দেখা দেয় সমকাল-পরিস্রুত কাহার জীবনের একটি বিশেষ স্তরে। করালী প্রত্যাখ্যান করেছে বংশগতিধারায় প্রবাহিত কাহার-সংস্কৃতি — জীবনবোধ ও বিশ্বাসের মৌল ভিত্তি। বেহারা ও আটপৌরে উভয় ধারার কাহার-ঐতিহ্য অমান্য করে সে নতুন যুগের আহ্বানে সাড়া দিয়েছে। কৃষি কিংবা ভারবহন দুটোকেই উপেক্ষা করে সে চন্দনপুরে রেললাইনের কাজে অংশ নিয়েছে। তার এই বিদ্রোহ সূচনায় ভাঙনের সংকেত হলেও শেষে আর তা সংকেতে সীমাবদ্ধ থাকেনি। কাহার পল্লির তরুণ সম্প্রদায় শেষ পর্যন্ত অগ্রদূত করালীর আদর্শকে অবিকল্পরূপে অনুসরণ করেছে।

সাত

যুগে যুগে ভূমিকেন্দ্রিক সামন্ত অপসংস্কৃতির শিকার হয়েছে হাঁসুলী বাঁকের কাহারকুল। কৃষিজীবী কাহাররা জমির ভোগদখলের অধিকার পেয়েছে সর্বদা কিন্তু ভূমির মালিকানা তারা কখনোই পায়নি। সামাজিক-রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে বিভিন্ন সময়ে ভূমির মালিকানার পরিবর্তন ঘটলে কাহার জনগোষ্ঠী ছুটেছে নতুন ভূমি- মালিকের কাছে জমি প্রাপ্তির প্রত্যাশায়। তাই জমি তাদের কাছে চিরকালই আরাধ্য বস্তু। আলোচ্য উপন্যাসে কালোশশীর মুখে বাবুদের সাহেবডাঙা ক্রয়ের সংবাদ শুনে বনওয়ারীকে ভিতরে ভিতরে চঞ্চল হয়ে উঠতে দেখা যায়। আটপৌরে পরম সেই জমি বন্দোবস্ত নিতে গিয়েছে এই সংবাদ শুনে বনওয়ারী নিজেকে বোকা ভাবে। অতঃপর বনওয়ারীও ছোটে জমি বন্দোবস্ত নেওয়ার আশায়। পরমের মতো সব কাহারই রাতে ঘুমিয়ে জমির স্বপ্ন দেখে। সাহেবডাঙা নতুন বাবুদের ক্রয়ের সংবাদে কাহার মজলিশে বনওয়ারী-কালোশশী কেন্দ্রিক সরস রসালাপেরও তাল কেটে যায়। কাহারদের দু-বিঘা করে জমি পাওয়ার প্রসঙ্গটি তারাশঙ্কর সূক্ষ্ম অনুভবময়তায় উপস্থাপন করেছেন এভাবে : 'চোখগুলি জ্বল জ্বল করছে— কয়লার মধ্যে পড়া আগুনের ফিন্‌কির মত।' অনেক ধরনা দেবার পর জমিদারদের কাছ থেকে কাহাররা যে সামান্য জমি পেত সেটাও অনুর্বর আর চাষ অনুপযোগী। কাহাররা রাতদিন স্ত্রী-পুরুষ সবাই

Dhaka University Institutional Repository

মিলে মাটি কেটে সেটাকে চাষযোগ্য করে তুলত। জমিতে যাতে পাথর না পড়ে সে জন্য বাবাঠাকুরের কাছে প্রার্থনা জানাত। শেষে পুজো দিয়ে জমি খোঁড়ার কাজে নামত। 'হাঁসুলী বাঁকের দেশ কড়াধাতের মাটির দেশ। এ দেশের নদীর চেয়ে মাটির সঙ্গেই মানুষের লড়াই বেশি।' গ্রীষ্মে নদী শুকিয়ে ধূ ধূ বালির মরুভূমি হয়ে যায়। কোদাল দিয়ে সে মাটি কাটা অসম্ভব। গাঁইতি দিয়ে সামান্য করে কাটা গেলেও প্রতি আঘাতে আগুনের ফুলকি ওঠে। এমনি ধারার মাটি কেটে কাহার জনগোষ্ঠী চাষের জন্য জমি প্রস্তুত করে। বাবুরা উৎকৃষ্ট মানের জমি রেখে নিম্নমানের অবশিষ্ট জমি বিনা সেলামিতে কাহারদের দেয়। তারা এই সামান্য পাওয়াতেও নিজেদেরকে ধন্য মনে করে। অদম্য আগ্রহে চলে মাটি কাটার কাজ। কুমারী মাটিকে প্রণাম করে হাঁসুলী বাঁকের বনওয়ারী বলে, 'তোমার অঙ্গে আঘাত করি নাই মা, তোমার অঙ্গকে মার্জনা করছি। সেবা করছি। তুমি ফসল দিও।' ভূমিকে মায়ের মতই দেখে কাহাররা। জমি তৈরির সময় আধ হাত পরিমাণ পাথরের স্তরের নিচে উৎকৃষ্ট মাটি দেখে বনওয়ারী গাঁইতি দিয়ে অদম্য বিক্রমে পাথর ভাঙতে থাকে। পাথর ভেঙে তার কণা ছিটকে কপালে আঘাত করে। রক্ত ঝরতে দেখেও বনওয়ারী বলে, 'অঙ্গ' নিয়েছেন মা-বসুমতী। কাহার সম্প্রদায় জানে ভূমিই তাদের একমাত্র ভরসা ও আশ্রয়স্থল। তারা আরও জানে,' মা-বসুমতী যেমন দেন, তেমনি নেন।' মা-বসুমতী ধানে-চালে-ফসলে তাদের খাদ্যের যোগান দেন কিন্তু বিনিময়ে মৃত্যুর পর দেহ পুড়িয়ে ছাইটি তাঁকে দিতে হয়। আর জীবৎকালে দিতে হয় নখ চুল আর রক্ত। তাই ভূমির সাথে কাহারদের রক্তেরই সম্পর্ক। মাটির সাথে তাদের সম্পর্কের গভীরতার জন্যই জীবন ও প্রকৃতি-অভিজ্ঞ বনওয়ারী মাটি থেকে পিঁপড়া উঠে আসতে দেখে আসন্ন ঝড়-জলের সংকেত বুঝে নেয়।

শত প্রবঞ্চনা সত্ত্বেও হাঁসুলী বাঁকের কাহার জনগোষ্ঠী ভূ-স্বামীদের প্রতি থেকেছে প্রতিবাদহীন। সবকিছুকেই তাদের ভাগ্য ও বিধির বিধান বলে তারা মেনে নেয়। এই মাটি গ্রীষ্মে যেমন কঠিন, বর্ষায় তেমনি কোমল। হাঁসুলী বাঁকের কাহারদের বিশ্বাস, 'এই মাঠের ফসল-তরকারীতে যার পেট ভরে না, সমগ্র পৃথিবীর কোথাও তার পেট ভরবে না। এটি তার কুটিল এবং কুঁড়ে স্বভাবেরই সাজা। কাহাররা নিজেরা 'গতর' খাটিয়ে চাষ করে মনিবের ঘরে ফসল তুলে দেয়। কারণ—'এ হল ভগবানের বিধান, বাবাঠাকুরের হুকুম'। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বাজারে প্রাকৃতিক দুর্যোগে যখন মাঠ প্রায় ফসল শূন্য, তখনই জমিদারেরা ঘোষণা করে —সায়েবডাঙার জমি যারা চাষ করেছে তাদের ফসল এবার বাবুদের খামারে জমা দিতে হবে। খাজনা এবার তারা নেবেনা। কারণ যুদ্ধের প্রভাবে খাদ্য শস্যের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। এতে কাহার মাতব্বর বনওয়ারীর মাথায় যেন বজ্রাঘাত হয়। —'কত সাধের সায়েবডাঙার জমি। কি পরিশ্রম ক'রে পাড়ার লোকের শ্রদ্ধার খাটুনি নিয়ে সে যে এই জমি তৈরি করেছে, সে বাবুরা জানেন না ; জানে সে, জানতেন বাবাঠাকুর ; জানেন ভগবান হরি।' [১৬]

ত্রুটিপূর্ণ ভূমিব্যবস্থা, অনাধুনিক কৃষিপদ্ধতি এবং সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় কাহার জনগোষ্ঠীর জীবন বিধ্বস্ত এবং বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। কৌমের সংস্কারাচ্ছন্ন জীবনধারাও তাদের আর্থনীতিক দুরবস্থার জন্য বহুলাংশে দায়ী। সামান্য মুড়ি-লঙ্কা খেয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পরিশ্রমে সক্ষম কৃষিজীবী কাহারদের জীবনে আর্থনীতিক স্বাচ্ছন্দ্য অর্জন অলীক কল্পনা মাত্র। উপরন্তু কাহারদের জীবনে সর্বদা উদ্যত সুদ, খাজনা ও সেলামি সংক্রান্ত অঙ্কশাস্ত্রীয় জটিল হিসেবের কৃপাণ। দাদনের মারপ্যাঁচে চিরকাল ধরেই ঠকে আসছে তারা। খাজনা, দাদন কিংবা বন্ধকীর শুভঙ্করী হিসাব তারা জানে না। কাহারদের কাছে সে হিসাব এক আশ্চর্যই হয়ে থেকেছে সর্বদা। 'আশ্চর্যকে ঘেঁটে দেখে তার স্বরূপ নির্ণয় করার মত বুদ্ধির তাগিদ ওদের নাই। যদি বা আদিকালে কখনও ছিল, বারবার ঘা খেয়ে, তা মরে গেছে। সাহেব, সদ্‌গোপ, বাবুদের শাসন

Dhaka University Institutional Repository

ঠেলে কখনও তা কঠিন এবং ধারালো হয়ে আশ্চর্যকে ভেদ ক'রে ছেদ ক'রে দেখবার মত নির্ভয় বিক্রম লাভ করতে পারে নাই।' [১৭] রুক্ষ আর অনুর্বর মাটির সাথে কাহারদের যেমন সংগ্রাম তেমনি নীরব সংগ্রাম তাদের জমিদারদের বিরুদ্ধেও। সামন্ত প্রভুরা কাহারদের ঠকায় কিন্তু তারা প্রতিবাদ করতে পারে না। প্রাচীনকাল থেকেই নিয়ম মতো বাৎসরিক হিসাব না করে দেনার দায় বৃদ্ধি করে তাদের কাছ থেকে বাঁশ ঝাড় বা বৃক্ষ নিয়ে দেনা মাফ করত, অথবা চক্রবৃদ্ধি হারে ঋণ বৃদ্ধি পেত। ফলে জীবন-ধারণের জন্য প্রতিনিয়তই তাদের যুঝতে হয়েছে। প্রচণ্ড পরিশ্রমী এই জনগোষ্ঠী জমির অভাবে, সুষ্ঠু ব্যবস্থপনার অভাবে কৃষিকর্ম করেও প্রয়োজনীয় আর্থনীতিক প্রতিফল লাভে বঞ্চিত হয়েছে। উপরন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তাদের আর্থনীতিক জীবনকে আরও বিপর্যস্ত করে দেয়। কৃষিনির্ভর এই জনগোষ্ঠীর কর্ষণযোগ্য জমি যুদ্ধের কাজে ব্যবহার শুরু হলে তারা যুদ্ধনিয়ন্ত্রিত কাঁচা পয়সার বাজারে শস্যহীন অবস্থায় এক অন্ধকার জগতে নিক্ষিপ্ত হয়। আর এভাবেই এই কৌম জনগোষ্ঠীর বিপর্যয় হয়ে ওঠে অবশ্যম্ভাবী।

আট

কালিক গতিধারায় সবকিছুই বিবর্তিত হয়। বাঁশবাদির বাঁশবনের অন্ধকারাচ্ছন্ন কাহারদের জীবনও এর ব্যতিক্রম নয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কালে সময়ের রথ বাঁশবাদির কাহারপাড়ায় রেখে যায় বিপর্যয়ের রথচিহ্ন। মূলত সমাজবিজ্ঞানের নিয়মেই হাঁসুলীবাঁকের কাহারদের গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনে বিপর্যয় অনিবার্যভাবে নেমে আসে। গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনধারা রক্ষায় নিয়ত সংগ্রামী কাহারকুল স্বভাবতই ব্যর্থ হয় সময়ের শাসনকে প্রতিহত করতে। ফলে, অমোঘভাবেই তাদের মেনে নিতে হয় আবহমান কাল ধরে লালিত ক্ষুদ্র জাতিসত্তার অস্তিত্বের পরাজয়। কাহার সম্প্রদায়ের জীবনধারায় পরিবর্তন উপন্যাসের প্রথম পর্বে সংকেতিত হয়েছে সুচাঁদ পিসির এই আক্ষেপোক্তিতে : 'সাহেবরা গেল, কাহারদের কপাল ভাঙল ... আমলই পাল্টিয়ে গেল।' সাহেব আমলের অবসানে কাহারদের পেশাগত জীবনে পরিবর্তন আসলেও আর্থনীতিক অস্বাচ্ছন্দ্যে কাহারকুল যত না দিশাহারা হয়েছে তার চেয়ে অধিক ভীত হয়েছে স্বাজাত্য বিসর্জনের আশঙ্কায়। কাহার জীবনের নিস্তরঙ্গ স্বাভাবিকতায় প্রথম ভাঙনের সংকেত *হাঁসুলী বাঁকের উপকথা* উপন্যাসের প্রতীকী-চরিত্র করালী। চন্দনপুর রেললাইনে কুলির গ্যাঙম্যান হিসেবে কাজ ক'রে কাহারসমাজের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুল প্রদর্শন করে সে। কাহার সমাজে প্রতীকী পরিবর্তন আনয়ন করে এই করালী। এই করালীকে চন্দনপুরে ঠেলে দেয় ঘোষবাবু। নগদ মজুরিতে অভ্যস্ত কাহার গোষ্ঠীর ছিটকে পড়া এক নতুন মানুষ এই করালী। চন্দনপুরে গিয়ে সে শেখে নব্য ন্যায়-নীতি, খোঁজে ঘটনার কার্যকারণ-সম্পর্ক; জন্ম নেয় তার মধ্যে মান-অপমান বোধ। নগদ অর্থ উপার্জনের দম্ভে কাহারদের দারিদ্র্যপিষ্ট অথচ পরিতুষ্ট অজ্ঞানতাকে সে আঘাত করে ; চন্দনপুরের প্রাক্-ধনতান্ত্রিক মূল্যবোধ দ্বারা আলোকিত হয়ে সে আঘাত করে গোষ্ঠীদেবতার প্রতিনিধি বাবাঠাকুরকেও। আর এভাবেই করালীর সূত্রে চন্দপুরের নতুন হাওয়ার অনুপ্রবেশেই কাহার পল্লিতে পরিবর্তনের প্রথম ধাক্কা এসে লাগে।

সামন্ততান্ত্রিক কৃষি অর্থনীতির ধারক বনওয়ারীর 'ধমক' ও 'খবরদারী'কে অগ্রাহ্য করে ক্রমে করালীর সাথে কাহার পাড়ার তরুণদের কয়েকজন কাজ নেয় চন্দনপুরে। তারাও কাহার পল্লিতে ভিন্ন সংস্কৃতির আমদানি শুরু করে বনওয়ারীর রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে। সমাজ পরিবর্তনে নতুন-পুরাতনের চিরায়ত দ্বন্দ্বের বিষয়টি বনওয়ারী ও করালী চরিত্রের মাধ্যমে স্বভাবসুলভ বিশিষ্টতায় প্রাণবন্ত করে তুলেছেন ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর। কালের যাত্রায় সামন্ততন্ত্রের অবসানে সূচিত হয় পুঁজিবাদী সমাজ। পুঁজিবাদের

Dhaka University Institutional Repository

অগ্রযাত্রায় পুরাতন সামন্তপ্রভুরাই পরাভূত হয়। পুঁজিবাদী সমাজে গড়ে ওঠে শিল্পকারখানা আর ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান। শিল্পের প্রয়োজনেই ব্যবহৃত হয় চাষের জমি। অধিক মুনাফার প্রত্যাশায় কৃষির চেয়ে শিল্পের দিকে নব্য ধণিক শ্রেণির মনোযোগ বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রাক্-ধনতান্ত্রিক পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কাহার সম্প্রদায় ভূমিহীন ও কর্মহীন হয়ে নিরুপায়ভাবে কারখানা-শ্রমিকে পরিণত হয়। ভারতীয় ত্রুটিপূর্ণ ভূমি-ব্যবস্থাপনার নির্মম শিকার এই আদিবাসী জনগোষ্ঠী। কাহার নারীরাও চন্দনপুরে গিয়ে আর ফেরে না। চন্দনপুরের শ্রমজীবন তাদের আকৃষ্ট করে। শিল্প বিকাশের সাথে সাথে কাহার জনগোষ্ঠীর শিকড় ভূমি থেকে উন্মূলিত হয়ে যায়। কারখানার মালিকগণ কাঁচা টাকার প্রভাবে সহজে আকৃষ্ট করে নিরুপায় দারিদ্র্যক্লিষ্ট কাহারদের। ফলে, চন্দনপুর-কেন্দ্রিক কারখানা-সংস্কৃতির দিকে ঝুঁকে করালীর মতো অনেকেই। কৌমসংস্কৃতির প্রতিভূ বনওয়ারীর কাহারদের নিজস্ব সংস্কৃতির বিপর্যয়ে শেষ পর্যন্ত অসহায়ের মতো আর্তচিৎকার করা ছাড়া আর কিছুই করার থাকে না।

হাঁসুলী বাঁকের কাহারদের কৌমসংস্কৃতি ও জীবনধারায় সবচেয়ে বড় আঘাতটি আসে মূলত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পথ ধরে। সমকালীন বিশ্বরাজনীতি কাহারদের অজ্ঞাতেই তাদের জীবনধারায় নিয়ে আসে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া। ভূমি-উন্মূলিত এই জনগোষ্ঠীকে আমূল পরিবর্তনের দিকে নিয়ে যায় এই মহাযুদ্ধ। যুদ্ধের কারণে ধান, চাল, কলাই, গুড় সবকিছুর দাম চড়েছে। তাই জমিদাররা সব ফসল ঘরে তোলায় ব্যস্ত হলে কাহারদের মধ্যে দেখা দেয় হাহাকার। কাহার-মানসিকতার প্রেক্ষাপটে তাদের জীবনে যুদ্ধের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়ার স্বরূপ তারাশঙ্কর এঁকেছেন এভাবে : 'যুদ্ধ, নাকি জোর 'যুদ্ধ' লেগেছে। সেই যুদ্ধের জন্যই নাকি এ দিকেও অনেক ব্যাপার হবে। লাইন বাড়বে! কোথা নাকি উড়ো-জাহাজের আড্ডা হবে। গোটা রেললাইনই নাকি যুদ্ধ-কোম্পানি নিয়েছে কেড়ে। অনেক নতুন লোক নেবে। অনেক খাটুনি, অনেক মজুরি। দেশ-বিদেশ, রেঙুন না কোথা বোমা পড়েছে! 'জাপুনি' না কারা আসছে! কলকাতা থেকে লোক পালাচ্ছে। চন্ননপুরেও নাকি আসছে কলকাতার লোক। চন্ননপুরে হৈ-হৈ পড়ে গিয়েছে।' [১৮] যুদ্ধের প্রয়োজনেই বাঁশবাদিতে রাস্তা-ঘাট নির্মিত হয়, যুদ্ধের তাঁবু পড়ে। যুদ্ধের প্রয়োজনেই বাঁশবাদির সব বাঁশ উজাড় হয়ে যায়। যুদ্ধ-কোম্পানি যুদ্ধের প্রয়োজনে কাহার-পল্লির চিরকালীন শান্ত অন্ধকার ঘুচিয়ে দিয়ে সব গাছ আর বাঁশ কেটে পাল্টে দেয় বাঁশবাদির ভৌগোলিক চেহারা। 'উদরের দায় বড় দায়'— সে দায়েই কাহার সম্প্রদায়ও স্ব-ভূমি, স্ব-কৌমসংস্কৃতি ছেড়ে যুদ্ধের কাজে অংশ নেয় শ্রমিক হিসেবে। চন্দনপুরে ভিড় জমায় তারা বাঁশবাদি ছেড়ে। এদের মধ্যে যারা যুদ্ধের খাতায় নাম লিখিয়েছে, ধর্মকে পরিত্যাগ করেছে, স্বাজাত্য ত্যাগ করেছে, তারাই শুধু বেঁচে থাকার অন্ন যোগাড় করতে সমর্থ হয়েছে— 'পিথিমীতে যুদ্ধ বেঁধেছে। যুদ্ধ চলছে সায়েব মহাশয়দের মধ্যে! জিনিসপত্রের নাকি দর চড়বে! ধান চাল গুড় কলাই সমস্ত কিছুরই দর উঠবে। তাই মণ্ডলেরা 'সতর' হয়েছেন একটি ভাড় গুড় যেন না সরে। সরাবে আর কে? সরাবে তো কাহাররাই।' [১৯]

পাকা রাস্তা ধরে চন্দনপুর থেকে মোটরে চড়ে যুদ্ধ আসে কাহার পাড়ায়। 'ওদিকে চন্ননপুরে আর সব বাবুমহাশয়দের 'গেরামে' শহরে লেগেছে গান্ধীরাজার কাণ্ডকারখানা। লাইন তুলেছে, সরকারী ঘরদোর জ্বালাচ্ছে;... চাল-ধানের দর হু হু করে বাড়ছে। বলছে আরও বাড়বে।' এ অবস্থায় কাহারদের আর রইল কী? বাঁশবাদির অন্ন তাদের ঘুচে যায়। দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। দলে দলে কাহার নরনারী চলে চন্দনপুর যুদ্ধের কাজে নগদ উপার্জনের আশায়। কাহারদের অন্নদাত্রী হাঁসুলী বাঁকের বাঁশবাদির চিত্র পাল্টে গেছে ইতোমধ্যে। সবাই পালিয়েছে বাঁচার তাগিদে। রুগ্‌ণ বনওয়ারী এবং তাকে ঘিরে পাগল আর নসুবালা

Dhaka University Institutional Repository

রয়েছে বাঁশবাদির শেষ দৃশ্যপট অবলোকনের জন্য। খাঁ খাঁ চারিদিক, বাঁশবন উজাড়, বড় বড় বট অশ্বত্থ গাছ পর্যন্ত বিলুপ্ত। চারদিকে তীব্র আলোর ছটা ; সবুজ নেই, রয়েছে কেবল দু-চারটি শীর্ণ বৃক্ষ। হাঁসুলী বাঁকের চিহ্ন নেই। বনওয়ারীর সাজানো কাহার সমাজ আর নেই। দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী সুবাসী বনওয়ারীরকে পরিত্যাগ করে করালীর সঙ্গে চলে গেছে। অভিমানী পার্বি আত্মহত্যা করেছে। বসন্ত চৌধুরীবাড়ির এঁটো কাঁটা খেয়ে মৃত্যুর প্রহর গুনছে। পাগল ও নসু হাঁসুলী বাঁকের বাইরে ভিক্ষা করে গান গায়। করালী চন্দনপুর আছে। অনেক কাহারকে সে যুদ্ধের কোম্পানীতে কাজ পাইয়ে দিয়েছে। উপকথার কথক সুঁচাদ এখন চন্দনপুরে উপকথা পরিবেশন করে আর ভিক্ষা করে। হাঁসুলী বাঁকের 'উপকথার ছোট নদীটি ইতিহাসের বড় নদীর সঙ্গে মিশে গেল। কাহারেরা এখন নতুন মানুষ! পোষাকে-কথায়-বিশ্বাসে তারা অনেকটা পাল্টে গিয়েছে। মাটি ধুলো কাদার বদলে মাথে তেলকালি, লাঙল কাস্তের বদলে কারবার করে হাম্বর-শাবল-গাঁইতি নিয়ে। তবে চন্দনপুরের কারখানায় খেটেও তারা না খেয়ে মরে, রোগে মরে, সাপের কামড়ের বদলে কলে কেটে মরে, গাড়ি চাপা প'ড়ে মরে। কিন্তু তার জন্য বাবা ঠাকুরকে ডাকে না। ইতিহাসের নদীতে নৌকা ভাসিয়ে তাদের তাকাতে হচ্ছে কম্পাসের দিকে— বাতাস দেখার যন্ত্রটার দিকে।' [২০] — এভাবে সামাজিক, আর্থনীতিক ও রাজনৈতিক কারণে পেশা, সংস্কৃতি ও জীবনধারা থেকে উন্মূলিত হয়ে পড়ে গোষ্ঠীবদ্ধ কাহার সম্প্রদায়। এই আদিবাসী জনগোষ্ঠীর স্বভূমি ও স্বাজাত্য আধুনিক অর্থনীতি ও রাজনীতির কারণে যেভাবে বিপর্যস্ত ও বিলুপ্ত হল তারই শিল্পিত কাহিনী *হাঁসুলী বাঁকের উপকথা*।

নয়

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় *হাঁসুলী বাঁকের উপকথা* উপন্যাসে একটি বিশিষ্ট কৌম জনগোষ্ঠীর ভাষা প্রয়োগে দক্ষতা ও বাস্তবানুগত্যের পরিচয় দিয়েছেন সর্বত্র। উপন্যাসে তিনি কাহার সম্প্রদায়ের মুখের কথা ব্যবহার করেছেন বাস্তবানুগ করেই। সর্বজ্ঞ ঔপন্যাসিকের ভাষ্যে মান্য চলতি ভাষার ব্যবহার এই উপন্যাসে সাবলীল রূপ লাভ করেছে। এতে ব্যবহৃত পাত্রপাত্রীর মুখের ভাষা বীরভূমের রাঢ় অঞ্চলেরই বিশেষায়িত উপভাষা। রাঢ়ের আদিবাসীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কারণেই তারাশঙ্কর তাদের মুখের ভাষা ব্যবহারে বাস্তবতার স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি আদিবাসী কাহারদের প্রচুর প্রবাদ, ছড়া, গান ব্যবহার করেছেন উপন্যাসটিতে। ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে তিনি পরীক্ষা ও নিরীক্ষা প্রবণতার পরিচয় দিয়েছেন সর্বদা। তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলির সংলাপের মধ্যে উদ্ধৃতি-চিহ্ন দ্বারা বিশিষ্ট শব্দ বা শব্দগুচ্ছকে চিহ্নিত করেছেন, এমনকী তার অর্থও ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন। রাঢ়ী উপভাষা থেকে বীরভূমের নিজস্ব উপাদানগুলোকে পৃথক করে দেখানোর জন্যই তাঁর এই প্রয়াস। উপন্যাসে মান্য চলতি ভাষার সঙ্গে আঞ্চলিক রাঢ়ী উপভাষা এবং বীরভূমের নিজস্ব তাত্ত্বিক উপাদানের মিশ্রণ ঘটেছে। যেমন—'নিমতেলে পানু বললে—তা আবার মানিস না। কাহারপাড়ার পিতিপুরুষরে রোপদেশে নাতি মেরে মুরুব্বির মুখের ওপর বুড়ো আঙ্গুল লেড়ে দিয়ে চন্দনপুরে মেলেচ্ছ কারখানায় কাজ করছিস।' [২১] কিংবা, 'নিমতেলে পানু বেশ গুছিয়ে এবং চিবিয়ে কথা বলতে পারে। সে-ই বলছিল— মাতব্বর যদি শাসন করতে 'তরাস' করে, তবে দুষ্ট নোকে 'অল্যায়' করলে তার শাসন হবে কি ক'রে? 'আজা' হীনবল হলে 'আজ্য' লষ্ট। এতবড় 'অল্যায়ে' মুরুব্বি বাক্যটি বার করলে না মুখ থেকে!' [২২]

Dhaka University Institutional Repository

এ-ছাড়া আদিবাসীদের লোকজ জীবনের সাথে তারাশঙ্করের ঘনিষ্ঠতার প্রমাণ মেলে তাদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত ছড়া ও গানের ব্যবহারে। এ-সব গানে কাহার জীবনের প্রাত্যহিক চিত্র ফুটে উঠেছে তাদেরই ভাষার মিশ্রণে। যেমন :

জাতি যায় ধরম যায় মেলেচ্ছো কারখানা
ও-পথে যেয়ো না বাবা কত্তাবাবার মানা
মেয়েরা ও-পথে গেলে, ফেরে নাকো ঘরে—
বেজাতেতে দিয়ে জাত যায় দেশান্তরে
লক্ষ্মীরে চঞ্চল করে অলক্ষ্মীর কারগানা
ও-পথে হেঁটো না মানিক কত্তাবাবার মানা।[২৩]

উপন্যাসে সর্বজ্ঞ ঔপনাস্যিকের ভাষায় তারাশঙ্কর প্রমিত বা মান্য চলতি ভাষারই আশ্রয় নিয়েছেন। কোপাই নদীর বন্যার বর্ণনায় ওই ভাষারীতির দৃষ্টান্ত দ্রষ্টব্য : 'কাহারদের মেয়েও যেমন রাগ পড়লে এসে চুপ ক'রে গাঁয়ের ধারে ব'সে থাকে, তারপর এক পা, দু'পা ক'রে এসে বাড়ির কানাচে শুয়ে গুনগুন ক'রে কাঁদে কি গান করে, ঠিক ধরা যায় না— তেমনিভাবে কোপাইও দু'দিন বড়জোর চারদিন পরে আপন কিনারায় নেমে আসে, কিনারা জাগিয়ে খানিকটা নীচে নেমে কুল-কুল শব্দ ক'রে বয়ে যায়।' [২৪] সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণে লেখক এভাবেই গোটা উপন্যাসে মান্য চলতি ভাষা ব্যবহার করেছেন। আঞ্চলিক ভাষার শব্দাধিক্যের দুর্বোধ্যতায় পাঠকের রসাস্বাদনে যেন বিঘ্ন না ঘটে তাতেও লেখক সতর্ক। পাত্রপাত্রীর মুখের ভাষাতেও সহজ স্বাভাবিকতা বজায় রেখেই তিনি পাঠকের কাছে পেশ করেছেন। পাখিকে বলা নসুর সংলাপে তার প্রমাণ মেলে; 'দে বুন, দে, আরও ঘা কতক দে। আমি লারলাম ওকে বাগ মানাতে— আমি লারলাম। তু দেখ্ বুন এইবার। গদাগদ কিল মারবি, আমি বলে দিলাম।' [২৫] এক্ষেত্রে চরিত্রের ভাষাও পাঠকের অবোধ্য নয়। উপন্যাসের মূল লক্ষ্য যে পাঠক, এ কথা তারাশঙ্কর বিস্মৃত হননি বলে সর্বত্র এই ধারা বজায় থেকেছ। চরিত্র অনুযায়ী ভাষা নির্মাণেও তিনি স্বভাবসিদ্ধ দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন। বসন্ত বনওয়ারীকে রেশন কার্ড হাতে দিয়ে যখন বলে—'হ্যাঁ! কেরাচিনি, চিনি— এই সবের কাড। নেওনাইন বোড থেকে দিয়েছে।' [২৬] কিংবা নসু বালার কথায়, 'শুধু ওদর? লোভ পাপ, বুয়েচ ব্যানোকাকা, পাপ, পিথিমীতে পাপের ভারা ভরতে আর বাকি নাই। একটি লোক দেখলাম না যে ধম্মের মুখ তাকায়।' [২৭] তখন তার উল্লিখিত ভাবাবেগ সম্পর্কে কোনো সংশয় থাকে না। তারাশঙ্কর আলোচ্য উপন্যাসে বীরভূমের নিজস্ব সংস্কৃতি-জাত বহু শব্দ ব্যবহার করেছেন। এর মধ্যে ব্রত উৎসব সংক্রান্ত— বেরতোর, ভাদু-ভাঁজোর গান, ঘেটুর গান; দেবদেবী সংক্রান্ত— ধর্মরঙ্গো, থান, চন্ননের চণ্ডী, কত্তা, কালারুদ্দু ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কৃষি, পেশা ও লোকবিশ্বাস সংক্রান্ত অনেক শব্দও তারাশঙ্কর এই রচনায় ব্যবহার করেছেন। ছড়া, কথা, প্রবাদ, গান ব্যবহারে আঞ্চলিক কৌমচারিত্রের আনুগত্য লক্ষণীয়।

হাঁসুলী বাঁকের উপকথা উপন্যাসে তারাশঙ্করের ব্যতিক্রমী সৃজনশীলতার পরিচয় মেলে। উপকথাকে আশ্রয় করে একটি গোষ্ঠীর জীবনের হাসি-কান্না, বিশ্বাস-নির্ভর সমাজের ভাঙন-যন্ত্রণা এবং তাদের উন্মূলিত হওয়ার দেশ-কাল নির্ভর কার্যকারণ-সম্পর্কযুক্ত কাহিনী সৃজনই বর্তমান উপন্যাসের প্রতিপাদ্য।

Dhaka University Institutional Repository

তারাশঙ্কর কাহিনীর প্রয়োজনে বারবার উপকথার সংযোজন করেছেন। কিন্তু এতে কাহিনীর গতি স্লথ যেমন হয়নি তেমনি পাঠকেরও ধৈর্যচ্যুতি ঘটেনি। যেমন, বনওয়ারীরর গাজনের প্রধান ভক্ত হওয়ার প্রসঙ্গে বান গোসাইয়ের উপকথার প্রসঙ্গ টেনে আনা। আবার সুবাসীর মতিগতির প্রতি বনওয়ারীর সংশয় প্রকাশে সুচাঁদ পিসীর উপকথার রাজকন্যার প্রসঙ্গ টেনে আনা, কন্যার নাক দিয়ে সরু সূতার মত সাপ বের হয়ে ফুলে অজগর হওয়ার ঘটনা। এ-সব কৌমকথা উপন্যাসের পরিবেশ সৃজনের প্রয়োজনেই ব্যবহৃত হয়েছে। বিস্তৃত উপকথাই উপন্যাসের চরিত্রগুলোকে প্রাণবন্ত করে তুলেছে, নিয়ন্ত্রণ করেছে, আবার নিয়তি-নির্ভরও করেছে। তাই উপন্যাসের কাহিনীর সংগঠনে উপকথার ভূমিকা অনস্বীকার্য। *হাঁসুলী বাঁকের উপকথা উপন্যাসে* উপমা ও প্রতীকের ব্যবহারও লক্ষণীয়। উপন্যাসের নামকরণে যে হাঁসুলীবাঁকের কথা বলা হয়েছে তাকে লেখক হাঁসুলীর মতো বাঁক নিয়েছে বলেই হাঁসুলী বাঁক বলেছেন। আরও বলেছেন ওখানে নদী অল্প জায়গার মধ্যে এসে বাঁক নিয়েছে। এই বাঁকের মানুষ কাহারদের জীবনও একটি মাত্র অনুষঙ্গে প্রকৃতপক্ষে বাঁক ঘুরেছে, বিবর্তিত এবং উন্মূলিত হয়েছে। হাজারো সমস্যায় যে কাহার-গোষ্ঠী যুগ যুগ ধরে টিকে ছিল, সভ্যতার করাল গ্রাস হয়ে বিশ্বযুদ্ধ এই গোষ্ঠীকে উন্মূলিত করে দিয়েছে। এটি হাঁসুলী বাঁকের সঙ্গে কাহারদের জীবনের প্রতীকী সাযুজ্যের ইঙ্গিতবহ। কোপাই নদীর হাঁসুলীর মতো এই বাঁকটি বাঁশ ঝাড় দিয়ে ঘেরা, আবার কাহার সম্প্রদায় এই বাঁশবাদিরই বাসিন্দা। বাঁশঝাড়ের ধর্ম একত্র ও দলবদ্ধ হয়ে বেড়ে ওঠা। কাহার জনগোষ্ঠীও এই বাঁশঝাড়ের মতোই সংঘবদ্ধ ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে একদিকে সেই গোষ্ঠীবদ্ধতার প্রতীক বাঁশঝাড় বিলুপ্ত হয়েছে, অন্যদিকে বাঁশবাঁদির কাহার সম্প্রদায় উন্মূলিত হয়েছে তাদের নিজস্ব জীবনধারা থেকে। নিঃসন্দেহে এগুলো গভীর প্রতীকী তাৎপর্যবাহী এবং সতর্ক ঔপন্যাসিকের শিল্পবোধ পরিস্রুত বিশেষ অভিপ্রায়েরই শিল্পপ্রকাশ।

উপন্যাসের শিরোনাম *হাঁসুলী বাঁকের উপকথা*-র সাথেও উপকথার সার্থকতামণ্ডিত গভীর তাৎপর্য মিশ্রিত। উপকথার যেমন শেষ নেই, তেমনি কাহার গোষ্ঠীর জীবনের উপকথারও শেষ নেই। 'উপকথার ছোট নদীটি ইতিহাসের বড় নদীতে মিশে গেল'। — উপকথা ইতিহাসে পর্যবসিত হলেও তা উপকথারই ইতিহাস হয়ে রইল। উপন্যাসের শেষে দেখা যায় নসুবালা, সুচাঁদ আর পাগল কাহার ইতিহাসের আধুনিক নগর চন্দনপুরে ঘুরে ঘুরে নতুন কাহার রূপে কাহারপাড়ার উপকথাই বলে যায়।

হাঁসুলী বাঁকের উপকথা কোনো ব্যক্তি বিশেষের জীবনের উত্থান-পতন, দ্বন্দ্ব-সংঘাত কিংবা সুখ-দুঃখের কাহিনী নয়। এটি গোটা গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনের কাহিনী। কাহিনীর কোনো একমুখিনতা নেই। মূল কাহিনীর গতিধারায় ছোট ছোট কাহিনী এসে মিলেছে প্রাসঙ্গিকভাবে। মহাকাব্যের মতোই এই উপন্যাসে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা স্থান লাভ করেছে। মহাকাব্যের ন্যায় এখানেও একটি ক্ষুদ্র নৃ-জাতি বা গোষ্ঠীর সামগ্রিক জীবনকাহিনী উপস্থাপিত হয়েছে। মহাকাব্যে যেমন লোকায়ত ক্রিয়া ও ভাবনা এক অলৌকিক নিয়তিশক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, এখানেও আমরা তাই দেখতে পাই। মহাকাব্যে আধুনিক আরণ্যক জীবনের শক্তি, সাহস, উদ্দামতা ও প্রচণ্ডতা বিদ্যমান থাকে, এ উপন্যাসেও সেই জীবন আভাসিত। বনওয়ারী ও করালী যেন মহাকাব্য থেকে নেমে আসা দুইটি মহাপরাক্রমশালী চরিত্র, আদিম শক্তি ও সাহস নিয়েই তারা পরস্পরের মুখোমুখি হয়। ঠিক যেন রাম-রাবণ, ভীম-দুর্যোধন কিংবা হেক্টর-একিলিস। করালী এবং বনওয়ারীর গর্জনও আরণ্যক আকাশ প্রকম্পিত করে। আর এসব বৈশিষ্ট্যের জন্যই এই উপন্যাসের কাহিনী মহাকাব্যিক বিশালতা লাভ করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

হাঁসুলী বাঁকের উপকথা উপন্যাসের কাহিনী বিন্যাস করা হয়েছে মোট আটটি পর্বে। শেষপর্বটি ছাড়া সবকটি পর্ব আবার কয়েকটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। প্রথম পর্বে কৌমের পরিপ্রেক্ষিত এবং বর্তমান অবস্থা সংযোজিত হয়েছে। এই পর্বে কাহারদের শান্ত, নির্লিপ্ত কৌমজীবনে শক্তি ও যৌবনের দুর্ধষতায় করালী আনে ভাঙন আর মহা অশান্তি। তার ঔদ্ধত্য বিপর্যস্ত ও বিমূঢ় করে কাহার সমাজকে। দ্বিতীয় পর্বের প্রধান বিষয় করালী ও পাখির বিবাহে বনওয়ারী এবং প্রবীণদের আপত্তি ; বনওয়ারী এবং কালোশশীর রঙের খেলা, কালোশশীর প্রতি বনওয়ারীরর কামনা ও পাপবোধের বিস্তার। এসব ঘটনার প্রতিক্রিয়ার দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত বনওয়ারীর প্রায়শ্চিত্তের সংকল্পে এই পর্বের সমাপ্তি। তৃতীয় পর্বে বড়ো অংশ জুড়ে রয়েছে বাঁশবাদির উপকথার আরেক কথক উচ্ছল-প্রাণ পাগলের উপস্থাপপিত কথাবার্তা এবং কালোশশীর ডাকাত স্বামী পরানের সঙ্গে বনওয়ারীর সংঘাতের প্রসঙ্গ। এই সংঘাত দুই কাহার সর্দারের সংঘাত। এ পর্বটি বিষাদাচ্ছাদিত হয় সর্পাঘাতে কালো বউ-এর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। চতুর্থ পর্বে কৌমের পরাক্রমশালী সমাজ-প্রধান বনওয়ারীর দৈহিক ও মানসিক ক্ষয়ের সূত্রপাত। তবু তার মধ্যে সক্রিয় থাকে সংস্কার, বিধি-নিষেধ রক্ষার আপ্রাণ প্রয়াস। করালীর পাকা ঘর নির্মাণ ও চন্দনপুরে চলে যাওয়া, বনওয়ারীর অশুভ দ্বিতীয়-বিবাহ কাহার সমাজের বিলুপ্তির সূচনা করে। পঞ্চমপর্বে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ জনিত কারণে কাহার সমাজের উন্মূলিত হবার কার্যকারণ-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা পায়। এই পর্বেই পরাজিত বনওয়ারীর আর্ত হাহাকারের ধ্বনি-প্রতিধ্বনিতে ভারি হয়ে ওঠে বাঁশবাদির পরিবেশ। ষষ্ঠ পর্বে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সংকটের সঙ্গে সঙ্গে বন্যার করাল গ্রাস কাহার পাড়াকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলে। এই মহাপ্রলয়ে শুধু টিকে থাকে 'ডাকাবুকো' করালী।

বর্তমান উপন্যাসে বহু বিচিত্র চরিত্রের সন্নিবেশ ঘটেছে। প্রতিটি চরিত্র স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। একটি গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে প্রত্যেকটি চরিত্র। তথাপি যে চরিত্র গোটা কৌম সমাজের উর্ধ্বে উঠে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে সে হল বনওয়ারী। কাহার পাড়ার সে সর্দার। শৌর্য-বীর্য, তেজস্বিতা, দৃঢ়তা, নম্রতা ও ন্যায়বোধের দ্বারা শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্ত হয়েছে বনওয়ারী চরিত্র। কাহার সমাজের প্রথা, ধর্মবিশ্বাস ও ঐতিহ্য রক্ষার জন্য সে প্রত্যয়ী। কাহার সংস্কৃতির লঙ্ঘনকারীদের সে উপদেশ দেয়, শাস্তি দেয়। সকলে তাকে মান্য করে এবং তার নির্দেশ পালন করে। ব্যতিক্রম শুধু করালী। করালী কাহারকুলের নীতিধর্মের বিরুদ্ধাচরণকারী। বনওয়ারী করালীর অপরাধ সত্ত্বেও তাকে কাহারকুলের সীমার মধ্যেই আবদ্ধ করে রাখতে চেয়েছে ; তার শক্তির সম্ভাবনাময় মাঙ্গলিক প্রয়োগের আশা পোষণ করেছে। অথচ করালীই বনওয়ারীর নিজ জীবনে নিয়ে আসে চরম ট্রাজেডি। শেষে কঠোর কঠিন বনওয়ারীও রঙের খেলায় মেতে উঠেছে। কালোশশীর মৃত্যুর পর তারই দোসরতুল্য সুবাসীকে সে বিয়ে করেছে। আবার এই সুবাসীকেই কেড়ে নিয়েছে অমিত শক্তিধর করালী। বনওয়ারীর পরাজয় একটি প্রাচীন মহাবৃক্ষের পতনেরই সমতুল্য। নতুন যুগ এবং পরিবর্তনের প্রতীকীচরিত্র করালী। সে উদ্ধত, দেববিদ্বেষী, আদর্শহীন, নতুন গড়ে-ওঠা কারখানার স্থূল ভোগবাদী শ্রমিক। কাহার পাড়ার ঐতিহ্যিক 'রীত-করণের' বিরোধী, বিপ্লবী একটি চরিত্র সে। তার কাছে অর্থ আর ভোগই একমাত্র আরাধ্য বিষয়। অপরের স্ত্রীকে বিবেকহীনের মতোই সে ছিনিয়ে নিয়েছে বারবার। তাকে উপলক্ষ করেই বাঁশবাদিতে নেমে আসে ধ্বংসের তাণ্ডব। হাঁসুলী বাঁকের অবিস্মরণীয় চরিত্র আদিকালের বুড়ি সুচাঁদ পিসি হাঁসুলীবাঁক-কেন্দ্রিক উপকথার গোড়ার কথা বলে যায়। প্রত্যেকটি চরিত্রের অতীত ইতিহাস সুচাঁদ পিসির নখদর্পণে। ঝগড়ার সময় সে নেচে নেচে তা বলে যায়। কাহার পাড়ার নারীচরিত্রগুলো উপন্যাসে মধ্যবর্তী ভূমিকা পালন

Dhaka University Institutional Repository

করেছে। উপকথার প্রয়োজনেই তাদের উপস্থাপনা। তবে তাদের স্বকীয়তা বজায় থেকেছে সর্বত্র। কাহার নারী পাখি যেন দুরন্ত হলদে পাখি। দুঃসাহসে নয়ানের ঘর ছেড়ে সে ডাকাবুকো করালীর কণ্ঠলগ্না হয় ; আবার করালী তাকে পরিত্যাগ করলে অপমানে আত্মহত্যা করে। কালোশশী শান্ত অথচ 'রঙে'র খেলায় বনওয়ারীর সাথে মত্ত থেকেছে আমৃত্যু। বনওয়ারীর স্ত্রী গোপীবালার রূপ না থাকলেও গুণের কমতি ছিল না। গৃহকর্মে নিপুণ গোপীবালা বনওয়ারীর জীবনে 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে'র সমৃদ্ধি এনেছিল। অন্যদিকে, কাহার-জীবনের সঙ্গে বেমানান একটি চরিত্র পাখির মা বসন্ত। শান্ত অনুত্তাল এই নারী প্রথম জীবনের ভালবাসাকে সারাজীবন সঙ্গোপনে বুকে ধারণ করে রেখেছে। হাঁসুলী বাঁকের আরেকটি বিচিত্র চরিত্র নসুরাম, নসুবালা নামে যার সমধিক পরিচিতি। পুরুষ হয়েও নারীর মতো তার চলাচল। ছোটবেলা থেকে নারী বেশ নিয়ে নারীর মতো চলতে চলতে সে নসুরাম থেকে নিজের অজান্তেই নসুবালা হয়ে পড়ে। নেচে গেয়ে উচ্ছলতায় মেতে থাকে নসুবালা। বয়স বাড়ার সাথে সাথে তার মধ্যে নারীর চিরন্তন মাতৃত্ববোধ জেগে ওঠে। বাঁশবাদি ছেড়ে নসু করালীর সাথে চন্দনপুর যায়নি। রুগ্‌ণ বনওয়ারীর সেবা করেছে পাগল কাহারের সাথে মাতৃ-মমতায়। 'বয়স হয়ে শুকসারী-কথা উপন্যাসে সেই-ই ভাদুর মা হয়েছে। মেয়েরা 'না বিইয়ে কানাই-এর মা' হতে পারে, নিঃসন্তান রমণীকে 'নেই রামের মা' বলেও সম্বোধন করা যেতে পারে, কিন্তু একটি পুরুষ কি মা হতে পারে, ভাদুর মা? নসুবালা আদৌ মেয়ে নয়, সে পুরুষ, বাল্যাবধি মেয়েসুলভ বেশবাস, আচার আচরণে সে নসু থেকে নসুবালা হয়ে গিয়েছিল। ভাদু কে? ...এক জমিদার কন্যা কৃষ্ণকে ভালবেসে জীবন দিয়েছিল, সেই থেকে মানবী ভাদু মানুষের পূজা পেয়ে আসছে। জমিদার কন্যা ভাদু দেবী হয়ে গিয়েছে। এই ভাদুরই মা নসুবালা।' [২৮] উপন্যাসের প্রতিটি চরিত্র এমনি করে লোকজ কাহিনীর ধারায় লোকায়ত ঔজ্জ্বল্য লাভ করেছে।উপকথার গতিধারাকে এই সব চরিত্র চলনে-বলনে-কথনে বেগবান করে পৌঁছে দিয়েছে চিরায়ত শিল্পের উচ্চতায়।

দশ

হাঁসুলী বাঁকের উপকথা-য় তারাশঙ্কর মানুষের জীবনের মতোই বিশেষ অঞ্চলের একটি কৌম গোষ্ঠীর বিবর্তন ও বিলুপ্তির চিত্র উপকথার আশ্রয়ে অঙ্কন করেছেন। উপকথা-আশ্রিত কৌম সমাজের অন্তরালে মানুষের জীবনেরে নিত্যকালের ভাঙাগড়ার কথা ব্যক্ত হয়েছে উপন্যাসে। সমাজগতির অনিবার্য পরিবর্তন কীভাবে একটি কৌমসমাজের জীবনেও আঘাত হানে তারই শিল্পমূর্তি *হাঁসুলী বাঁকের উপকথা* উপন্যাস। উপকথা এবং বাস্তব ইতিহাস এখানে একাকার। হাঁসুলী বাঁকের কাহার পাড়া বাস্তব ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত। তারাশঙ্কর এই উপন্যাসে যে জীবন ও প্রাকৃতিক পরিবেশের বর্ণনা করেছেন তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় তা জীবন্ত হয়ে উঠেছে। তারাশঙ্কর মানবমনের সূক্ষ্ম, কোমল জগতের চেয়ে রূঢ় অগ্নিগর্ভ জগৎকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন ; হাঁসুলী বাঁকের মানুষের আদিম প্রবৃত্তি, ক্রোধ, লালসা, হিংসা এবং শক্তিমত্তাকেই ফুটিয়ে তুলেছেন। বহির্জগতের দ্বন্দ্ব সংঘাতেই তাঁর আগ্রহ। মনোজগতের স্পর্শকাতর বৃত্তিগুলির বিরোধ-বৈপরীত্যে তিনি অনাগ্রহী। তারাশঙ্কর স্বভাবগতভাবেই পুরাতনের প্রতি দরদি থাকলেও সমাজগতিকে তিনি অস্বীকার করেননি। আলোচ্য উপন্যাসে লেখক দেখিয়েছেন নতুনের প্রতিনিধি করালী এবং পুরাতনের ধারক বনওয়ারীর সার্বক্ষণিক দ্বন্দ্বের ধারায় যুদ্ধজনিত পরিবর্তনের পথ ধরে কীভাবে কাহার সমাজে পরিবর্তন এসেছে, উপকথার সমাজটি কীভাবে শাহরিক সংস্কৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছে। উপন্যাসে কেবল ব্যক্তিচরিত্রের ঘটনা এবং মনোসংঘাতের ছবি পাওয়া যায়

Dhaka University Institutional Repository

বনওয়ারী চরিত্রের মধ্যে। যে ওই কৌম সংস্কৃতির প্রতিভূ হয়েও পরিণামে এক হৃতগৌরব সত্তা, পরাভূত মানুষ। লোকজীবনের জৈব তাড়নাকেই তারাশঙ্কর প্রেমে রূপায়িত করেছেন এ উপন্যাসে। সুচাঁদের নাতনী বসনের মেয়ে পাখি হাঁপানি রোগাক্রান্ত নয়নকে ছেড়ে নবযুগের বার্তাবাহক করালীর কাছে ছুটে এসেছে জৈবিক আকর্ষণেই। দেহমনের তীব্র আকর্ষণে পাখির মতো কালোবউও স্বামীকে ছেড়ে হয়েছে বনওয়ারী- মুখী। কাহার সম্প্রদায়ের শিথিল যৌনজীবনের ছবি যেমন এখানে সহজপ্রাপ্য, তেমনি নারীর অদম্য আকাঙ্ক্ষারও সহজ প্রকাশ লক্ষণীয়।

সমকাল সচেতন তারাশঙ্কর কৌমসমাজের বিবর্তনের পটভূমিকায় যুক্ত করেছেন আর্থনীতিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটকে। সমাজ জীবনে ওই বিবিধ প্রভাবেই যে অপ্রতিরোধ্যরূপে সবরকম পরিবর্তন-বিবর্তন আসে এই সত্য আলোচ্য উপন্যাসে প্রতিষ্ঠা করেছেন ঔপন্যাসিক। '*হাঁসুলী বাঁকের উপকথা*-য় বিশেষ আঞ্চলিক জনগোষ্ঠীর প্রত্নপ্রতিম উপকথার জগতে বিচরণ করলেও, ঐ-বিশেষ জনগোষ্ঠীর উপকথা-নির্ভর জীবনে নতুন কালের অভিঘাত কীভাবে সমাজ-পরিবর্তনের তত্ত্ব ও সত্যকে বাস্তবায়িত করেছে সমাজ-রাজনীতি-নৃবিজ্ঞানের সমন্বিত পর্যবেক্ষণে তা উদ্ভাসিত হয়েছে। ফলে *হাঁসুলী বাঁকের উপকথা*-য় সমাজগতির অনিবার্য পরিণতি লাভ করেছে সার্থক শিল্প-প্রমূর্তি।' [২৯] উপকথা আর বাস্তবতার দ্বিমাত্রিক কাহিনী সমান্তরালভাবে উপন্যাসটিতে প্রবহমান। উপকথা-নির্ভর কাহারসমাজের জীবনধারা এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাত কাহার-সম্প্রদায়ের গোষ্ঠীজীবনের বিপর্যয়ের কারণ। ঔপন্যাসিকের সমাজজ্ঞান, কালচেতনা ও রাজনৈতিক বোধের শৈল্পিক প্রয়োগে কাহিনীর দ্বিস্রোত অবলীলায় একীভূত হয়েছে উপন্যাসে। এ কথা সত্য নতুন পুরাতনের দ্বন্দ্বে লেখক নিরাসক্ত থাকতে পারেননি। করালীর জয় এবং বনওয়ারীর পরাজয়ে লেখক নির্দ্বন্দ্ব নন। বনওয়ারীর প্রতি লেখকের আসক্তি প্রবীণ এবং পুরাতনের প্রতি তাঁর দুর্বলতারই স্মারক। তথাপি একটি আদিম জনগোষ্ঠীর

বাস্তব চিত্র এবং তাকে দেশ-কালের মাত্রা ছাড়িয়ে বিশ্বজনীন সত্যে প্রতিষ্ঠার যে শিল্পকৌশল লেখক এই উপন্যাসে প্রয়োগ করেছেন তা নিঃসন্দেহে বিরল। আর তাই *হাঁসুলী বাঁকের উপকথা* আর উপকথা থাকেনি, একটি কৌমের গদ্য-মহাকাব্যে পরিণত হয়েছে। আর এরই মধ্য দিয়ে রচনাটি হয়ে উঠেছে বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শিল্পসার্থক ও চিরায়ত উপন্যাস।

তথ্যনির্দেশ

১ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : *হাঁসুলী বাঁকের উপকথা* ; *তারাশঙ্কর রচনাবলী*, সপ্তম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা. দ্বিতীয় মুদ্রণ : চৈত্র ১৩৮৯, পৃ.১৭৮

[২] পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৯

[৩] পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৯

[৪] পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৬

[৫] পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৫

[৬] পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১৩

[৭] পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১৮

[৮] পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬০

[৯] পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২৪

[১০] পূর্বোক্ত, পৃ.৩১৫

[১১] পূর্বোক্ত, পৃ.৩১৬

[১২] পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২১

[১৩] পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৭

Dhaka University Institutional Repository

[১৪] পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬৯
[১৫] রঞ্জিতকুমার মুখোপাধ্যায় ; *তারাশঙ্কর ও রাঢ় সমাজ*, নবার্ক, কলকাতা, ১৯৮৭, পৃ. ৮৬-৮৭
[১৬] তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়; *হাঁসুলী বাঁকের উপকথা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৫০
[১৭] পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩৮
[১৮] পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১৩-১৪
[১৯] পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৮
[২০] পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭৩
[২১] পূর্বোক্ত, পৃ. ২০১-০২

[২২] পূর্বোক্ত, পৃ.২৩৫
[২৩] পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২৬
[২৪] পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৪
[২৫] পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৬

[২৬] পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১৮
[২৭] পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬৭
[২৮] মাহমুদা খাতুন ; "তারাশঙ্করের নারী চরিত্র : বিষাদ ও বেদনা" : *তারাশঙ্কর স্মারকগ্রন্থ*, ভীষ্মদেব চৌধুরী (সম্পাদিত), নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা, প্র.প্র. ২০০১, পৃ. ৮৩-৮৪
[২৯] ভীষ্মদেব চৌধুরী ; *তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস : সমাজ ও রাজনীতি*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্র.প্র. ১৯৯৮, পৃ. ২০৪

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নাগিনী কন্যার কাহিনী উপন্যাসে বিষবেদে জীবনের রূপায়ণ

সমাজের প্রান্তবাসী অন্ত্যজ মানুষের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, সংস্কার ও বিশেষ বিশ্বাস এবং তার বিবর্তনের শিল্পরূপায়ণই ছিল তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যসাধনার অভীষ্ট। রাঢ়-অঞ্চলে বিচিত্র আদিবাসী অন্ত্যজ কৌমগোষ্ঠীর মধ্যে বেদে সম্প্রদায়ের প্রতি বিশেষ দুর্বলতা ছিল তাঁর। বেদে সম্প্রদায়ের প্রতি তারাশঙ্করের ব্যক্তিগত আগ্রহ ও বিশেষ দুর্বলতাই তাঁকে এই গোষ্ঠীর জীবনমান, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির শিল্প রূপায়ণে প্রাণিত করেছে। প্রাচীন বেদে কৌমের একটি শাখা সম্প্রদায়ের নাম বিষবেদে। এদের আদি নিবাস সাঁওতাল পরগণা বা সাঁতালীর সমতল ভূমি। এই সাঁতালীর বিষবেদেদের মিথ আশ্রিত জীবনালেখ্যই আলোচ্য *নাগিনী কন্যার কাহিনী* (১৯৫১) উপন্যাসের কথাবস্তুর ভিত্তি।

একদিকে প্রবহমান স্রোতোস্বিনী গঙ্গা, অন্যদিকে সাঁতালী পাহাড়, আর তার মধ্যবর্তী স্থানে হিজল বিলের অবস্থান। সেই বিলের ধারেই বিষবেদে জনগোষ্ঠীর বসবাস। উপন্যাসের শুরুতে লেখক হিজল বিলের অপূর্ব এক পারিবেশিক চিত্র নির্মাণ করেছেন। হিজল বিলের জলে অসংখ্য সাপের চলাচল। বিল ঘেঁষা ডাঙ্গায় আনাগোনা রয়েছে হিংস্র বাঘের, গাছে গাছে বিষর্পিল সাপের অস্তিত্ব আর আকাশে গগন ভেরী পাখির ডাক,– এই নিয়ে হিজল বিলের ভয়ংকর সুন্দর পরিবেশ। ঔপন্যাসিক বিলের যে ভয়ানক চিত্র বর্ণনা করেছেন তার সাথে উপন্যাসের এই বিষবেদে সম্প্রদায়ের জীবন-বাস্তবতা যথার্থই সাযুজ্যপূর্ণ। বিপদসঙ্কুল যাযাবর জীবনে অভ্যস্ত বিষবেদে-দেরই যেন এমন ভয়ংকর সুন্দর পরিবেশে মানায়।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের *নাগিনী কন্যার কাহিনী* উপন্যাসে হিজল বিলের বিষবেদে সম্প্রদায়ের উপকথা-নিয়ন্ত্রিত জীবনকথা রূপায়িত হয়েছে। এই বিষবেদে গোষ্ঠীর গোটা জীবনটাই উপকথার ইন্দ্রজালে আবদ্ধ। লেখক মিথের ব্যবহারে আশ্চর্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। মূল উপকথার অনুষঙ্গে যথার্থ ভাবেই উপন্যাসে এসেছে চম্পকনগর-কেন্দ্রিক বাংলার চিরায়ত লোককথাটিও।

হিজল বিলের বিষবেদে সম্প্রদায় একালের মানুষ হয়েও প্রাগৈতিহাসিক যুগের অচ্ছেদ্য নিয়ন্ত্রণে বাঁধা। তাদের জীবনাচার, মূল্যবোধ, অনুভূতি, বুদ্ধি ইত্যাদি পরিচালিত হয় দৈব ও অলৌকিক বিশ্বাসের অনুশাসনে, যুক্তিহীন সংস্কারাচ্ছন্নতার মধ্যে। এসব সংস্কার আর বিশ্বাসের জগৎটা তাদের কাছে এমনই অবশ্যম্ভাবী যে, ওই মানুষগুলোকে অনুধাবন করতে হলে – তারা যে মিথ বা উপকথার আদিম বিশ্বাসের জগতের অধিবাসী সেই উপকথার জগৎটাকে সর্বাগ্রে আয়ত্ত করা জরুরি। *নাগিনী কন্যার কাহিনী* উপন্যাসটি শিব-মনসা এবং মনসা-চাঁদসওদাগর-বেহুলা-লক্ষ্মীন্দর কেন্দ্রিক প্রচলিত মিথকে আশ্রয় ও মান্য করেই রচিত। হিজল বিলের বিষবেদে সম্প্রদায়ের জীবনাচারে-ধর্মে এবং বিশ্বাসে-সংস্কারে সংলিপ্ত হয়ে আছে ওই মিথনির্ভর গাথা ও কাহিনী। মূল মিথে ছিল– শিব কুলীন দেবতা, তিনি মর্তলোকে ইতর-

Dhaka University Institutional Repository

ভদ্র নির্বিশেষে সকলের পূজা পান। কিন্তু শিবের মানসকন্যা মনসা নিচু কুলের দেবী। তিনি অভিজাত বণিক-ধনিক শ্রেণির পূজা লাভে আগ্রহী হলেন। এই আকাঙ্ক্ষা সূত্রেই চাঁদ সওদাগরের প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট হল। মনসা ভাবলেন চাঁদ সওদাগরের পূজা পেলে তিনি অভিজাতের দেবী বলে পরিগণিত হবেন। চাঁদ একগুঁয়ে চরিত্রের অধিকারী ; সে যে হাতে শিবের পূজা করে সেই হাতে ওই 'কানী' মনসার পূজা সম্পাদনে নারাজ। একদিকে চাঁদ তাঁর প্রতিজ্ঞায় অটল অন্যদিকে মনসাও তাকে রেহাই দিতে অপ্রস্তুত। ফলে মানব ও দেবতার এই দ্বন্দ্ব চরমে ওঠে। মনসা ও চাঁদের মধ্যে এই অমীমাংসিত দ্বন্দ্ব তৈরি করে প্রতিহিংসা-পরায়ণ সম্পর্কের। শুরু হয় স্বর্গ-মর্তের লড়াই। এই দ্বন্দ্বে অংশত জড়িয়ে পড়েন দেবাদিদেব মহাদেবও। সর্পদেবী মনসা চাঁদ সওদাগরের বশ্যতা লাভের জন্য সর্প দংশনে কেড়ে নিলেন তার ছয় পুত্র, চাঁদের সপ্তডিঙ্গা মধুকর ডুবিয়ে নিয়ে রাখলেন হিজল বিলে, যেখানে তাঁর আসন ও অধিষ্ঠান। তবুও চাঁদ দেবী মনসার বশ্যতা স্বীকার করল না। চাঁদ সওদাগরকে রিক্ত, নিঃস্ব করে দিয়েও পিছু ছাড়লেন না মনসা। চাঁদের দাম্ভিকতাকে চূর্ণ করতে তবু ব্যর্থ হলেন তিনি। চাঁদ সওদাগরের গৃহে এলো চাঁদের ন্যায় ফুটফুটে ছেলে লক্ষ্মীন্দর, গণকরা গণনা করে বলল বাসরঘরে সর্পাঘাতে মৃত্যু হবে লক্ষ্মীন্দরের।

বেদেদের আদি গুরু 'ধন্বন্তরী'-বিশ্বম্ভর ছিল চাঁদ সওদাগরের মিতা ; মনসার বিবাদী সেও। মহাজ্ঞানের অধিকারী ধন্বন্তরীর মন্ত্রপ্রাপ্ত বিষবেদে সম্প্রদায়ের সর্দার-শিরবেদেকে চম্পাইনগর সুরক্ষার দায়িত্ব দিল চাঁদ সওদাগর। বিষবেদে সম্প্রদায়ের আদি-শিরবেদে মন্ত্রোচ্চারণ করে সীমানা চিহ্নিত করে দিল 'সাঁতালী' গাঁয়ের। চাঁদ লক্ষ্মীন্দরকে বিয়ে দিল এক বেনে কন্যার সঙ্গে। লোহার ছিদ্রহীন বাসরঘর তৈরি করা হল নবদম্পতির জন্য। যাতে মনসার অধীন নাগিনীরা দংশন করতে না পারে লক্ষ্মীন্দরকে। বেহুলা-লক্ষীন্দরের বাসর-রাতে শিরবেদে রইল অতন্দ্র প্রহরী হয়ে। বহির্শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মন্ত্রপূত করা হল সুনির্দিষ্ট ভূমিখণ্ড। 'নেউলে-মউরেরা' সর্তক রইল। তবু নিয়তির ইচ্ছায় মনসার পাঠানো কালনাগিনী ছলনার আশ্রয় নিয়ে এগিয়ে গেল মন্ত্র-পড়া সীমানার ধারে কিন্তু কিছুতেই সীমানা ভেদ করতে পারল না ছদ্মরূপা ওই কালনাগিনী। নেউলে-মউরেরা সর্তক করে দিল। মন্ত্রপূত মাটির ঝাঁঝালো গন্ধে এলিয়ে পড়ল ছোট মেয়ের ছদ্মবেশিনী সেই নাগিনী।

কিন্তু নিয়তির ষড়যন্ত্রে ঘটল ভিন্ন ঘটনা। এবার শিরবেদের মৃত কচি মেয়ের অবিকল রূপ ধরে নাগিনীটি ডাকল– বাবা-বাবা বলে। শিরবেদে ভুলল এ ছলনায়। মউর-নেউলেরাও সম্মোহিত হল। কারণ শিরবেদের যে মেয়ে সাপ-নেউলে-মউরের সঙ্গে নাচত এ তো সেই মেয়েরই অবিকল রূপ। শিরবেদে বিশ্বম্ভরের বুভুক্ষ পিতৃহৃদয় কন্যাকে বুকে নেওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠল। মায়াবিনী নাগিনী কন্যা এবার শিরবেদেকে বলল– আমি তোমার কন্যা– পরজনমে নাগলোকে জন্মেছি। তোমার কোলে স্থান নেব বলে এসেছিলাম, তুমি নিলে না। শিরবেদে পাগলের মতো ছুটে গিয়ে মূর্তিমতি নাগিনী কন্যাকে বুকে তুলে নিয়ে বলল, আর আমাকে ছেড়ে যাবি না তো মা? কন্যা তিন সত্যি করল কখনো সে পিতৃবক্ষ পরিত্যাগ করে যাবে না। শিরবেদে বিষমন্ত্র সহ্য করার ঔষধ দিল মূর্তিরূপিণী কন্যাকে। তুমড়ি বাঁশির তালে তালে নাচল শিরবেদে-কন্যা। এইবার নাগিনী ধরল আসল রূপ, নাচের তালে তালে নাগিনীর বিষ-নিঃশ্বাসে গভীর ঘুমে অচেতন করে দিল সে শিরবেদেকে। গভীর নেশায় অচেতন হল শিরবেদে। নাগিনীর জিব-চেরা বিষাক্ত নিঃশ্বাসে লক্ষ্মীন্দরের বাসর ঘরের যে ছিদ্র কয়লা দ্বারা রুদ্ধ ছিল তা খসে গেল। এবার নাগিনী কন্যা আনল চরম আঘাত। বাসর ঘরে প্রবেশ করে দংশন করল লক্ষ্মীন্দরকে।

Dhaka University Institutional Repository

বেহুলা বিলাপ করে উঠল। অবশ্য বেহুলা জাঁতি দিয়ে নাগিনীর লেজ কেটে রেখে দিয়েছিল। চারদিকে হায় হায় রব উঠল সদ্য-বিধবা বেহুলার কান্নায়। উন্মাদের মতো চাঁদ সওদাগর ছুটে এলো চম্পাইনরে প্রহরার দায়িত্বে নিয়োজিত শিরবেদের কাছে । ঢুলু ঢুলু চোখ নিয়ে তাকিয়ে নেশার ঘোরে সব শুনল শিরবেদে বিশ্বম্ভর ; বুঝতে পারল সব ছলনা। নির্বাক রইল শিরবেদে অপমানে-লজ্জায়। চাঁদ সওদাগর দিলে কঠিন শাস্তি সমস্ত বেদেকুলকে। ভোর হওয়ার পূর্বেই চম্পাইনগর ছেড়ে চলে যাওয়ার নির্দেশ দিল চাঁদ সওদাগর। সেদিন থেকেই বিষবেদে সম্প্রদায় হল মানহারা, যাযাবর,অস্পৃশ্য। শিরবেদে হাহাকার করে উঠল। তার বিদ্যা-ধর্ম-সম্মান-মন্ত্রগুণ গেল, হারাল সে কন্যাকেও। ঝাঁপির ভিতর নাগিনী শিস্ দিয়ে জানাল তিন সত্যি-করা কন্যা রয়েছে তার জিম্মায়। নাগিনীটি বলল আমি থাকব তোমার ঘরেই। নাগিনী কন্যা হয়ে জন্মাব পুনরায়, আর বেদেকুলের মান রক্ষা করব সর্বদা। চলো মা বিষহরির আসনে। আমিই পথ দেখিয়ে নিয়ে যাব তোমাদের। সেই থেকে বেদে সম্প্রদায় সব হারিয়ে যাযাবরের জীবন বেছে নিল। সাঁতালীর হিজল বিলের ধারে যেখানে চাঁদ সওদাগরের সপ্তডিঙ্গা মধুকর নিমজ্জিত ছিল, নাগিনী কন্যা নৌকার গলুই-এ বসে পথ দেখিয়ে নিয়ে এল সেখানে। পথে অনির্দিষ্ট যাত্রার ভয়ে অনেকে সঙ্গ ছাড়ল শিরবেদেদের। যারা সঙ্গ ত্যাগ করল না তারাই আসল বিষবেদে সম্প্রদায়ের অর্ন্তভুক্ত রইল। বাকিরা বেদেদের অন্যান্য শাখা-গোষ্ঠী রূপে গণ্য হল। বেদেদের উদ্ভব ও বিকাশের এই উপকথা সকল বেদের মুখস্ত। চাঁদ সওদাগরের অভিশাপ নিয়ে শুরু হল বিষবেদের অনিশ্চিত নতুন জীবন। তবে মা বিষহরি রইলেন তাদের সর্বসহায় রূপে। আর নাগিনী কন্যা রইল বিষবেদের ঘরের শোভা বর্ধনের কাজে ; বংশের ঐতিহ্য,ধর্ম ও মান রাখতে। মনসার বরে বিষবেদেরা পেল সর্প-বিষহরণের ক্ষমতা ও নাগিনী কন্যা[১]।

উপর্যুক্ত উপকথাকে কেন্দ্র করেই বিষবেদেদের জীবন আবর্তিত। একটি উপকথা থেকে সৃষ্টি হয়েছে আরও নানা শাখা-উপকথার। এসব উপকথাই তাদের জীবনের নিয়ন্ত্রক ও পরিচালক। উপকথার উপর্যুক্ত স্তর বা পর্যায় থেকেই বেদেরা হল নতুন সমাজ-ধর্ম-বর্ণ ও জীবিকার মানুষ। শিবের উপাসক চাঁদের অভিশাপ মাথায় নিয়ে তারা হল মনসার কৃপাপ্রার্থী। বেদে সমাজে এ কথা প্রচলিত আছে যে, যে-নাগিনী লক্ষ্মীন্দরকে দংশন করার জন্য শিরবেদের হারানো কচি মেয়ে সেজে এসেছিল, যার জন্য বেদেকুল সর্বরিক্ত হয়েছিল, সে কন্যা ফিরে আসবে যুগে যুগে। তাকে চিনে নিতে হবে, সমাদরে রক্ষা করতে হবে। বেদেকুলে জন্ম নেওয়া এই কন্যা স্বামীর সর্পদংশন-জনিত মৃত্যুর কারণে পাঁচ বছর বয়সেই বিধবা হবে। এরপর তার আর বিয়ে হবে না, ষোল বছর বয়সে এই মেয়ের মধ্যে পরিস্ফুট হবে নাগিনী লক্ষণ। কপালে ফুটে উঠবে 'চক্রচিহ্ন'। সেই কন্যা নেবে কুলদেবী বিষহরির পূজার ভার। বেদে কুলের কল্যাণ প্রতিষ্ঠা করবে এই নারী। বিষহরির ইচ্ছার কথা নাগিনী কন্যা জানাবে বেদেদের।[২] বেদেরা বংশ পরম্পরায় এ সত্য অবগত যে, স্বামীকে হত্যার কারণে বেহুলার অভিশাপে ওই নাগিনীর বংশের ধারাক্রম রহিত হয়েছে। অর্থাৎ সতী বেহুলার অভিশাপে কালনাগ হয়েছে নির্বংশ। আর তাই কালনাগিনীর দেহ লক্ষণযুক্ত হয়ে মর্তবাসিনী নাগিনীকন্যাও নিঃসঙ্গ, স্বামী ও সন্তানহীনা।[৩] অন্যের সান্নিধ্যে সন্তান লাভ করলেও সে হবে সন্তানঘাতিনী।

উপকথা-আশ্রিত বেদেজীবনের পরতে পরতে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য উপকথা আর লোকপুরাণের কাহিনী। তারা জানে– কালীয়নাগকে কৃষ্ণ দমন করেছিলেন কৌশলে। কালীয়নাগের কন্যাকে বিয়ে করার প্রতিশ্রুতি দিয়েও কৃষ্ণ আর ফিরে আসেননি। সেই নাগকন্যা কৃষ্ণের অপেক্ষায় প্রতিদিন

Dhaka University Institutional Repository

সন্ধ্যাবেলায় চাঁপাফুলে সজ্জিত হয়ে যমুনার তীরে ঘুরে বেড়াত আকুল হয়ে। আর তা নিয়ে নাগমেয়েরা কটাক্ষ করত কালীয়কন্যাকে। সেই কৃষ্ণাভিসারিনী নাগ কন্যা তাদের অভিশাপ দিয়ে বলেছিল– বিশেষ সময়ে যখন কোন নাগকন্যার হৃদয়ে যৌনবাসনা জাগ্রত হবে, তখন তার সর্বাঙ্গ থেকে উৎসারিত হবে চাঁপাফুলের গন্ধ । যা তাদের লজ্জার ও অপমানের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।[৪]

এইসব পৌরাণিক কথা ও কাহিনী বেদেদের কণ্ঠস্থ। তাদের জীবনাচারের সবটাই নিয়ন্ত্রিত হয় এই কথা ও কাহিনীর আশ্রয়ে। বিষবেদে জীবন-সত্যও ছিল এসব উপকথা-কেন্দ্রিক। তাদের পুরাণকথায় আছে– নাগসেবা করে এক বণিক-বধূ নাগলোকে গিয়েছিল এবং সহস্র নাগের সেবায় ব্রতী হয়েছিল। তবে তার জন্য নিষিদ্ধ ছিল দক্ষিণ দিকে তাকানো। সেখানে মা মনসার 'বারি'। [৫] একদিন গরম দুধে নাগদের মুখ-জিহ্বা পুড়ে গেলে রুষ্ট হল নাগেরা। বিষহরি বলেছিলেন– "নরে- নাগে বাস হয় না।" তাই বণিকবধূকে আবার ফিরে আসাতে হল মর্তলোকে। যাবার আগে দক্ষিণ দিকপানে কী আছে তা দেখতে গিয়েই দেখল সে মা বিষহরির 'বিষবিভোর' রূপ। দেবী বিষহরি বিষময়ীরূপ পরিবর্তন করে অমৃতময়ীরূপ ধরে এসে তখন বণিকবধূকে জিজ্ঞেস করলেন– 'ও বেনে বেটী কি দেখলে বল? 'বেনেবেটী' বললে– 'না মা কিছু দেখি নাই'। মা তুষ্ট হয়ে বলেছিলেন– 'তুই আমার গোপন কথা ঢাকলি স্বর্গে, আমি তোর গোপন কথা ঢাকব মর্ত্যে।' [৬] বেদে কৌমে প্রচলিত আছে শিব ও মনসার কামভাব জাগৃতির আর এক লোক-পুরাণ। ভোলা মহেশ্বরের কন্যা বিষহরি। বিষহরির রূপমাধুর্যে শিবের কামভাব জাগ্রত হলে বিষহরি বিষদৃষ্টিতে তাকালেন পিতা শিবের দিকে। বিষপ্রভাবে সঙ্গে সঙ্গে শিব ঢলে পড়লেন মাটিতে।[৭]

বাস্তব জীবনে অসংখ্য ঘটনাকে উপকথার অনুষঙ্গে সাজিয়ে বিষবেদেরা তাদের রহস্যময় জীবন যাপন করে। তাদের বিশ্বাস গগনভেরী পাখিরা গরুড়ের বংশধর। বৈমাত্রেয় জ্ঞাতি-সূত্রের কারণেই সাপেদের সাথে তাদের শত্রুতা। তাই দেবতাদের মীমাংসায় শীতকাল গরুড় পাখিদের এক্তাং গ্রীষ্মকাল সাপেদের বিচরণের জন্য বরাদ্দ হয়।[৮]

পৌরাণিক কাহিনী-নির্ভর জীবনবৃত্তের অধিবাসী বিষবেদে সম্প্রদায়ের প্রধান আরাধ্য সর্পবেদী মনসা।[৯] চাঁদ সওদাগরের অভিশাপে বিষবেদেরা জাত, মান, কুল, মহাজ্ঞান ইত্যাদি সব হারিয়ে যখন নিঃস্ব, তখন মনসার কৃপাতেই তারা নতুন সামাজিক আশ্রয় ও বিষবিদ্যায় পারদর্শিতা ফিরে পেয়েছিল। সাপ ও সাপের বিষ নিয়ে কারবারি এই গোষ্ঠীর কাছে বিষহরি বা মা মনসাই সর্বশক্তির আধার। *নাগিনী কন্যার কাহিনী*-তে হিজল বিলের বিষবেদেদের বিশ্বাস মনসার ইচ্ছাতেই তাদের ভাল-মন্দ, ভাগ্য-জীবিকা ইত্যাদি নিয়ন্ত্রিত হয়। তারা বিশ্বাস করে সাঁতালী গ্রামের মাঝখানে বিষহরির 'থান'। এই বিষহরির কৃপাতেই বেদেরা সর্প-বিষয়ক সকল মন্ত্রজ্ঞানে সিদ্ধ। তাই প্রাত্যহিক সকল কাজেই বিষহরিকে তাদের ভীষণ সম্ভ্রম ও ভয়। তাদের বিশ্বাস বিষহরির কন্যাই 'নাগিনী কন্যা'। নাগিনী কন্যা তাদের কাছে বিষহরির কন্যা এবং তাদের পথ-প্রদর্শক। তাই নাগলোকের অধিষ্ঠাত্রী এই দেবীকে বিষবেদেরা জননী-রূপে কল্পনা করে। বিষহরির দেওয়া মন্ত্রগুণেই তারা নাগ-নাগিনীদের বশীভূত করতে সমর্থ। এই সামর্থ্যের গুণে তারা সমাজে সম্মান আকর্ষণ করে এবং জীবিকা নিশ্চিত করে। যে কোন ধরনের সংকটে

Dhaka University Institutional Repository

তারা মনসার আশ্রয় ও সাহায্য প্রার্থনা করে। হিজল বিলের বিষবেদেরা বলে– 'বেদেকুলের মা বলতে বিষহরি, বেদেদের অন্য মা নাই। কালী না, দুর্গা না– কেউ না। বেদেদের বাপ বলতে শিব। শিবের মানস হতে মা-বিষহরির জনম গ। পদ্মবনের মধ্যে শিবের মনের থেকে জন্ম নিয়া পদ্মপাতের মধ্যে ধীরে ধীরে মা বড় হয়্যা উঠলেন। মায়ের আমার পদ্মবনে বাস– অঙ্গের বরণ পদ্মফুলের মতো। শিবঠাকুরের মধুপান কর্য়া নেশা হয় না, তাই শিবের কন্যে পদ্মবনে পদ্মমধু পান করলেন, সেই কন্যের কণ্ঠে– অমৃতের থেক্যা মধু হইল ; তখন সেই মধু খাইলেন শিব। সেই মধুতে তাঁর কণ্ঠ হ'ল নীল বরণ, মধুর পিপাষা মিট্যা গেল চিরদিনের তরে ; চক্ষু দুটি আনন্দে হলো ঢুলু ঢুলু! শিবের কন্যে পদ্মাবতী– পদ্মের মত দেহের বরণ, তেমনি তাঁর অঙ্গের সৌরভ, মা হলেন চিরযুবতী।' [১০] চাঁদ-মনসার সংঘাতের পর থেকেই মনসা জননী, দেবী, রক্ষক ও মঙ্গলকারিণী-রূপে হিজল বিলের বিষবেদে সমাজে প্রতিষ্ঠিত। পদ্মবনে জন্ম বলেই মনসার নাম পদ্মাবতী। চাঁদ সওদাগরের সাত ডিঙ্গা মধুকর সমুদ্রের ঝড়ে ডুবেছিল এই হিজল বিলে। বৃন্দাবনের কালীদহের কালীনাগ কালোঠাকুরের দণ্ড মাথায় নিয়ে এই হিজল বিলেই এসে বাসা বেঁধেছিলেন দেবী মনসা। সেই থেকে হিজল বিলই তাদের কাছে মনসার আসন হিসাবে পূজিত হয়। নাগলোকে মনসা নানা জাত ও বর্ণের সাপের অলঙ্কার ধারণ করে আছেন। নাগকন্যারা নিঃশ্বাসের বিষাক্ত বাতাস দিয়ে ঘুম পাড়ায় মনসাকে। মনসা বিষমুক্ত থেকে বিষপান করেন আর উগড়ে দেন। মনসার এই ভয়ংকর মূর্তি বিষবেদেদের মধ্যে সম্ভ্রম আর ভয়ের উদ্রেক না করে পারে না।

দেবী মনসার ওপর বিষবেদেরা যাঁকে স্থান দেয় তিনি মনসার পিতা শিব। শিব হলেন বিষবেদেদের জন্ম-মৃত্যুর অধিকর্তা। তাই শিবের আজ্ঞা তাদের কাছে মহা-আজ্ঞা। তবু মনসা তাদের কাছে অধিক জীবন্ত ও কার্যকরী দেবী। বিচিত্র এই কৌমের ধর্মাচারেও রয়েছে যথেষ্ট বৈচিত্র্য। অন্যান্য বেদে গোষ্ঠীর ন্যায় এরাও হিন্দু দেব-দেবীদের সম্মান করে, তথাপি মনসা আর শিবই তাদের মনোলোক ও জীবন ধারায় অধিক জাগ্রত ও অধিষ্ঠিত।

দুই

পৃথিবীর সব কৌমগোষ্ঠীর ন্যায় বিষবেদে কৌমেরও রয়েছে একটি নির্দিষ্ট সমাজ সংগঠন। বিষবেদে সমাজ পুরুষতান্ত্রিক। এদের রয়েছে একজন শক্তিমান গোত্রপতি। সমাজে এই গোত্রপতিই শিরবেদে নামে পরিচিত। শারীরিক শক্তি, বুদ্ধিমত্তা, বিষবিদ্যার পারদর্শিতা ও বংশানুক্রমিক ঐতিহ্য অনুসরণ করে কৌমের শিরবেদে নির্বাচন করা হয়। এক্ষেত্রে অবশ্য পুরাতন শিরবেদের উত্তরাধিকারকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। বেদে সমাজের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী এবং তাদের আর্থ-সামাজিক নীতি নির্ধারণের ক্ষমতা এই শিরবেদের। হিজল বিলের বিষবেদেরা শিরবেদেকে যথেষ্ট মান্য করে এবং ভয় পায়। কৌমের সকল প্রকার প্রশাসনিক ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে শিরবেদের হাতে। গোত্রে কেউ অনাচার ব্যভিচার বা নিয়ম ভঙ্গ করলে শাস্তির ব্যবস্থা করে শিরবেদে। বেদে সম্প্রদায়ের নারী-পুরুষ সকলেই তাকে সমীহ করে এবং তার আদেশ নির্দেশ মানতে বাধ্য থাকে। শিরবেদের পরেই বিষবেদে সম্প্রদায়ে নাগিনী কন্যার স্থান। নাগিনী কন্যা যেহেতু আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী এবং বিষবেদে সম্প্রদায়ের রক্ষা ও তাদের সম্মান রক্ষার জন্য বিষহরির কৃপায় প্রেরিত, সেহেতু নাগিনী কন্যার গুরুত্ব ও ভূমিকা বিষবেদে

Dhaka University Institutional Repository

সমাজে স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত। তবে নাগিনী কন্যার গোত্রগত প্রশাসনিক কোনো ক্ষমতা থাকে না। বেদেদের প্রতি নাগলোকের ঋণ শোধ করতেই যুগ যুগ ধরে নাগিনী কন্যার আগমন ঘটে বিষবেদে সমাজে। এই নাগিনী কন্যারা বিষবিদ্যা ও দিব্যজ্ঞান সম্পর্কে থাকে পারদর্শী এবং দেবী মনসার সরাসরি আশীর্বাদপুষ্ট। ফলে সমাজ সংগঠনের নানা স্তরে নাগিনী কন্যা ও শিরবেদের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব অনিবার্য হয়ে ওঠে। তথাপি শিরবেদের কর্তৃত্বকে মেনে নিতে হয় নাগিনী কন্যাকেও। গোত্রের অন্য সকলেই নাগিনী কন্যাকে বিষহরির কন্যা হিসেবে বিশেষ সম্ভ্রমের দৃষ্টিতেই দেখে। কারণনাগিনী কন্যা বিষহরিরই মর্ত-প্রতিনিধি। নাগিনী কন্যাকে শুদ্ধাচারী ও তপস্বিনী হতে হয়। প্রেম ও যৌন-সম্পর্ক স্থাপন তাদের জন্য গর্হিত অপরাধ।

ভারতীয় প্রাচীন নিম্নবর্গের মানুষের মধ্যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে বিষবেদে সমাজ অত্যন্ত নিম্নস্তরের। *নাগিনী কন্যার কাহিনী* উপন্যাসে বিধৃত এই বিষবেদেরা বৃহত্তর হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত হলেও তাদের রয়েছে নিজস্ব পুরাণ-কথা ; সমাজে প্রচলিত নিজস্ব উপকথা, কুসংস্কার, মিশ্র ধর্ম-সংস্কৃতি, অলৌকিক বিশ্বাস আর মন্ত্রে পরিপূর্ণ লোক-পুরাণের জগৎ। অস্পৃশ্য বলে বৃহত্তর ভদ্র সমাজে এদের যাতায়ত খুবই সীমিত। সাপের বিষ বিক্রি, জড়ি-বুটি বিক্রি, গৃহস্থের ঘরে সাপ ধরতে যাওয়া, খেলা দেখানো ও হাতে তৈরি সামগ্রী বিক্রি করতে যাওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ওই সংযোগ। ফলে বৃহত্তর সমাজ থেকে তারা থেকেছে প্রায়-বিচ্ছিন্ন।

বিষবেদে সমাজ রহস্যাবৃত এক সমাজ। যুগ যুগ ধরে আরণ্যক প্রকৃতিকে ধারণ করে আছে বলে তারা ভূতকালের মানুষই থেকে গেছে শেষ পর্যন্ত। অসভ্য বন্য-বর্বর জীবন-যাপনের কারণে অন্য বেদেদের থেকেও বিষবেদেরা অধিকমাত্রায় আরণ্যক। বিষবেদে সমাজের প্রতি ভদ্র সমাজের রয়েছে ভয় ও উপেক্ষা। তাদের সামাজিক রীতি-পদ্ধতিও বিচিত্র এবং রহস্যময়। বেদে সমাজের মধ্যেও রয়েছে প্রকারভেদ। যেমন– মাল বেদে, মাঝি বা ইসলামী বেদে, মেটেল বেদে, বিষবেদে নামে তাদের বিভিন্ন সমাজের অস্তিত্ব সম্পর্কে জানা যায়। এর মধ্যে বিষবেদেরা নিজেদেরকে অধিকতর কুলীন ও মন্ত্রসিদ্ধ কৌম বলে মনে করে। সাপ বিষয়ে এরা সর্বাধিক পারদর্শী। প্রকৃত কালনাগিনীর বিষ সংগ্রহে এরা সিদ্ধহস্ত। বিষবেদেরা সভ্যতার আলোকছটাকে যথাসাধ্য পাশ কাটিয়ে নিজেদের সমাজ ব্যবস্থাকে দীর্ঘকাল টিকিয়ে রাখতে সচেষ্ট থেকেছে। *নাগিনী কন্যার কাহিনী* উপন্যাসে বিষবেদে কৌমের উপর্যুক্ত সামাজিক সাংস্কৃতিক ও ঐতিহ্যিক পরিচয় বিধৃত হয়েছে।

সাপ গ্রীষ্মমণ্ডলীয় এলাকার প্রধান সরীসৃপ। অবিভক্ত বাংলার পূর্ব ও পশ্চিম উভয় অঞ্চলের পারিবেশিক কারণেই এখানে সাপের অস্তিত্ব অধিক। আর এ কারণেই অরিদেবী মনসার পূজার প্রচলনও ওই দুই অঞ্চলেই বেশি। নদীমেখলা পূর্ব বাংলার জীবনে ও সমাজে মনসার অবস্থান অত্যন্ত সুদৃঢ়। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মনসামঙ্গল কাব্যের একটি শক্তিশালী ধারা ও আদর্শ ছিল সুপ্রতিষ্ঠিত। তবে অবিভক্ত বাংলার রাঢ় অঞ্চলও ছিল সর্পসংকুল। তাই সাপকে জীবিকা হিসাবে অবলম্বনকারী বেদে গোষ্ঠীর আধিক্য রয়েছে এ অঞ্চলে। *নাগিনী কন্যার কাহিনী* উপন্যাসের বিষবেদে সম্প্রদায় ওই অঞ্চলেরই অধিবাসী। পৃথিবীর অনেক জাতির মধ্যেই রয়েছে সাপ সম্পর্কে নানা প্রচলিত লৌকিক-অতিলৌকিক সংস্কার। পৃথিবীর অনেক আদিম উপজাতির মতো হিজল বিলের এই বিষবেদেদেরও আছে সাপকে নিয়ে নানা বিশ্বাস, সংস্কার আর উপকথা। হিজল বিলের বিষবেদে কৌমের মধ্যেও বিচিত্র বিশ্বাস, সংস্কার ও উপকথা বিদ্যমান। সাপকে তারা দেবীর প্রতিস্থানীয় রূপে কল্পনা করে। হিজল বিল ও সাঁওতাল পাহাড়

Dhaka University Institutional Repository

অঞ্চল বিষবেদেদের কাছে বিশ্বাসের এক বিশেষ প্রতীকী রূপ লাভ করেছে। সর্পসংকুল এ অঞ্চলে দেবীর আসন প্রতিষ্ঠিত বলেই এ স্থানের প্রতি তাদের ভিন্নমাত্রিক আকর্ষণ।

প্রকৃতির রহস্যালোকে ঘেরা এই সমাজে রয়েছে নানা রকম বিধি-নিষেধের বেড়াজাল। টোটেম তাদের জীবনের গতিধারাকে বহুলাংশে নিয়ন্ত্রণ করে। হিজল বিলের বিষবেদে গোষ্ঠীর রয়েছে অসংখ্য টোটেমে বিশ্বাস। এসব টোটেম-সংস্কার তাদের জীবনের সংবিধান স্বরূপ। যেমন– 'শিয়াল ডাকিলি পরে, বেদেরা না লিবে ঘরে।' [১১] অর্থাৎ জীবিকার প্রয়োজনে বেদে নারীরা সারা দিন গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু সূর্যাস্তের পূর্বে শিয়াল ডাকার আগে বেদে নারীদের তাদের আস্তানায় ফিরে আসতে হয়। অন্যথা সমাজের অনুশাসন মতে তাদের দুর্ভোগ পোহাতে হয়। আবার এমন বিশ্বাস প্রচলিত আছে– 'যমরাজার দক্ষিণ দুয়ার হিজলেরই বিল।' [১২] অর্থাৎ এখানে হিজল বিলের দক্ষিণ দিকে যাওয়ার ব্যাপারে বেদেদের নিষেধ আছে। স্বর্গলোকে যেমন বণিক-বধূর দক্ষিণ দিকে তাকানো নিষেধ ছিল দেবী মনসার আসন থাকায়, তেমনি মর্তলোকেও এর অনুসরণে বেদেরা মনসার প্রকৃত রূপধারী অবস্থা যাতে দৃষ্টিগোচর না হয় তার জন্যই এই নিষেধাজ্ঞা বহাল রেখেছে। বেদেরা হিজলের দক্ষিণ দিকে যাওয়ার এই নিষেধ কঠোরভাবেই তাই মেনে চলে।

গোত্রের নাগিনী কন্যার দিকেও বেদে পুরুষদের তাকানো নিষেধ। [১৩] নাগিনী কন্যা দেবী মনসা-প্রেরিত কন্যা ; মনসার সর্বাগ্রে পূজার অধিকার তারই, তাকে থাকতে হয় স্বচ্ছ-পবিত্র। তাই কোন বেদে পুরুষের কামনার বস্তু হতে পারে না এই নাগিনী কন্যা। বেদেদের জীবন জীবিকার স্তরে স্তরে সঞ্চিত রয়েছে নানা রহস্য ও গোপন কথা, যা সমাজের গৌরবময় সম্পদ বলেই তারা মনে করে। কিন্তু এহেন কুলের লক্ষ্মী– গোপন সম্পদ কেউ যদি অন্যের কাছে প্রকাশ করে তার জন্য রয়েছে কাঠোর শাস্তির বিধান। কারণ এতে তাদের পেশাগত ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে। তাই বেদেদের গোপন কথা প্রকাশ করা সমাজের প্রতিটি সদস্যের জন্য গর্হিত অপরাধ।[১৪]

তিন

তারাশঙ্কর তাঁর *নাগিনী কন্যার কাহিনী* উপন্যাসে বেদে কৌমের সংস্কৃতিকে রাঢ়ের এক সমৃদ্ধ অধ্যায়রূপে সংযোজন করেছেন। রাঢ়ের আদিবাসী কৌম গোষ্ঠীর মধ্যে বিষবেদেদের সংস্কৃতি-জীবন বৈচিত্র্যমণ্ডিত। সমাজে প্রচলিত সংস্কারগুলোকে তারা ধর্ম বিধানরূপে জ্ঞান করে। বেদে সমাজে প্রচলিত উপকথাগুলোই তাদের জীবন-সংস্কৃতির ভিত্তি। তাদের পূজা-পার্বণ, নৃত্য-গীত, বিনোদনসহ জীবনাচরণের সর্বত্রই জড়িয়ে আছে উপকথা-আশ্রিত বিশ্বাস। মনসা-চাঁদসওদাগর-শিব সংক্রান্ত উপকথা তাদের জীবন সত্যের নিয়ামক রূপে সক্রিয়। হিজল বিলের বেদেদের দৃষ্টিসীমা কখনোই এ উপকথার জগৎকে অতিক্রম করতে পারেনি।

বিষবেদেরা মনসাকে জননীরূপে কল্পনা করে। আদি শিরবেদে বিশ্বম্ভরের পতনের সেই কালোরাত থেকে মনসাই তাদের একমাত্র আশ্রয়দাত্রী দেবী। নিম্ন শ্রেণির হিন্দুদের অন্যান্য পুজো-পার্বণে বিষবেদেরা অংশগ্রহণ করলেও মনসা-কেন্দ্রিক পুজো-পার্বণই বেদেকৌমের প্রধান কৃত্য ও উৎসব। অন্যদিকে মনসার পিতা দেবাদিদেব শিবকে তারা পিতারূপে মান্য করে। ভাদ্রের শেষে নাগপঞ্চমীর

Dhaka University Institutional Repository

রাতে ধূপ-ধুনা আর তুমড়ী-বাঁশির সুরে হিজল বিলের বিষবেদেরা দেবী মনসার পুজো করে সমারোহে। দিনান্তে মায়ের 'থানে' পুজো শেষে গোটা সম্প্রদায় মেতে ওঠে নাচে-গানে। এ-সব অনুষ্ঠানে প্রধান গায়িকার দায়িত্ব পালন করে নাগিনী কন্যা। আর দোহারের মতো 'ধুয়া' ধরে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী সকলে। গানে-গানে নাগিনী কন্যা তুষ্ট করে দেবী মনসাকে। গানের মাধ্যমে বিষবেদেরা স্মরণ করে নিজেদের জাতিগত ইতিহাস। মনসা-প্রেরিত নাগিনী কন্যা আদি শিরবেদেকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল চিরদিন তাদের সাথে থাকার। নাগিনী কন্যার গানে গানে সে কথারই প্রতিধ্বনি। –

ও আমার সাত জন্মের বাপ গ– তোরে দিচ্ছি বাক্ গ!

অ- গ!

তোরে ছেড়্যা যাইলে আমার মুণ্ডে পড়বে বাজ গ!

অ- গ!

এ ঘোর সঙ্কটে তুমি রাখলে আমার মান্যে গ!

অ- গ!

জন্ম জন্ম তোমার ঘরে হইব আমি কন্যে গ!

অ- গ!

তোমার বাঁশির তালে তালে নাচব হেল্যা-দুল্যা গ!

অ- গ!

আমার গরল হইবে সুধা তুমি বাবা ছুল্যে গ!

অ- গ! [১৫]

নাগপঞ্চমীর পুজো শেষ করে হিজল বিলের বিষবেদেরা বিষহরির আশীর্বাদ নিয়ে বেরিয়ে পড়ে তাদের আদি কুল-ব্যবসায়। দেশ-বিদেশে নেচে-গেয়ে, খেলা দেখিয়ে এবং কাল নাগিনীর বিষ বিক্রি করে ভরা শীতে আবার ফিরে আসে তারা হিজল বিলে। এর সবই পরিচালিত হয় তাদের ঐতিহ্য ও প্রথা অনুসারে। চাঁদ সওদাগরের বন্ধু আদি শিরবেদে বিশ্বম্ভরকে ছলনা করে বিষহরি-প্রেরিত নাগিনীটি দেবীর অভিলাষ চরিতার্থ করেছিল লক্ষীন্দরকে দংশন করে। সেই থেকে বিষবেদেরা অচ্ছুত বা ব্রাত্য হয়েও লাভ করেছিল মনসার কৃপা। উপন্যাসে বিধৃত উপকথার গানে প্রকাশিত হয়েছে বেদেদের জীবনের সেই নিগূঢ় কাহিনী–

জয় বিষহরি গ! জয় বিষহরি!

চাঁদো বেনে দণ্ড দিল

তোমার কৃপায় তরি গ!

অ– গ!

চম্পাই নগরের ধারে

সাঁতালী পাহাড় গ!

অ– গ!

ধন্বন্তরি 'মন্তে' বাঁধা

Dhaka University Institutional Repository

সীমেনা তাহার গ!

অ– গ!

'বিরিখ্যে' ময়ূর বৈসে

'গত্তে গত্তে' নেউল গ!

অ– গ!

বিষবৈদ্য বৈসে সেথায়

'বাণ্ডুলা বাউল' গ!

অ– গ! [১৬]

আদি নাগিনীর ওই ছলনার ধারা প্রভাবিত ও সংক্রমিত হয়েছে হিজল বিলের নাগিনী কন্যা অবধি। নাগিনী কন্যা তার লাস্যময়তা, চাতুর্যপূর্ণ তীক্ষ্ম দৃষ্টি, হিল্লোলিত দেহ ও সুরেলা কণ্ঠে গান গেয়ে গৃহস্থ নারী-পুরুষের মন ভুলিয়ে উপঢৌকন আদায় করে। তখনও তাদের গানের কথায় থাকে সেই আদি কাহিনী। কখনো 'ভাসান' গান [১৭] গেয়ে গৃহস্থ বৌ-ঝিদের হৃদয় আর্দ্র করে তোলে তারা। বেহুলা যে গান গেয়ে দেবতাদের মনোরঞ্জন করে দংশিত স্বামীর প্রাণ ফিরিয়ে এনেছিল, হিজলের বিষবেদে নারীদের কণ্ঠে গীত হয় সেই বেহুলা-পালাও।–

উর্‌র্‌– হায় হায়, লাজে মরি,

আমার মরণ ক্যানে হয় না হরি!

আমার পতির মরণ সাপের বিষে

আমার মরণ কিসে গ!

মদন-পোড়া চিতের ছাইয়ের

কে দেবে হায় দিশে গ!

অঙ্গে মেখে সেই পোড়া ছাই

ধৈরয মুই ধরি গ ধৈরয মুই ধরি, – উর্‌র্‌, হায় গ![১৮]

বাবুদের কাছ থেকে অধিক অর্থপ্রাপ্তির প্রত্যাশায় বেদে নারীদের ছলা-কলার অন্ত থাকে না। বাঁদরের বা সাপের নাচের পর হিল্লোলিত দেহ গানে গানে মেলে ধরে নাগিনী কন্যা, বাবুদের কাছে পেশ করে তাদের দাবি–

যেমন বাবুর চাঁদো মুখো

তেমনি বিদায় পাব গ!

বেনারসীর শাড়ি পর‍্যা

লেচে লেচে যাব গ!

প্রভু রাঙা হাত ঝাড়িলে

আমার পাহাড় হয় গ!... [১৯]

Dhaka University Institutional Repository

নাগিনী কন্যা দেবী মনসার পূজার অন্যতম অধিকারিণী বলে তাকে সর্বদা থাকতে হয় পূত-পবিত্র। পুজোর সময়ে নাগিনী কন্যার ওপর ভর করেন দেবী মনসা। তখন তার সঙ্গে সরাসরি সংযোগ ঘটে বিষহরির। ফলত নাগিনী কন্যা তখন হয়ে ওঠে অতিলৌকিক জগতের অধিবাসী। দিব্য দৃষ্টিতে তখন সে বেদেকুলের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রত্যক্ষ করতে সমর্থ হয়। পুজোর অন্তে বাহ্য জ্ঞান ফিরলে বেদেরা ধূপ-ধুনা আর তুমড়ি বাঁশি বাজিয়ে ঘিরে ধরে নাগিনী কন্যাকে বিষহরির দেওয়া আদেশ শোনার জন্য।

নাগিনী কন্যার বয়স বাড়লে, চিত্তে জৈব-কামানার সঞ্চার হলে কিংবা কোনো ব্যাভিচার তাকে স্পর্শ করলে লুপ্ত হয় তার নাগ মাহাত্ম্য। শিরবেদে বেদে সম্প্রদায়ের পতনের কালোরাত্রিকে স্মরণ করে কৃষ্ণপঞ্চমীর ঘোর অন্ধকার রাতে বসে বিষহরির পুজোয়। ওই দিন ধূপ-ধুনার অন্ধকারে নিজের দেহের রক্ত দান করে সে প্রার্থনা জানায় নতুন নাগিনী কন্যার জন্যে। নাগ-জননী পুজোয় তুষ্ট হলেই পুনরায় পাঠাবেন নতুন নাগিনী কন্যা বেদেকুলে।

চার

বিষবেদেরা বাউন্ডুলে ও বাউল স্বভাবী। বিষ-চিকিৎসায় তাদের দক্ষতা অসামান্য। সাপে-কাটা রোগীর বিষ ছাড়াতে 'ধন্বন্তরি'র মন্ত্র তারা স্মরণ করে গানে-গানে।–

তুরা খাস গো সুধার মধু মোরা খাইব বিষ গ!

অ– গ!

তুদের ঘরের কালসপ্য মোদের গলায় দিস গ!

অ– গ!

আর দিস গো ছেঁড়া বস্তর মুষ্টি মেপ্যা চাউল গ!

অ– গ!

গুরুর আজ্ঞায় বিষবৈদ্য বাণ্ডুলা বাউল গ !

অ– গ! [২০]

জীবিকার সন্ধানে পর্যটনরত বিষবেদেরা মনসা-চাঁদসওদাগরের বিবাদের কাহিনীও পরিবেশন করে। গানে গানে তারা হাহাকার জাগায় গৃহস্থ ঘরের বউ-ঝিদের বুকে। যেমন–

মরুক মরুক চাঁদো বেনে মুন্ডে পড়ুক বাজ গ!

অ– গ!

এত দেবতা থাকতে হৈল মনসার সঙ্গে বাদ গ!

অ– গ! [২১]

আবার তাদের পরিবেশিত বেহুলার ভাসান গান করুণার্দ্র ও সম্মোহিত করে ভদ্রপল্লির নর-নারীদের। ভাসান গানের মাধ্যমে তারা স্মরণ করে তাদের পূর্ব ইতিহাস –

Dhaka University Institutional Repository

জলে ভেসে যায় রে সোনার কমলা।
হায় গ! হায় গ!
কঠিন নাগিনী তোর দয়া হ'ল না!
হায় গ! হায় গ! [২২]

ফাল্গুনে ঘাসে আগুন দিয়ে নাগ-নাগিনীর শীতের গভীর ঘুম ভাঙ্গানোর দায়িত্ব বিষবেদের। এ দায়িত্বও তারা পালন করে মহা-উৎসবের সাথে। এ সময় যদি ধরা পড়ে নতুন কোন নাগিনী, তাহলে তা কৌমের জন্য শুভ লক্ষণ। বন পোড়ানোর পর পরই নাগিনী কন্যা বসবে দেবী মনসার ধ্যানে। শিরবেদের ডাকে ধ্যানমগ্না নাগিনী কন্যার সম্বিত ফিরে পাওয়াকে তারা উপলব্ধি করে মনসার জাগরণ হিসেবে। এ-সময় তারা হাঁস, বনপায়রা ও নানা রকম পাখি মনসার উদ্দেশে বলি দেয়। পরে, ভোজনান্তে মেতে ওঠে নাচ-গান ও আনন্দ উৎসবে।

পাঁচ

তারাশঙ্কর তাঁর *নাগিনী কন্যার কাহিনী* উপন্যাসে দুই ধরনের ভাষা ব্যবহার করেছেন। একটি লেখক ভাষ্য অন্যটি চরিত্রের বাচনিক ভাষা। লেখক বা ঔপন্যাসিক ভাষ্যে ভাষা-ব্যবহারের ক্ষেত্রে তিনি মান্য চলিত ভাষাই ব্যবহার করেছেন। তারাশঙ্কর তাঁর প্রথম দিককার উপন্যাস সাধু ভাষারীতিতেই লিখেছেন। চলিত ভাষারীতিতে লিখিত প্রথম উপন্যাস *মন্বন্তর* (১৯৪৪)। *মন্বন্তর*-পরবর্তী সকল উপন্যাসই চলিত ভাষায় রচিত। [২৩] *নাগিনী কন্যার কাহিনী* উপন্যাসের ঘটনা এবং বিষয়-পরিচিতির বর্ণনায় তিনি চলিত ভাষা প্রয়োগ করেছেন। কখনো আবার 'ধন্বন্তরী' ও শিবরামকে দিয়েও মান্য চলিত ভাষায় কথা বলিয়েছেন। বস্তুত হিজল বিলের বিষবেদেদের শিব-মনসার নব্য মিথ বর্ণনায় তিনি ব্যবহার করেছেন এই মান্য চলিত ভাষা। চরিত্র রূপায়ণের ক্ষেত্রে লেখক চরিত্র-উপযোগী ভাষা নির্মাণ করেছেন। কৌমের চরিত্রসমূহের সংলাপে তিনি ব্যবহার করেছেন রাঢ়ী উপভাষা।[২৪] এ উপন্যাসের নানা স্থানে উচ্চ ও নিম্নবর্ণের মানুষের চরিত্র-উপযোগী ভাষা স্থাপন করা হয়েছে। বেদেরা নিম্নবর্গের বলেই তাদের মুখে দেওয়া হয়েছে কথ্য আঞ্চলিক ভাষা। বিষবেদেদের ভাষায় মিথনির্ভর আঞ্চলিক লোকপুরাণের ব্যবহার লক্ষণীয়। তারাশঙ্কর বর্তমান উপন্যাসে হিজল বিলের বিষবেদে কৌম-গোষ্ঠীর মুখে দিয়েছেন লোক-প্রকরণ ও লোকবিশ্বাস-নির্ভর ছড়া, প্রবাদ, প্রবচন ও গান। তাদের ব্যবহৃত ভাষা আমাদের সাহায্য করে বেদেদের লোকবিশ্বাস সমৃদ্ধ জীবনধারা অনুধাবনে।

পুরুষ ও নারীর ভাষায় তেমন পার্থক্য সূচিত না হলেও বৃত্তিগত কারণেই নারী যখন সাধারণ মানুষের সঙ্গে বাক্য বিনিময় করে, তখন তাতে একটু প্রলম্বিত সুর ধরা পড়ে। যেমন– 'দ্যাখেন গ মা বাড়ির গিন্নী, রাজার রানী, স্বামী সোহাগী, সোনা-কপালী চাঁদের মা। কালনাগিনীর দোলন নাচন হীরেমনের খেল।' [২৫] আবার বিষবেদেদের মুখে যে ভাষা প্রয়োগ করেছেন ঔপন্যাসিক, তা বৃহত্তর সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র এই নৃ-গোষ্ঠীকে পাঠকের একান্তে এনে দাঁড় করিয়ে দেয়। তাদের ব্যবহৃত ভাষাই পাঠককে সাহায্য করে লোকবিশ্বাস নির্ভর স্বতন্ত্র এ গোষ্ঠীর জীবন ধারাকে বুঝতে। হিজল বিলের বেদে গোষ্ঠীর

Dhaka University Institutional Repository

ভাষায় প্রকাশ ঘটেছে তাদের সৃজনশীলতার। তাদের কথায় ধরা পড়েছে ওই গোষ্ঠীর জীবন ধারার সাঙ্গীতিক আবহ। কথায় কথায় তারা মিথনির্ভর বিশ্বাস প্রকাশ করেছে স্বকীয় ভঙ্গিতে। দৃষ্টান্ত লক্ষণীয় :

লাচো লাচো আমার কাল নাগিনী কন্যে গ!

অ- গ!

দুস্কু আমার সোনা হইল তু মানিকের জন্যে গ!

অ- গ! [২৬]

এই জনগোষ্ঠীর জীবন ও জীবিকায় গান ও ছড়ার রয়েছে ব্যাপক ব্যবহার। তারাশঙ্কর-সৃষ্ট সকল অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষের মধ্যে বিষবেদেরা লোক-বিশ্বাসজাত ছড়া, গান ও প্রবাদ রচনায় স্বতন্ত্র :

শিয়াল ডাকিলি পরে, বেদেরা না লিবে ঘরে,
অভাগিনীর যাবে জাতিকুল।[২৭]

ছড়ার আঙ্গিকে স্বসমাজে সৃষ্ট রূপকথাকেও তারা প্রকাশ করে– 'মোর ঢাকলি স্বর্গে, তোর ঢাকবে মর্তে্য' [২৮] কিংবা 'যমরাজার দখিণ-দুয়ার হিজলেরই বিল'। [২৯] বিষবেদেরা লোকবিশ্বাস-নির্ভর প্রচুর প্রবাদ-প্রবচন ব্যবহারে অভ্যস্ত। এসব তাদের সৃজনশীলতা ও স্বাতন্ত্র্যের স্মারক। যেমন : 'শিরে হৈলে সর্পাঘাত তাগা বাঁধিবি কোথা?',[৩০] 'নরে নাগে বাস হয় না', [৩১] 'খেলে ডোমনা, ডাক বামনা', [৩২] 'সাপের হাঁচি বেদেয় চিনে'। [৩৩] তাদের কথিত এইসব প্রবচনে প্রতিফলন ঘটেছে লোকায়ত দর্শনেরও, যেমন : 'রাজার পাপে রাজ্য নাশ, কত্তার পাপে গেরস্তের দুগ্‌গতি, বাপের পাপে ছাওয়াল করে দণ্ড ভোগ', [৩৪] 'একজনার অমৃতি অন্যজনের বিষ।' [৩৫]

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এ উপন্যাসে হিজল বিলের দৃশ্যময় ও শব্দময় চিত্র মান্য চলিত ভাষায় উত্তমপুরুষের জবানিতে উপস্থাপন করেছেন এভাবে– 'বন্যায় কাদা হয়। ঘাস পচে, ভ্যাপসা গন্ধ হয়, মশায় মাছিতে ভনভন করে চারিদিক, ঘাসবনের মধ্যে বাঘ গর্জায়, হিজল বিলের অসংখ্য নালায় কুমীর ঘুরে বেড়ায়, হাঙর আসে, কামঠ আসে, তারই মধ্যে ওরা বাস ক'রে চলেছে। এখান ছেড়ে বিষবেদেরা স্বর্গেও যেতে চায় না। বাপ রে বাপ, এখানকার বাস কি ছাড়া যায়! মা-বিষহরির সনদ দেওয়া জমি– এ জমির খাজনা নাই।' [৩৬] ঔপন্যাসিকের শিল্পিত ভাষার পাশাপাশি নিম্নবর্গের অচ্ছ্যুত এই তৃণমূল মানুষের মুখের ভাষায় অবহেলিত খড়-কুটোর রূপ-রস-গন্ধ নিয়ে তারাশঙ্কর সৃজন করেছেন এক অপূর্ব ভাষিক জগৎ, এক অতিলৌকিক সৌন্দর্যলোক। আঞ্চলিক শব্দের যথাযথ প্রয়োগ, উপমা, ক্রিয়ারূপ,বাক্‌ভঙ্গি, লোকোক্তি, ছড়া ও প্রবাদ-প্রবচনের অসামান্য ব্যবহার *নাগিনী কন্যার কাহিনী* উপন্যাসের ঐশ্বর্য।

নাগিনী কন্যার কাহিনী উপন্যাসের কুশীলবরা তাদের সংলাপে যে আঞ্চলিক গদ্যের ব্যবহার করেছে তাতে ফুটে উঠেছে ভিন্ন এক জগৎ। সেই জগতের নিগূঢ় পূঞ্জীভূত ক্ষোভ ও বেদনা সংকেতিত হয়েছে নাগিনী কন্যা শবলার লোকায়ত ভাষায়: 'বাবা গো, লাগিনী যখন শিশু থাকে, তখন কিলবিল কর‍্যা ঘুরে বেড়ায় ; ঘাসের বনে বাতাস বইলে পর, তা শুনেও হিস কর‍্যা ফণা তুলে দাঁড়ায়। বয়স বাড়ে বাবা, পিথিমীর সব বুঝতে পারে, সাবধান হয়। মানুষ দেখলি, জন্তু দেখলি সি তখন ফোঁস কর‍্যা মাথা তুলে না বাবা, চুপিসারে পলায়ে যেতে চায়। নেহাত দায়ে পড়লি পর তবে ফণা তুলে বাবা। তখন আক্কেল হয় যি, মানুষ সামান্যি লয়।' [৩৭]

Dhaka University Institutional Repository

ছয়

নাগিনী কন্যার কাহিনী উপন্যাসে ঔপন্যাসিক হিজল বিলের বিষবেদে সম্প্রদায়ের পৌরাণিক বিশ্বাস-নির্ভর জীবন-ধারা অঙ্কনে প্রয়াসী। আঞ্চলিক উপন্যাস শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে সামূহিক জীবনের বাস্তবিক কথকতায়। এখানেও ব্যক্তি কিংবা একক কোন পরিবারের নয়, গোটা সম্প্রদায়ের চিত্র রূপায়ণই ছিল অভীষ্ট। রাঢ়ের বিভিন্ন অনার্য কৌমগোষ্ঠীর মধ্যে বেদে সম্প্রদায়ের প্রতি তারাশঙ্করের আগ্রহ ছিল সর্বাধিক। তারাশঙ্কর-অঙ্কিত অন্যান্য কৌমগোষ্ঠীর মতো বিষবেদেদের জীবনও লোককথা ও পৌরাণিক বিশ্বাস আর সংস্কারের বলয়ে আবর্তিত।

বিচিত্র এই অনার্য গোষ্ঠীর পারিবারিক জীবনও খুবই বিচিত্র। বেদের মেয়ের বিয়ের কাল শুরু হয় অন্নপ্রাশনের পর থেকেই। ছয় মাস থেকে তিন বছর বয়সের মধ্যেই বেদে-কন্যার বিয়ে সম্পন্ন হয়ে যায়। বেদেদের সমাজে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত; বিবাহ-বিচ্ছেদও সিদ্ধ। তবে যারা পাঁচ বছর বয়সে সর্প দংশনে বিধবা হয়, ষোল বছর বয়সের পূর্বে তাদের বিয়ে হয় না। ধীরে ধীরে তাদের মধ্যেই নাগিনী কন্যার লক্ষণ ফুটে ওঠে। বেদে পরিবারে পুরুষের অবস্থান কিছুটা সংহত। নারী-পুরুষ উভয়ে সমান পরিশ্রমী। পারিবারিক অনুশাসনের চেয়ে গোষ্ঠীর অনুশাসন এখানে প্রধান্য পায়। গোষ্ঠীপ্রধান শিরবেদেদের সিদ্ধান্তই সমাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে চূড়ান্ত। নারীর অবস্থান নগণ্য হলেও নাগিনী কন্যার আধ্যাত্মিক ক্ষমতার জন্য সমাজে তার অবস্থান স্বতন্ত্র। এই কৌমগোষ্ঠীর পারিবারিক জীবনে কঠোর অনুশাসন, বাধা-নিষেধ ও শাস্তি থাকা সত্ত্বেও নারী-পুরুষ লিপ্ত হয় নানা পাপাচার ও ব্যভিচারে। পারস্পরিক বিশ্বাস এখানে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। জীবন-ধর্মের শাশ্বত প্রয়োজন স্বাভাবিক ধারায় বাধা প্রাপ্ত হয় বলেই গোষ্ঠীর ব্যক্তি মানুষ কখনো পা বাড়ায় কদর্য পথে। পাপাচারের শাসন হিসাবে শাস্তির ব্যবস্থা থাকলেও ভ্রান্তি বা স্খলন বেদে সমাজে স্বাভাবিক ঘটনা । তাদের প্রতিটি ঘরের কোনো কথাই সমাজে গোপন থাকে না। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, বেদে সম্প্রদায়ের যৌনজীবন কিছুটা শিথিল। অসীম শক্তির অধিকারী এই অদিম নর-নারীর প্রাণ-প্রাচুর্য প্রকাশ পায় তাদের উদ্দাম যৌন- জীবনে। বেদেদের বউ ঝি'রা পর-পুরুষের সঙ্গে অন্যত্র রাত্রি যাপন করলে তাকে প্রহার করা হয়। কিন্তু তাকে পরিত্যাগ কিংবা সমাজচ্যুত করা হয় না। জরিমানা পরিশোধ করলেই ওইসব নারীর সকল পাপ স্খালন হয়ে যায়। আর কোন বেদে- নারী সৎ গৃহস্থের আশ্রয়ে ছিল এইরূপ সাক্ষী পেলে তাও মাফ করা হয়। কিন্তু নাাগিনী কন্যার ক্ষেত্রে এ নিয়ম প্রযোজ্য নয়। নাগিনী কন্যাকে আজীবন থাকতে হয় পূত-পবিত্র। সূর্যাস্তের পর কোনো বেদেনারীর ঘরের বাইরে অবস্থান করার বিধান নেই। এই নিয়ম অমান্য করলে অপরাধীকে শাস্তি ভোগ করতে হয়। নারী-পুরুষের গোপন অভিসার এখানে স্বাভাবিক ব্যাপার। তাই কেউ কারো প্রতি আস্থাশীল নয়। বেদের মেয়েরা যাযাবর জীবনে প্রতি রাতে পাহারা দেয় যাতে কেউ এক নৌকা থেকে অন্ধকারের মধ্যে অন্য নৌকায় যেতে না পারে। বন্য আদিম এই নর-নারীর ক্লেদাক্ত জীবনে চলে অবাধ, উদ্দাম জীবন-লীলা। কখনো-কখনো নারী হয় পারিবারিক ভোগের নির্মম শিকার। পাপাচারের ফলে বেদে নারী সন্তানসম্ভবা হলে সে-নারী হয় আত্মঘাতিনী অথবা সন্তানঘাতিনী। বিষবেদে সমাজের সকল পাপ মোচন হয় নাগিনী কন্যার পুণ্য ও তপস্যায়। বিষবেদে সম্প্রদায়ের দৃঢ়মূল প্রত্যাশা – নাগিনী কন্যা থাকবে কামহীন-প্রেমহীন।

Dhaka University Institutional Repository

নাগিনী কন্যা ও শিরবেদের মধ্যে বিরাজমান চিরকালীন দ্বন্দ্বকে বিষবেদে সমাজ উপকথার শিব-মনসার দ্বন্দ্বের অমোঘ ফল হিসাবেই মেনে নেয়। এরই ধারাবাহিকতায় বর্তমান উপন্যাসে আমরা প্রথম শিরবেদে মহাদেবের সঙ্গে নাগিনী কন্যা শবলার ও দ্বিতীয় শিরবেদে গঙ্গারামের সঙ্গে নাগিনী কন্যা পিঙলার সংঘাত লক্ষ করি। এ সংঘাত ভাল ও মন্দের সংঘাত। আবার মানব সভ্যতায় সম্পত্তি ও ক্ষমতার ধারণা সৃষ্টির পর থেকে যে কারণে মানুষে-মানুষে সংঘাত অনিবার্য হয়ে উঠেছিল শিরবেদে ও নাগিনী কন্যার মধ্যেও তার প্রতিফলন ঘটেছে। বিষবেদেরা এই বিরোধকে দেবতার নির্ধারিত নিয়তি বলেই মনে করে। কারণ শিব নিজে ধর্মভ্রষ্ট হয়ে আপন কন্যা মনসার প্রতি কামাসক্ত হয়েছিলেন। সেই ধারাবাহিকতাই মহাদেব-শবলা, গঙ্গারাম-পিঙলার মধ্যেও প্রবাহিত। শিরবেদে বেদে-সমাজের রক্ষক ও শাসক। অন্যদিকে নাগিনী কন্যা দেবীর আশীর্বাদপুষ্ট শক্তি দিয়ে বেদে-সমাজের কল্যাণে ও পাপ মোচনে নিয়োজিত। দেবী প্রদত্ত শুভ শক্তির চর্চা করাই তার কাজ। আর তাই এ শক্তির অধিকারী হয়েই নাগিনী কন্যার কাহিনীতে উল্লেখিত কন্যাদ্বয় শিরবেদের অন্যায়, পাপাচার অনাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। নাগিনী কন্যাদের প্রতি সমাজের লোকদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা বনাম সর্দারদের প্রবল শাসন ক্ষমতার সংঘাতে নাগিনী কন্যাদ্বয় বার বার বিপর্যস্ত হয়েছে। বিষবেদেরা নিশ্চিন্তে অনাচার, মিথ্যাচার ও উচ্ছৃঙ্খলতা চালিয়ে যায়। কারণ তারা জানে কন্যার পুণ্যে তারা মুক্তি লাভ করবে। তাই কন্যার প্রতি তাদের সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধা যথেষ্ট। কিন্তু এ বরাভয় ততদিন থাকবে যতদিন কন্যার মধ্যে কোন কামভাব জাগবে না। কন্যা কামাসক্ত হলে তার আধ্যাত্মিক ক্ষমতা লুপ্ত হয়। তাই তারা এ বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রাখে। উপন্যাসে উভয় শিরবেদের মধ্যেই কৌমসমাজের তুলনায় আধুনিক সামন্ততান্ত্রিক মানসতা লক্ষণীয়।

ঔপন্যাসিক সমকালীন দেশকালের বৈশিষ্ট্য দ্বারা প্রভাবিত হয়েই সম্ভবত কৌমসমাজের জীবনায়নে সামন্ততন্ত্রের প্রভাবকে এনেছেন। সমাজে অনিবার্য ভাঙনের সূত্রও এতে সংকেতিত করার উদ্দেশ্য সম্ভবত লালন করেছিলেন ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর। শিরবেদেরা নেতৃত্বের সুবাদে গোত্রের লোকদের শোষণ করে। ঋণ দিয়ে অর্থের জালে আবদ্ধ করে তাদের পদানত করে রাখে তারা। মিথ্যা, ভাড়ামো, প্রবঞ্চনা তাদের নিত্য সঙ্গী। পক্ষান্তরে নাগিনী কন্যা ন্যায় ও সততার প্রতীক। তাই নাগিনী কন্যারা স্বভাবগতভাবে অনাচারের প্রতিবাদ করলে সংঘাত তীব্রতর হয়। তখন শিরবেদেরা সুচতুর কৌশলের আশ্রয় নেয় ধর্মের ছদ্মাবরণে। এ সত্য উপন্যাসে মহাদেব-গঙ্গারাম উভয়ের মধ্যেই প্রত্যক্ষ করা যায়। কূটকৌশলী শিরবেদে মহাদেব সর্পদংশনে মারতে চেয়েছিল শবলাকে। কারণ সাধারণ বেদেদের বিষ বিক্রির ন্যায্য প্রাপ্য শবলা আদায় করতে চেয়েছিল। শবলার ভালবাসার যুবককেও সর্পদংশনে হত্যা করেছিল মহাদেব। কারণ মহাদেব নিজেই আসক্ত ছিল শবলার প্রতি। এ-কথা সর্বজ্ঞ ঔপন্যাসিক জানিয়েছেন এভাবে : 'মহাদেব শিরবেদের মধ্যেও সেই উদ্দাম ভ্রষ্ট জীবনের নিরুদ্ধ কামনা শবলা আবিষ্কার করেছিল। সে বলে– শিরবেদেদের উপরে শিবই চাপিয়ে গিয়েছেন তাঁর সেই ভ্রষ্ট জীবনের কামনার অতৃপ্তি। সব– সব– সকল শিরবেদের মধ্যেই তা প্রকাশ পায়। বেদেরা তা ধরতে পারে না, দেখতে পায় না ; দু-একজন পেলেও, তারা চোখ ফিরিয়ে থাকে। মহাদেবের দৃষ্টিও নাকি পড়েছিল শবলার উপর। চোখে দেখা যেত না, শবলা তা অন্তরে অন্তরে অনুভব করেছিল।' [৩৮] এটিকে দৈব নির্ধারিত নিয়তি বলে মেনে নিতেও শবলার কষ্ট হয়নি। প্রথম দিকে নাগিনী কন্যার ধারণাটি শবলার মধ্যে বদ্ধমূল ছিল। কিন্তু মহাদেবের নিষ্ঠুর নৃশংশতার শিকার হয়ে তার প্রেমিকের অপঘাত মৃত্যু তাকে

Dhaka University Institutional Repository

কিছুটা বিদ্রোহী করে তোলে। তাই সে পিঙলাকে বলে– 'নাগিনী কন্যা মিছা কথা, কন্যে আবার নাগিনী হয়! কই, বোঝলম না তো কিছু!' [৩৯] পাঁচ বছর বয়স হওয়ার আগেই বৈধব্যপ্রাপ্ত শবলার মধ্যে ষোল বছর বয়সে আদিম নারীর কামনা জেগেছিল। নিজ সমাজের চারদিকে উদ্দাম যৌনাচারের প্রভাবে স্বাভাবিক ভাবেই তার চৈতন্যে ও জীবনে জেগে উঠেছিল ভোগ-বাসনা। আর তাই সে পাতানো-ভাই শিবরামের নিকট ভ্রূণনিরোধক ভেষজ চেয়েছিল। স্বেচ্ছাচারের কামনা বেদে সমাজে অহরহ আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু শবলার অতৃপ্ত মন মহাদেবের প্রতি তাকে ক্ষুব্ধ করেছিল বলেই অন্ধকার রাতে অসহ্য জীবন ও জৈবিক যন্ত্রণায় মহাদেবকে ধর্মভ্রষ্ট ও হত্যা করে অবরুদ্ধ কামনার মুক্তি দিয়ে নদীবক্ষে আত্মবিসর্জনের আকাঙ্ক্ষায় জীবনমুক্তির আস্বাদ পেতে চেয়েছিল। কিন্তু আত্মবিসর্জনের প্রয়াস ব্যর্থ হয়ে যাওয়ায় বস্তুতপক্ষে শবলার মুক্তি ঘটেনি।

পিঙলা ও গঙ্গারামের বিরোধ আরো স্পষ্ট, করুণতর। গঙ্গারাম মহাদেবের চেয়ে অনেক বেশি হিংস্র ও কুটিল। নাগিনী কন্যা বিষয়ক ধারণায় অগাধ বিশ্বাস ছিল পিঙলার। কৌমের প্রতি সততায় সে ছিল স্বনিষ্ঠ। জমিদার বাড়িতে সাপ ধরতে গিয়ে বেদেদের দেহতল্লাশীর অপমান থেকে বেদে সম্প্রদায়কে রক্ষা করতে নিজেই উলঙ্গ হয়ে, অদ্ভুত আদিম প্রক্রিয়ায় বেদে-কুলের সম্ভ্রম রক্ষা করে সে। সাপ ধরার দক্ষতার কারণে গোষ্ঠীর লোকের কাছে পিঙলার সম্মান ও গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়। তার সাহস ও সাপ ধরার কৌশল দেখে রাঢ় দেশের ওঝাকুলের পুরোহিত নাগু ঠাকুর পর্যন্ত প্রশংসায় পঞ্চমুখ। নাগু ঠাকুর বিয়ে করতে চায় পিঙলাকে। তাই কন্যার ঋণ শোধের ছাড়পত্র আনতে যায় দেবতার কাছ থেকে। এসব ঘটনা গঙ্গারামকে প্রতিহিংসা পরায়ণ করে তোলে। শুরু থেকেই পিঙলার প্রতি গঙ্গারামের ছিল লোভাতুর দৃষ্টি। গঙ্গারাম ছিল মাতাল, শঠ, কুটিল ও পাপাচারী। নেশা করে সে বেদে পাড়ায় অনাচার করে বেড়াত। ডাকিনী বিদ্যা জানা থাকায় সবাই তাকে ভয় করে। একমাত্র পিঙলাই ছিল গঙ্গারামের এসব আচরণের প্রতিবাদকারিণী। পালিয়ে গিয়ে পিঙলাকে ঘর বাঁধার প্রস্তাব করে গঙ্গারাম। কোন ক্রমেই পিঙলাকে আয়ত্ত বা বশীভূত করতে না পেরে গঙ্গারাম পিঙলার ঘরে চাঁপা ফুলের এসেন্স ছড়িয়ে এই প্রত্নবিশ্বাস জন্মানোর চেষ্টা করেছিল যে, পিঙলার মধ্যে যৌনবাসনা জেগেছে, তার গায়ে চাঁপার গন্ধ উঠেছে। অতএব তার নাগিনী কন্যার মহিমা লুপ্ত হয়েছে, সে ভ্রষ্টা, পাপী। অন্যদিকে নাগু ঠাকুরকে পিঙলার ভাল লেগেছিল কিন্তু নাগিনী-ধর্ম বিসর্জন দিয়ে সে তাকে পেতে চায় না। এ-রকম সংকটে তার মধ্যে মানসিক বিকার দেখা দেয়, আক্রান্ত হয় সে মূর্ছা রোগে। চাঁপা ফুলের গন্ধ নিজের শরীর থেকে উত্থিত না হলেও পিঙলার অন্তরে প্রজ্বলিত হয়েছিল জৈবকামনার বহ্নি। পিঙলার কথায় তারই অকপট স্বীকারোক্তি : 'নারীমানুষের লাজের কথা। রাতে আমার ঘুম হয় না। বেদে- পাড়ায় ঘুম নেম্যা আসে– আর আমার অঙ্গ থেক্যা চাঁপাফুলের বাস বাহির হয়। সি বাসে মুই নিজে পাগল হয়্যা যাই গ। মনে হয়, দরজা খুল্যা ছুট্যা বাহির হয়্যা যাই চরের ঘাসবনে, নয়তো ঝাঁপিয়ে পড়ি হিজলের জলে। আর পরান দিয়ে ডাকি– কালো কানাইয়ে।' [৪০] পিঙলার মধ্যে বাসনা জাগলেও সে দেবীর আজ্ঞা ছাড়া নাগু ঠাকুরের সঙ্গে যেতে রাজি হয় না। গঙ্গারামের কুটিলতার কাছে পরাজয় মেনে সে সকলের সামনে স্বীকার করে যে তার গা থেকে চাঁপা ফুলের গন্ধ উঠছে। ফলে সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত তার মহিমা লুপ্ত হয়ে যায়। ফলত সে মুক্তি প্রার্থনা করে বিষহরির কাছে। কারণ তার বিশ্বাস বিষবেদে সম্প্রদায়ের জন্য অর্পিত দায়িত্ব সে পালন করেছে। দেবী এবার তাকে নিশ্চয়ই মুক্তি দেবেন। এক পর্যায়ে উন্মাদিনী পিঙলা নাগু

Dhaka University Institutional Repository

ঠাকুরের আনা সাপের মুখে আত্মসমর্পণ করে স্বেচ্ছায় দংশিত হয়ে এক অভিনব পদ্ধতিতে জীবন বিসর্জন দেয়। বেদে সম্প্রদায়ের বিচিত্র সংস্কার ও দ্বন্দ্বের নির্মম শিকার নাগিনী কন্যা শবলা ও পিঙলা, জীবন ধর্মের বাসনা ও স্বসম্প্রদায়ের প্রতি দায়িত্বশীলতার সংকটে জর্জরিত হয়েছে এই দুই বঞ্চিত নারী। তারাশঙ্কর একে অভিহিত করেছেন সংস্কার-নির্ভর নিয়তি বলে। নারীর অচরিতার্থ জীবনাকাঙ্ক্ষাই প্রকাশ পেয়েছে বেদেদের পারিবারিক-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনধারায়। সৈয়দ আজিজুল হক-ও এ-প্রসঙ্গে বলেছেন– 'চব্বিশ/পঁচিশ বছর বয়সের দুই নারী, কুসংস্কারমূলক বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে জীবনোপভোগ থেকে যাদের বঞ্চিত থাকতে বাধ্য করা হয়েছে, জীবনোপভোগের বাসনায় তারা উদ্দীপ্ত হবে– এটাই স্বাভাবিক।' [৪১] উপন্যাসটিতে জীবনের দ্বন্দ্ব-সংঘাত, পাপাচার, অনাচার, বঞ্চনা ও শঠতার মধ্যেও একটি কৌমের বাঁচার এবং টিকে থাকার যে সংগ্রাম চিত্রিত হয়েছে তা বাংলা সাহিত্যে দুলর্ভ। বিজিতকুমার দত্ত *নাগিনী কন্যার কাহিনী*-কে তাই তারাশঙ্করের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা বলে অভিহিত করেছেন। [৪২]

সাত

বাংলা সাহিত্যে তারাশঙ্করই প্রথম অবহেলিত, বঞ্চিত, নিষ্পেষিত, হতদরিদ্র এবং ভদ্রসমাজ বর্হিভূত কৌমজীবনের সার্থক রূপায়ণ ঘটিয়েছেন। বহুকালের বঞ্চনা, অশিক্ষা, কুসংস্কার ও প্রবল দারিদ্র্যের মাঝে যারা বাঁচার সংগ্রামে রত, সেই বঞ্চিত সম্প্রদায়কে তারাশঙ্কর গভীর অভিনিবেশে প্রত্যক্ষ করেছেন। তাদের জীবনধারার নিখুঁত চিত্র এঁকেছেন সার্থতার সাথে। হিজল বিলের বিষবেদে সম্প্রদায়ের দারিদ্র্য-ক্লিষ্ট সংস্কারাচ্ছন্ন বিচিত্র জীবনের চিত্র ও চিত্রকল্প তৈরিতেও তার ব্যত্যয় ঘটেনি। *নাগিনী কন্যার কাহিনী* উপন্যাসে তারাশঙ্কর এই গোষ্ঠীর জীবনধারা, ঘর-বাড়ি, পোষাক-পরিচ্ছদ, খাদ্য ইত্যাদির বর্ণনা উপস্থাপন করেছেন যথার্থ সমাজবিজ্ঞানী ও নৃবিজ্ঞানীর দৃষ্টিকোণ থেকে। বিষবেদেরা অমার্জিত, অবজ্ঞাত ও নিম্ন শ্রেনির হলেও তারা স্বাভাবিক নিয়মেই আত্মজীবন-ধারাকে আকড়ে থেকেছে শত প্রতিকূলতার মধ্যেও। নানা ধরনের সামাজিক, প্রাকৃতিক বিপর্যয়েও তারা নিজস্ব জীবনধারা ও ঐতিহ্যকে বিসর্জন দেয়নি। তাই অন্যান্য আদি কৌমগোষ্ঠীর ন্যায় বিষবেদেদেরও আছে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত বিচিত্র আঞ্চলিক জীবনবৈশিষ্ট্য।

হিজল বিলের বিষবেদেরা অন্যান্য আদিম নরগোষ্ঠীর চেয়ে ভিন্ন প্রকৃতির। তারা নানা রকম তন্ত্রে-মন্ত্রে বিশ্বাসী। অঙ্গে জড়িয়ে রাখে তারা বিভিন্ন রকম বিষঘ্নি লতা-পাতা। তেল মাখে-না বলে তাদের গায়ে তীব্র কটুগন্ধ থাকে। মালবেদে, মাঝিবেদে ও মেটেল বেদেদের থেকেও বিষবেদেদের জীবনধারা ভিন্ন। বিষবেদেরা মনে করে তারাই মা মনসার আসল উপাসক, ভক্ত। অন্য বেদেরা বিষবেদেদের সেই ভয়াল রাতে ত্যাগ করেছিল বলে তাদের কেউ মাঝি হয়ে সারাজীবন নদীতে এবং কেউ মাটিতে বসবাস করে। বেদে সম্প্রদায়ের বিভাজনের সূত্রপাতও এখানেই। ওই সময় থেকেই বিষবেদেরা আসল বা প্রকৃত যাযাবর শ্রেণির বেদেজীবন প্রাপ্ত হয়। তারা হিজল বিলের ধারে একটা নির্দিষ্ট সময়ে এসে ঘর বাঁধে। তারা বিশ্বাস করে এখানে রয়েছে মনসার আসন। বর্ষাকালে তারা নৌকায় করে ঘুরে বেড়ায়। তখন নৌকাই তাদের ঘর-বাড়ি। শীতের শেষে যখন সাপেদের ঘুম ভাঙে তখন তারা হিজল বিলের পাশে ঘর-বাড়ি তৈরি করে। গ্রামের মাঝখানে মনসার আসনটিকে ঘিরে চারপাশে তৈরি করে বিচিত্র বসতি। এই দেবস্থানের চারদিকে দেবদারু গাছের ডাল কেটে তৈরি করে খুঁটি। খুঁটির ওপর

Dhaka University Institutional Repository

মাচা তৈরি করে তার ওপর বাঁধে ঘর। মাচার চার পাশে ঝাউডালের বেড়া তৈরি করে তার ওপর মাটির পাতলা প্রলেপ দিয়ে নির্মাণ করা হয় দেয়াল। ঘরের চালা নির্মাণের জন্য তারা হিজল বিলের ঘাস ও বনের ঘাস কেটে শুকিয়ে ব্যবহার করে। কিন্তু প্রতি বছরই ঘরের চালা উড়ে যায় তাদের, বন্যায় ভেসে যায় ঘরের ভিত। শক্ত মাচাগুলো কোন রকমে টিকে থাকে। বন্যার পানি সরে গেলে নৌকা থেকে, ভেলা থেকে নেমে আসে বেদেরা। তখন নতুন করে তৈরি করে তারা ঘর। কাদার প্রলেপ দেয় তারা বেড়ায় ; পরিষ্কার করে মেঝে। তখন বেদেপাড়ার জীবন-প্রবাহে চাঞ্চল্য দেখা দেয় পুনরায়। ছোট ছেলে-মেয়েরা কাদা ঘেঁটে কাঁকড়া ধরে, মাছ ধরে। বড়োরা গাছের শুকনো ডাল ভেঙে আনে। ফাঁদ পেতে, গুল্‌তি ছুঁড়ে মেরে আনে হাঁসসহ নানা রকম পাখি। ঘরে ঘরে রান্নার ধোঁয়া ওঠে তখন। পুরোদমে শুরু হয় ঘরকন্না। বন্যার জলে ভেসে আসা সাপ ধরার ধুম পড়ে তখন। নাগপঞ্চমীর শেষে সারি সারি নৌকা সাজিয়ে বেদেরা বেরিয়ে পড়ে নদীপথে। নৌকাগুলিই তখন তাদের ঘর-বাড়ি, তাদের সংসারের যাবতীয় সামগ্রী তখন নৌকায়ই থাকে। সাপের ঝাঁপি, রান্নার হাঁড়ি, বাঁদর, ছাগল, মানুষ– সবার তখন একত্র নৌকায় বসবাস। নাগিনী কন্যা ও শিরবেদেসহ সবার আলাদা নৌকা থাকে। গঙ্গার বুকে ভাসতে ভাসতে বিষবেদেরা কখনো সুবিধাজনক স্থানে নৌকা ভিড়িয়ে অস্থায়ীভাবে বসবাস করে।

অরণ্য-প্রকৃতির আদিম সন্তানদের দৈহিক-অবয়ব ও পোষাক-পরিচ্ছদ থেকেই বোঝা যায় ওরা ভূতকালের মানুষ। বিষধর সাপ নিয়ে বেদেদের খেলা। সাপের বিষগালা, গভীর অরণ্যে সাপ ধরা এবং ওষধি লতা-পাতা ও শিকড় সংগ্রহ করেই তাদের জীবন কাটে। তাই আরণ্যক বৈশিষ্ট্য অনেকটা ওদের সহজাত। পুরুষরা দেখতে কালো পাথর কেটে গড়া বন্য বর্বর মূর্তির মতো। তাদের গায়ের রঙ মসৃণ কালো, কোকড়া চুল, কোমরে একফালি গামছা জড়ানো, রুক্ষ ধূলি-ধূসরিত চেহারা ; গলায় হাতে অসংখ্য মালা-তাগা-তাবিজ-জড়ি-বুটি কালো সূতায় জড়ানো। শেষের দিকে অনেক বেদে অবশ্য গিরিমাটিতে ছুপিয়ে গেরুয়া রঙের কাপড় পরায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। এটি তাদের আধুনিকতাকে স্পর্শ করার প্রথম সংকেত। মেয়েরাও ক্রমশ তাঁতে বোনা ছাপানো খাটো ও মোটা শাড়িতে আগ্রহী হয়ে ওঠে।

বন্য আদিম মানুষের খাদ্যতালিকা বিচিত্র রকমের হয়। বেদেকৌমের মানুষেরা পোড়া মাংস খায়। বিষবেদেরা কাঁকড়া, মাছ ও শিকার-করা পশুপাখির মাংস পছন্দ করে। হিজল বিলে মাংস সহজলভ্য। বাটুল মেরে বা তীর ছুড়ে এবং ফাঁদ পেতে তারা পশু-পাখি শিকার করে। সরালি হাঁস, জলমুরগি, কাঁদাখোঁচা, হাঁড়িচাঁচা, শামকল ইত্যাদি পাখির মাংস হিজল বিলের বেদেদের সহজলভ্য আহার। বন থেকে ধরে আনা খরগোশ, সজারু, শিয়াল ইত্যাদি প্রাণীও তাদের আহার্য তালিকাভুক্ত। ফাল্গুন- চৈত্র মাসে শীতের শেষে সাপের যখন ঘুম ভাঙে, তখন বেদেরা বিষহরির পুজো দেয়। পুজোয় তারা শিকার করা প্রাণির মাংস, পেঁয়াজ-রসুন-লঙ্কা দিয়ে পরিপাটি করে রান্না করে। বেদেরা মদ ও সাপের বিষ দ্বারা নেশা করে। ফসলের মৌসুমে তারা গৃহস্থের জমি থেকে কুড়িয়ে অথবা চুরি করে শস্য সংগ্রহ করে। শহরে এসে কখনো-কখনো নগদ পয়সা হাতে পেয়ে অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়ে তারা মৃত্যুমুখী রোগেও আক্রান্ত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

আট

সাঁতালী গাঁয়ের বিষবেদেদের আর্থনীতিক জীবনও উপকথা-নিয়ন্ত্রিত। তাদের সর্প-কেন্দ্রিক আর্থনীতিক জীবন দৈব-নির্ধারিত বলেই তাদের বিশ্বাস। তাদের আর্থনীতিক জীবন প্রধানত সর্প-নির্ভর। দারিদ্র্য তাদের নিত্য সঙ্গী। কিন্তু অমিত প্রাণ-শক্তির কারণেই তাদের অস্তিত্ব যুগ যুগ ধরে টিকে রয়েছে। বন্য এবং আদিম জীবন যাপনের ফলে তারা খাদ্যাভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি কখনো। ছল- চাতুরী, লোক-ঠকানো, প্রতারণা তাদের পেশারই একটা অপরিহার্য অংশ।

কৃষির সাথে বিষবেদেরা সম্পৃক্ত ছিল না বলে ভূমির সাথে তাদের সম্পর্ক কখনো নিবিড় হয়ে ওঠেনি। সাপ ধরা, সাপের বিষ সংগ্রহ করে বিক্রি করা, সাপের খেলা দেখিয়ে পয়সা আদায় করা বিষবেদে গোষ্ঠীর প্রধান পেশা। এছাড়া সর্পকেন্দ্রিক চাতুর্যপূর্ণ নানা কাজের সঙ্গেও তারা সংযুক্ত। বিভিন্ন স্থানে ঘুরে তারা সাপ সংগ্রহ করে এবং বাঁধা কবিরাজের কাছে সেই সাপের বিষ বিক্রি করে। মেয়েরা গ্রামে গৃহস্থের ঘরে ঘরে সাপের নাচ, ছাগল-বাঁদরের খেলা দেখিয়ে ভেল্কিবাজি করে পয়সা উপার্জন করে। বেদে-মেয়েরা কৌতুক-রসিকতা ও যাদু মন্ত্রের দ্বারা গৃহস্থের মনোরঞ্জন করে বক্‌শিস পায়। গ্রামের বউ-ঝিরা হাতের সমস্ত কাজ ফেলে বেদে-মেয়ের নাচ-গান ও খেলা দেখে এবং তাদের পয়সা দেয়। কিন্তু ওই পয়সার সবটাই বেদে পুরুষের অধিকারের চলে যায়। বেদেদের পেশার সঙ্গে সততার সম্পৃক্ততা নেই। লোক ঠকিয়ে নানা রকম লতা, জড়িবুটি, তাবিজ ও সর্প দংশনের ঔষধ বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করে তারা। ভদ্র পল্লির মেয়েদের কাছে বেদে-মেয়েরা শুধু বাক্যের মোহ বিস্তার করে। কিন্তু পুরুষদের কাছে বাক্‌চাতুর্যের সঙ্গে চপল দৃষ্টি ও হিল্লোলিত দেহ মেলে ধরে মোহ বিস্তারেও তারা পারঙ্গম। নেচে গেয়ে জমিদার গৃহস্থদেরকে তুষ্ট করে অধিক অর্থ উপার্জনে তাদের জুড়ি নেই। গ্রামের মহিলাদের কাছে তারা স্বামী-বশীকরণ তাবিজ বিক্রি করে। জাদুবিদ্যার দ্বারাও বেদেরা উপার্জন করে। বেদেদের রয়েছে নিজস্ব চিকিৎসা-ব্যবস্থা। সাঁতালীর গাছ-গাছড়া, লতা-পাতা দিয়ে চলে ওই চিকিৎসা। সাপে কাটা রোগীর চিকিৎসা করা বেদেদের জন্য বাধ্যতামূলক। দেবীর আদেশে এ কাজ সম্পন্ন করে বলে এর জন্য পারিশ্রমিক তারা নেয় না। তবে খুশি হয়ে কিছু দিলে তা তারা ফিরিয়েও দেয় না। সাপের ভয় দেখিয়ে সাপে কাটা থেকে রক্ষা পাওয়ার তাবিজ বিক্রি করে তারা। মোটকথা, তাদের পেশার সাথে বিচিত্র সব ছল-চাতুরি ও লোক-ঠকানো ব্যাপার জড়িত। নাগপঞ্চমীর পূর্ব পর্যন্ত তারা বনে- জঙ্গলে সাপ ও সাপের বিষ সংগ্রহ করে ; শিকার করা প্রাণীর তেল, হাঁড় জমা করে। নাগপঞ্চমীর পরে নৌকা সাজিয়ে তারা বেরিয়ে পড়ে গ্রাম-গঞ্জে ও শহরের উদ্দেশ্যে। শুশুকের তেল, বাঘের চর্বি-পাঁজর, নখ, কুমিরের দাঁত, শজারুর কাঁটা এবং সাপের বিষ বিক্রির জন্য তারা পশরা সাজায়। এসব বিক্রি করে তারা শহর থেকে ঔষধের মসলা, চুড়ি, ফিতা, তাবিজের খোল, পুঁতির মালা, সূঁই-সূতা, ছুরি, বড়শি ইত্যাদি জীবনযাপনের প্রয়োজনীয় উপকরণ নিয়ে আসে। বেদের মেয়েরা এসব গ্রামে গ্রামে গিয়ে বিক্রি করে। ওদের পেশার মধ্যে সাপ আর সাপের বিষটুকুই বোধ হয় সত্য আর বাকি সবই ছলচাতুরি। তথাপি তারা পরম বিশ্বাস ও ভক্তিসহকারে গর্বিতভাবেই নিয়োজিত থাকে এ পেশায়। নদীর কূলে নৌকা বেঁধে সাপ-বাঁদর-ছাগল নিয়ে ডুগডুগি বাজিয়ে গ্রামের দুয়ারে দুয়ারে হাজির হয়। গ্রামের সবাই ছুটে আসে, বলে– বেদেনী এসেছে। তখন সুরেলা কণ্ঠে বেদের মেয়েরা বলে– 'হ্যাঁ গ মা-লক্ষ্মী, বেদেনী আল্‌ছে।... মা,

Dhaka University Institutional Repository

পোড়ারমুখী আল্‌ছে, তুমাদের দুয়ারের কাঙালিনী আল্‌ছে, সব্বনাশী-মায়াবিনী আল্‌ছে, খেল্‌ দেখাতে, ভিখ মাঙতে, দুয়ারে এস্যা হাত পেতে দাঁড়াল্‌ছে।' [৪৩]

কখনো কখনো বেদেরা নানা রকম অন্যায় কাজও করে। অভাবের সময় গৃহস্থের ফসল চুরির মত কাজেও তারা জড়িয়ে পড়ে। বেদে কন্যারা তরুণ গৃহস্বামীর সাথে কটাক্ষপূর্ণ রসিকতা করে ও নাচ দেখিয়ে মোটা অংকের টাকা আদায় করে থাকে। যেমন বিচিত্র জাতি এ বিষবেদে গোষ্ঠী, তেমন বিচিত্র তাদের পেশাগত জীবন।

নয়

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় রাঢ়ের অন্ত্যজ শ্রেণির জীবনকে প্রত্যক্ষ করেছেন অত্যন্ত নিবিড়ভাবে। তাই রাঢ়ের বিভিন্ন ব্রাত্যশ্রেণির জীবন-ধারা সম্পর্কে বাস্তব চিত্র উপস্থাপন করেছেন তিনি। 'বৈষ্ণব' ও 'বিষবেদে' সম্প্রদায় ছাড়া আর সব কৌম গোষ্ঠীই কম বেশি ভূমি সংলগ্ন। এর মধ্যে বৈষ্ণবদের ইতিহাস ভিন্ন। বৈষ্ণবেরা বাউল ও সংসার বিবাগী হয়ে ঘুরে বেড়ায়। এরা শ্রীচৈতন্যদেব-প্রচারিত বৈষ্ণব নয়। এই বৈষ্ণবদের মতোই সংস্কার ও বৃত্তিগত কারণে বিষবেদেরাও জাত-যাযাবর। বিষবেদেরা সর্পজীবী, সাপের বিষ বিক্রি করা, সাপের খেলা দেখানো, সাপ ধরা ইত্যাদি কাজের জন্য তাদের বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণে যেতে হয়। *নাগিনী কন্যার কাহিনী* উপন্যাসে আমরা লক্ষ করি সাপের বিষ বিক্রির জন্য তারা শহরের বাঁধা করিরাজের কাছে যাতায়ত করে। এছাড়া একটি স্থানে বহু দিন তাদের পেশা চলে না, লোকজনের আগ্রহ কমে আসে। ফলে তারা স্থান পরিবর্তনে বাধ্য হয়। নানা রকম লোকালয়ে মিশে বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জন করে বেদেরা। কৃষির সাথে অসম্পৃক্ততা ও নির্দিষ্ট আবাসভূমিতে বসবাস না করার কারণেও তাদের গ্রাম থেকে শহরের সর্বত্র ঘুরে বেড়াতে হয়।

বিষবেদেদের সহজাত প্রবণতা হচ্ছে ভবঘুরে মানসতা। জাতিগত স্বভাবেই তারা যাযাবর। বছরের একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তারা সাঁতালী পল্লিতে এসে থাকলেও, নৌকা করে বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়ায় বেশির ভাগ সময়। জীবিকার ধরনই তাদের যাযাবর হতে বাধ্য করেছে। তাদের ধর্মীয় সংস্কার ও বিশ্বাস– যাযাবর জীবনই তাদের জন্য নির্ধারিত। চাঁদ সওদাগরের অভিশাপে তাদের পূর্ব-পুরুষরা স্বভূমি থেকে উৎখাত হওয়ার পর থেকেই যাযাবর জীবনের নিয়তি তাদের ওপর ভর করেছে। বিষবেদেদের বিশ্বাস এটি তাদের আদিপুরুষ-কৃত পাপের এক বিরামহীন প্রায়শ্চিত্ত। ভাদ্রের শেষে নাগপঞ্চমীতে বিষবেদেরা নৌপথে বেরিয়ে পড়ে দেশ থেকে দেশান্তরে,– 'বিষবেদেরা চলে নৌকায়– জলে জলে, গঙ্গা থেকে ঢোকে অন্য নদীতে, চ'লে আসে কলকাতা শহর পর্যন্ত, সেখানে সাহেবান লোকের নতুন শহর গ'ড়ে উঠেছে, বড় বড় আমীর বাস করে, অনেক কবিরাজও আছেন। সেখানেও বিষ বিক্রি করে, তারপর শীত বেশ গাঢ় হয়ে পড়তেই ফেরে।' [৪৪] উপন্যাসে তারাশঙ্করের এই বর্ণনা থেকেই আমরা এই সম্প্রদায়ের যাযাবর জীবন-ধারা সম্পর্কে ধারণা পাই। এই ভবঘুরে মানসতার জন্যই বেদেরা কখনো কৃষির সাথে সম্পৃক্ত হতে পারেনি। আমরা লক্ষ করেছি আদিবাসী এই জনগোষ্ঠী যখনই সভ্য জগতের সন্নিকটবর্তী হয়েছে, তখনই তাদের জীবনধারায় পরিবর্তনের সূচনা হয়েছে। আর বিষবেদেরা যাযাবর হওয়ার জন্যই সভ্য জগতের ভিন্নমাত্রিক মানুষের সংস্পর্শে আসে সব সময়। ফলে তারা বিভিন্ন জীবন ধারা, বিষয় ও পেশার মোহে আকৃষ্ট হয় স্বভাবতই। ফলত এই সর্পজীবী জনগোষ্ঠী অন্যান্য পার্শ্বজীবিকার

Dhaka University Institutional Repository

সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়ে অনিবার্যত। এভাবেই তাদের জীবনে অনুপ্রবেশ করেছে নানা মাত্রিক জটিলতা। আলোচ্য উপন্যাসে গঙ্গারামই এর যোগ্য উদাহরণ। শহরে-বন্দরে ঘুরে ঘুরে সে জটিল ও ভয়ানক মানুষে পরিণত হয়। নানা স্থান থেকে নানা রকম বিদ্যা আয়ত্ত করার সঙ্গে সঙ্গে সে আয়ত্ত করে আধুনিক মানুষের জটিলতাও। এবং এরই প্রভাবে বেদেদের কৌম জীবনে ক্রমান্বয়ে সূচিত হয় পরিবর্তনের ধারা।

বিষবৈদ্য নামে বহুল পরিচিত বিষবেদেদের বিষ-চিকিৎসার জন্য প্রয়োজন নানাবিধ ভেষজ উপকরণ। সর্প সংক্রান্ত ও আন্যান্য রোগের কবিরাজি চিকিৎসায়ও বিষবৈদ্যরা অভ্যস্ত। পেশাগত প্রয়োজনেই এদেরকে শহর বা লোকালয় থেকে ভেষজ উপকরণ সংগ্রহ করতে হয়। আবার গভীর অরণ্য থেকে তারা সংগ্রহ করতে হয় বিষঘ্নি ও ওষধি লতা-পাতা। এসব কারণে সভ্য জগৎ ও অরণ্যে তাদের চলাচল করতে হয়। নগর জীবনের সংস্পর্শে আসার কারণে স্বভাবতই তাদের জীবন-মানে এর প্রভাব পড়ে। আবার বনভূমি উজার হওয়ার কারণেও তাদের ভেষজ উপাদানের স্বল্পতা দেখা দেয়। অন্যদিকে বিজ্ঞানের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামীণ ও নাগরিক মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটে চলেছে নিয়ত। ভেষজ চিকিৎসায় ক্রমশ মানুষের আগ্রহ কমে আসছে। ফলে এই কৌমগোষ্ঠীর স্বকীয়তায় পড়েছে টান।

সভ্য জগতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হওয়ার অভিজ্ঞতা বেদেদের কাছে সব সময় সুখকর হয় না। শহরে বা লোকালয়ে এসে জড়িয়ে পড়ে তারা নানা সমস্যায়। এই বিচিত্র জনগোষ্ঠী সম্পর্কে মানুষের আগ্রহ থাকলেও তাদের প্রতি মানুষ সব সময় সহানুভূতি প্রদর্শন করে না। ধূর্জটি কবিরাজের কাছ থেকে পাওয়া সমাদর তাদের জন্য অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা। বৃত্তিগত বা অন্য যে কোন কারণেই আরণ্যক এই যাযাবর শ্রেণি প্রায়শই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ শোষণের শিকার হয়েছে। তাদের সে অভিজ্ঞতার প্রমাণ মেলে পুলিশ সম্পর্কে মহাদেবের ভীতি থেকে। এ জন্য মহাদেব পুলিশের হাঙ্গামা থেকে রক্ষা পাওয়ার আশায় শরণাপন্ন হয় ধূর্জটি কবিরাজের।[৪৫] আত্মরক্ষার জন্য জমিদারের কুকুর মেরে ফেলার পর রাতের অন্ধকারেই জমিদারের ভয়ে ওই এলাকা ত্যাগ করে বেদেরা। কারণ জমিদার জানতে পারলে তাদের ওপর যে অত্যাচার নেমে আসবে সে-সম্পর্কে তাদের ধারণা ছিল স্পষ্ট।[৪৬] নিজ সমাজেও বিষবেদেরা বঞ্চনা ও শোষণের শিকার হয়েছে। সংগৃহীত বিষ বিক্রির টাকা সমভাবে সবার মধ্যে বণ্টন করায় অনীহা ছিল শিরবেদের। গঙ্গারাম গোষ্ঠীর দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে অর্থ ঋণ দিয়ে স্বজাতির মধ্যে শোষণ ও শাসন প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখেছে। বেদেরা একদিকে নিজ সম্প্রদায়ের অভ্যন্তরে, অন্যদিকে সভ্য সমাজ কর্তৃক শোষণের শিকার হয়েছে।

আমরা লক্ষ করেছি যে, বিচ্ছিন্ন আদিবাসী জনগোষ্ঠী যখনই সভ্য জগৎ-সংলগ্ন হয়েছে, তখনই তাদের জীবন ধারায় পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। ফলে তাদের বিশেষ বৃত্তি-নির্ভর জীবনে আর্থনীতিক শৈথিল্য দেখা দেয়। এছাড়া বেদেরা ধর্মের ব্যাপারে আশ্চর্য রকম সহজিয়া স্বভাবী। তাদের গোষ্ঠীগত ধর্মীয় বন্ধনও তাই শিথিল হয়েছে সহজে। এ-কারণেই শেষ পর্যন্ত শবলা ইসলামি বেদের সঙ্গে ঘর বেঁধেছে। তবে এ-ব্যাপারে সে নির্দ্বন্দ্ব ছিল তা বলা যাবে না।

বেদেদের আর্থনীতিক ও সামাজিক জীবনের কর্মধারা পরিচালিত হয় হিজলবিল-কেন্দ্রিক বিশ্বাসকে অবলম্বন করে। হিজল বিলের প্রস্ফুটিত পদ্ম তাদের শুভ-অশুভের নির্দেশক। এমনকী নারী-পুরুষের প্রেম ও যৌনজীবনও হিজলবিল-কেন্দ্রিক সর্প-সংস্কৃতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। মোট কথা তাদের সমগ্র জীবনদর্শনের মর্মমূলে রয়েছে এই নৈসর্গিক পরিবেশ ও সংস্কৃতি। তাই এই আশ্রয় থেকে যাযাবর স্বভাবী বেদেরা যখন বিচ্যুত হয় তখন তাদের সামূহিক বিপর্যয় অনিবার্য হয়ে পড়ে। বহির্জগতের প্রভাব গঙ্গারামের মাধ্যমে

Dhaka University Institutional Repository

বেদে জীবনে কীভাবে পড়েছে তার বিস্তৃত বিবরণ তারাশঙ্কর বর্তমান উপন্যাসে দিয়েছেন। সর্বজ্ঞ ঔপন্যাসিক লিখেছেন যে, 'বেদেদের চিকিৎসা-বিদ্যা আছে, সে বিদ্যা জানে ভাদু নটবর নবীন। সাঁতালীর আশপাশের গাছ-গাছড়া নিয়ে সে চিকিৎসা। জন্তু-জানোয়ারের তেল-হাড় নিয়ে সে চিকিৎসা। নাগিনী কন্যার কাছে আছে জড়ি আর বিষহরির প্রসাদী নির্মাল্য, তাই দিয়ে কবচ মাদুলি নিয়ে সে চিকিৎসা। গঙ্গারামের চিকিৎসা অন্য রকম। ওষুধের মসলা সংগ্রহ ক'রে আনে সে শহর-বাজারের দোকান থেকে। ধন্বন্তরি ভাইদের কবিরাজী ওষুধের মত পাঁচন বড়ি দেয়। বিশেষ ক'রে জ্বর-জ্বালায় গঙ্গারামের ওষুধ খুব খাটে। সেই মসলা আনতে সে মধ্যে-মাঝে শহরে যায়। নিয়ে যায় শুশুঁকের তেল, বাঘের চর্বি, বাঘের পাঁজর নখ, কুমীরের দাঁত, শজারুর কাঁটা আর নিয়ে যায় মা-মনসার অব্যর্থ ঘায়ের প্রলেপ মলম। নিয়ে আসে ওষুধের মসলা আর সঙ্গে চুড়ি, ফিতে, মাদুলীর খোল, পুঁতির মালা, সূচ-সুতো, বড়শি, ছুরি, কাটারি, কাঁকুই– হরেক রকম জিনিস। গঙ্গারাম শিরবেদে সাঁতালী গাঁয়ে নতুন নিয়ম প্রবর্তন করেছে– শিরবেদে হয়ে বেনেতী বৃত্তি নিয়েছে।' [৪৭]

দশ

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যিক মনন গড়ে উঠেছিল বিশেষ কালচেতনা ও রাঢ়ের চারপাশের সামগ্রিক প্রতিবেশকে কেন্দ্র করে। ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত সমাজের পাশাপাশি তিনি গভীরভাবে প্রত্যক্ষ করেছেন অন্ত্যজ কৌম গোষ্ঠীকে। রাঢ়ে এদের আধিক্য ছিল বলেই শৈশব থেকে তাদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসেছিলেন তিনি। রাঢ় অঞ্চলে কাহার, বেদে, সাঁওতাল, ডোম, বাউরি ইত্যাদি অনার্য কৌম মানুষের আদি নিবাস। তথাকথিত সভ্য সমাজধারা থেকে পৃথক এসব কৌম গোষ্ঠীর একটি হল সাঁতালীর বিষবেদে সম্প্রদায়। এদের বিচিত্র সংস্কারাচ্ছন্ন জীবন কাহিনী নিয়ে রচিত উপন্যাস *নাগিনী কন্যার কাহিনী*। বেদেজীবন সম্পর্কে তারাশঙ্করের বাস্তব অভিজ্ঞতার যথেষ্ট প্রমাণ মিলে তাঁর আত্মজীবনীমূলক রচনা *আমার কালের কথা*-য়(১৩৫৮)। [৪৮]

এসব বাস্তব অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করেই তাঁর কল্পনার বিস্তার ঘটেছে *নাগিনী কন্যার কাহিনী* উপন্যাসে। তিনি নিজেই বলেছেন– 'মোট কথা, 'নাগিনী কন্যা' আমার বারো আনার বেশি কল্পনা। হয়ত দু'আনা তথ্যের সত্য এর মধ্যে আছে।' [৪৯] এই দুই আনা সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত কল্পনাকে তিনি অধিকতর বাস্ত ব করে তুলেছেন। সাহিত্য ক্ষেত্রে সত্যিকারের আত্মপ্রকাশের কাল থেকেই তারাশঙ্কর তাঁর পরিচিত এসব অন্ত্যজ মানুষের প্রবৃত্তি-তাড়িত জীবন-রহস্যের সন্ধান করেছেন। অস্তিত্ব রক্ষা, যৌনকামনা, স্বার্থ-দ্বন্দ্ব, বিশ্বাস, সংস্কার প্রভৃতি মানবীয় বৃত্তি ও আকাঙ্ক্ষা তাদের স্বভাবকে বিশেষ বৈশিষ্ট্যে সংগঠিত করেছিল। তারাশঙ্কর ওইসব মানবীয় আকাঙ্ক্ষার বিচিত্র গতি-প্রকৃতি লক্ষ করে মানবজীবনের অপার রহস্য উদ্ঘাটনে প্রয়াসী ছিলেন। মানুষের সহজাত প্রবণতা হচ্ছে অস্তিত্ব রক্ষার সাধনা। অনার্য সমাজে অস্তিত্ব রক্ষার পরপরই প্রাধান্য পেয়েছে অপ্রতিরোধ্য যৌনকামনা। তারাশঙ্করের গল্প-উপন্যাসে মানুষের প্রবৃত্তি-লীলার প্রকাশ মূলত ওই দুটি সূক্ষ্ম ধারায় প্রবাহিত। একটি জীবন রক্ষার তাগিদ, অপরটি যৌন-চাহিদা। প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত আবেগী প্রকাশ আদিম সমাজে লক্ষণীয়। মানুষ যত এগিয়েছে ততই সীমাবদ্ধতাকে স্বীকার করে নিতে হয়েছে। তাই তাদের প্রাণপ্রাচুর্য স্বতঃস্ফূর্ত হলেও সামাজিক অনুশাসনহীন নয়। সামাজিক গঠন ও অস্তিত্ব রক্ষার খাতিরেই কৌমের অনুশাসন মেনে নিতে হয়েছে

Dhaka University Institutional Repository

তাদের। কঠিন সাধনায় বর্হিজগতের আঘাত থেকে তারা যথাসাধ্য দূরে রেখেছে নিজেদের। কিন্তু মানুষের স্বভাবগত স্বার্থপরতার জন্য অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের শিকার হতে হয়েছে তাদের।

নাগিনী কন্যার কাহিনী উপন্যাসে ভদ্রসমাজ-বিচ্ছিন্ন বেদে সম্প্রদায়ের জীবনধারা সম্পর্কিত ঔপন্যাসিকের একটি স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি কাজ করেছে। বিষবেদেদের জীবন সম্পর্কে উপস্থাপিত তারাশঙ্করের ধ্যান-ধারণা উপন্যাসে মূলত ধূর্জটি কবিরাজের দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপিত হয়েছে। ধূর্জটির প্রেক্ষণবিন্দু থেকে ঔপন্যাসিক লিখেছেন– 'ওরা হলো ভূত কালের মানুষ। পৃথিবীতে সৃষ্টিকাল থেকে কত মন্বন্তর হ'লো, এক-একটা আপৎকাল এল, পৃথিবীতে ধর্ম বিপন্ন হ'লো, মাৎস্যন্যায়ে ভ'রে গেল, আপদ্ধর্মে বিপ্লব হয়ে গেল, এক মনুর কাল গেল, নতুন মনু এলেন– নতুন নতুন বিধান ধর্ম বর্তিকা হাতে নিয়ে। জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, আচারে-ব্যবহারে, রীতিতে-নীতিতে, পানে-ভোজনে, বাক্যে-ভঙ্গিতে, পরিচ্ছদে-প্রসাধনে কত পরিবর্তন হয়ে গেল। কিন্তু যারা নাকি আরণ্যক, তারা প্রতিবার প্রতিটি বিপ্লবের সময়েই গভীরতর অরণ্যের মধ্যে গিয়ে তাদের আরণ্যক প্রকৃতিকে বাঁচিয়ে রাখলে। সেই কারণেই তারা সেই ভূত কালের মানুষই থেকে গিয়েছে। মনু বলেন, শাস্ত্রপুরাণ এদের জন্মগত অর্থাৎ ধাতু এবং রক্তের প্রকৃতিই স্বতন্ত্র এবং সেইটেই এর কারণ। এই ধাতু এবং রক্তে গঠিত দেহের মধ্যে যে আত্মা বাস করেন, তিনি মানবাত্মা হ'লেও ওই পতিত দূষিত আবাসে বাস করার জন্যেই তিনিও পতিত এবং বিকৃত হয়ে এই ধর্মে আত্মপ্রকাশ করেন। এই বিকৃতিই ওদের ধর্ম।...মহাভারতে পাবে ধর্ম ব্যাধ নিজের আচরণ বলে পরমতত্ত্বকে জ্ঞাত হয়েছিলেন। এক জিজ্ঞাসু ব্রাহ্মণকুমার তাঁর কাছে সেই তত্ত্ব জানতে গিয়ে তাকে দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন। সেই আরণ্যক মানুষের বর্বর জীবন, অন্ধকার ঘর, চারিদিকে মৃত পশু, মাংস-মেদ-মজ্জার গন্ধ, শুষ্ক চর্মের আসন শয্যা, কৃষ্ণবর্ণ গাঢ় মুখমণ্ডল, রক্তবর্ণ গোলাকৃতি চোখ, মুখে মদ্যগন্ধ দেখে তার মনে প্রশ্ন জেগেছিল, এ কেমন করে মুক্তি পেতে পারে? ব্যাধ বুঝেছিলেন ব্রাহ্মণকুমারের মনোভাব। তিনি তাকে সম্ভাষণ আহবান ক'রে বলেছিলেন– এই আমার স্বধর্ম।...এই আচরণের মধ্যেই আমাদের জীবনের স্ফূর্তি। এর মধ্যেই আমাদের মুক্তি।...বহু পরীক্ষায় বহু বিচার ক'রে এই সিদ্ধান্তেই পৌঁছেছি যে ধাতু বা শোণিত যদি রোগ দূষিত না হয়, তবে এক জীবন ধর্ম থেকে আর এক জীবন ধর্মে আসতে কোনো বাধা বিশেষ নাই। যে টুকু বাধা, সে নগন্য, অতি নগন্য।' [৫০] তবে যে কারণেই হোক ওরা বৃহত্তর সমাজধারার সঙ্গে একীভূত হতে চায়নি। ভদ্র সমাজের জটিল জীবনাচরণ, সংস্কার, হিংস্রতা, স্বার্থপরতার ভয়েই হয়ত তাদের এই বদ্ধমূল অনীহা। তারাশঙ্কর জানতেন এরা আধুনিক জ্ঞান পায়নি, পেয়েছে অধিক স্বাস্থ্য এবং দীর্ঘ আয়ু। অন্ত্যজ শ্রেণির এই সামাজিক মানুষ সম্পর্কে তারাশঙ্করের মনস্তাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক মতবাদ হয়ত সর্বদা নির্বিচারে গ্রহণ করা যাবে না। কিন্তু তাঁর পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণকে অবৈজ্ঞানিক বলাও যাবে না। বিভিন্ন যুগে নতুনতর সমাজ প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। তারাশঙ্কর এ সত্য জেনেও *নাগিনী কন্যার কাহিনী*-তে নতুন সমাজলক্ষণকে স্পষ্টতা দেননি। *হাঁসুলী বাঁশের উপকথা*-য় কৌমের বিশ্বাসের বিরুদ্ধে করালীর বিপ্লবাত্মক আচরণ কাহার পল্লিতে আলোড়ন তৈরি করেছিল। রীতি ভঙ্গ করে নতুন জীবিকা নিয়ে স্বাধীন জীবনযাপনের আহ্বান– আসন্ন যুগান্তরের অমোঘ সংকেত। লেখক এই সংকেতের অতিরিক্ত কোন বৈপ্লবিক রূপান্তরের বিবরণ স্থাপন করেননি সেখানে। *নাগিনী কন্যার কাহিনী*-তে ওই পরিচয় আরো সংবৃত। শবলা-পিঙলা প্রবল

Dhaka University Institutional Repository

আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী হলেও গোটা সমাজের সাথে তাদের সম্পর্ক নিবিড় নয়, বরঞ্চ শিথিল। মহাদেব-শবলা ও গঙ্গারাম-পিঙলার দ্বন্দ্ব প্রকট আকার ধারণ করতে পারত যদি ওই দ্বন্দ্ব গোটা সমাজে আলোড়ন তুলতে পারত। শবলার 'নাগিনী কন্যা' বিষয়ক ধারণা ও বিশ্বাসহীনতাকে লেখক সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারতেন। কন্যাদ্বয়ের মানবীয় আকাঙ্ক্ষার চরিতার্থ-রূপ অঙ্কনের সুযোগ ছিল ঔপন্যাসিকের। কিন্তু তারাশঙ্কর কৌমের বিপর্যয়কে সমকালীন দেশকালের সঙ্গে সংযুক্ত করতে সক্ষম হননি এ-উপন্যাসে। নতুন স্বাধীনতা প্রাপ্ত ভারতের দেশকালগত প্রেক্ষাপট হয়ত তাঁকে ওই সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রভাবিত করেছে।

নাগিনী কন্যার কাহিনী ভাগীরথী-তীরবর্তী হিজল বিল, অরণ্য-প্রকৃতি, জল-স্থল-আকাশ, কৃষি-মৎস্য-সর্পজীবিতার আধার। তারাশঙ্কর এ উপন্যাসে শুধু অন্ত্যজ আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সংস্কার ও জীনব-ধারার চিত্রই এঁকেছেন। সমাজ বিচ্ছিন্ন এ জনগোষ্ঠীকে বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে পারেননি। কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নিজেরও অনেক পরিবর্তন হয়েছিল। তাই একালের উপন্যাসে বার বার ফিরে আসে পাপ-পুণ্যের প্রসঙ্গ, ধর্ম-অধর্ম, ব্যাধি ও প্রতিকার, বিজ্ঞান ও সংস্কারের দ্বন্দ্ব এবং উপকথা আশ্রিত সংস্কারাচ্ছন্ন জীবন। সামাজিক সমস্যার প্রতিটির মর্মমূলেই তিনি আঘাত করেছেন সত্য। কিন্তু কোনটিরই মুক্তির পথ-নির্দেশ নেই। এক্ষেত্রে তিনি অনেকটা শরৎচন্দ্রেরই অনুগামী।

ভারত-বিভাগোত্তরকালে তারাশঙ্করের সাহিত্যে নির্লিপ্ত-নিরাসক্ত জীবনদর্শন কাজ করেছিল। সমকালীন দেশকালের প্রভাবেই এরকমটি ঘটেছে। *নাগিনী কন্যার কাহিনী*-তে তিনি বিষবেদেদের সংস্কারপূর্ণ জীবন, তাদের সংগ্রাম, নাগিনী কন্যাদ্বয়ের জীবনতৃষ্ণা, দ্বন্দ্ব-সংঘাতের চিত্র এঁকেছেন পরম মমতায়। *হাঁসুলী বাঁকের উপকথা*-য় করালী সংস্কার ভেঙে বাবার বাহন সাপকে মেরে ফেলার সাহস দেখিয়েছিল। কিন্তু *নাগিনী কন্যায়* সংস্কার ভাঙার সুযোগ তৈরি করেও লেখক তা থেকে সরে গেলেন। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে *নাগিনী কন্যার কাহিনী*-র রচনাকাল ছিল ভারতের স্বাধীনতা-উত্তর কাল। ইতিহাসের দ্বান্দ্বিক পরিবর্তনে তখন নতুন ধরনের এলিট ও 'কমনারের' উদ্ভব ঘটেছে। অপরিহার্য রূপে প্রাকৃতজনের আত্ম-প্রতিষ্ঠার আগ্রহও প্রবলতর হয়েছে তখন। *নাগিনী কন্যার কাহিনী*-তে ওই আকাঙ্ক্ষার চিত্র আছে কিন্তু তা তৎকালীন বাস্তবতার সঙ্গে শেষ পর্যন্ত সামঞ্জস্য রক্ষায় সমর্থ হয়নি।

সাহিত্য সর্বদাই জীবনের প্রগতিকে ধারণ করে এবং রুদ্ধ জীবন-প্রবাহকে মুক্তি দেয়। চর্যাপদের শবর ডোমদের টেনে আনা হয়েছিল উচ্চবর্ণের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে। পরবর্তীতে পৌরাণিক দেবতাদের বিরুদ্ধে দাঁড় করানো হল মনসা, চণ্ডীকে। এ উচ্চ বর্ণের আধিপত্যের বিরুদ্ধে অনার্যের সর্বাত্মক প্রতিবাদ। তারাশঙ্কর মনসার লোকপুরাণ নিয়ে উপন্যাস রচনা করলেও বৃহত্তর সমাজের কাছে অবহেলা, অবজ্ঞা ও উপেক্ষার পাত্র এই বিষবেদে কৌমগোষ্ঠীকে বৃহৎ সমাজবাস্তবতা থেকে সরিয়ে রেখেছেন। তাদের আসন্ন বিচ্ছিন্নতার সংকেত দিয়েছেন, কিন্তু তাদের পরিণতি কিংবা ভবিষ্যতের ছবিটিকে মূর্ত করে তুলতে সক্ষম হননি।

তথ্যনির্দেশ

[১] বেদে জীবনের উল্লেখকৃত তথ্যের জন্য দ্র. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ; *নাগিনী কন্যার কাহিনী, তারাশঙ্কর রচনাবলী*, অষ্টম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, প্রথম প্রকাশ : ২২শে শ্রাবণ, ১৩৮১, কলিকাতা, পৃ. ৮২-৯১

[২] পূর্বোক্ত, পৃ. ৯১-৯২

Dhaka University Institutional Repository

[৩] পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৮

[৪] পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৬-৯৭

[৫] পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৮-২৯

[৬] পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৬

[৭] পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৩

[৮] পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৪

[৯] পৌরাণিক অভিধানে মনসা সম্পর্কে বলা আছে- 'মনসা সর্পগণের দেবী। ইনি জরৎকারু মুনির স্ত্রী, আস্তিকের মাতা এবং বাসুকির ভগিনী। ব্রহ্মার উপদেশে কশ্যপ সর্পমন্ত্রের সৃষ্টি করে তপোবনে মন দ্বারা এঁকে মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে উৎপাদন করেন; সেই জন্য ইনি মনসা এবং এঁকে কশ্যপের মানসী কন্যা বলা হয়। পুরাকালে মানুষরা সর্প ভয়ে ভীত থাকত; কারণ, নাগরা যাকে দংশন করতো, তৎক্ষণাৎ তার মৃত্যু হোত। তখন ব্রহ্মার উপদেশে কশ্যপ মন্ত্র সৃষ্টি করে এই সকল মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রীরূপে মনসাকে সৃষ্টি করলেন। কুমারী অবস্থায় মনসা মহাদেবের কাছে যান এবং তাঁর কাছ থেকে স্তব, পূজা, মন্ত্র ইত্যাদি সবই শিক্ষা করে সিদ্ধা হন। পরে দেবতা, মনু, মুনি, নাগ, মানুষ সকলেই মনসা দেবীর পূজা করতে থাকেন।'

সুধীরচন্দ্র সরকার সংকলিত; *পৌরাণিক অভিধান*, এম.সি. সরকার এন্ড সন্স প্রাঃ লিঃ ১৪, বঙ্কিমচন্দ্র চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, ৭ম মুদ্রণ, আশ্বিন ১৪০৬, পৃ. ৪০৮

[১০] *নাগিনী কন্যার কাহিনী* ; পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৭

[১১] পূর্বোক্ত, পৃ. ১১১

[১২] পূর্বোক্ত, পৃ. ৭২

[১৩] পূর্বোক্ত, পৃ. ১২১

[১৪] পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩২

[১৫] পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৪

[১৬] পূর্বোক্ত, পৃ. ৮২

[১৭] 'মনসা-সংক্রান্ত কাহিনী পদাকারে সুরযোগে গীত হয় এবং এই প্রকার গানকে বলা হয় 'ভাসান গান'।' 'লোক সংস্কৃতি গবেষণা'; ত্রৈমাসিক পত্রিকা, ১০ বর্ষ, ৩ সংখ্যা, কার্তিক-পৌষ ১৪০৪,সম্পাদক : সনৎকুমার মিত্র, সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি : ক্ষেত্রগুপ্ত, পৃ. ৩৩৫

[১৮] *নাগিনী কন্যার কাহিনী*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৯

[১৯] পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৮

[২০] পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৩

[২১] পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৩-৮৪

[২২] পূর্বোক্ত, পৃ. ৯০

[২৩] দ্র. ভীষ্মদেব চৌধুরী ; *তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস : সমাজ ও রাজনীতি*, প্র. প্র. ১৯৯৮, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ১৫৯

[২৪] 'রাঢ়ী উপভাষা বলতে বর্ধমান-মেদেনীপুর, বীরভূম-বাঁকুড়া অঞ্চলের ভাষাকে বুঝায়।' 'লোক সংস্কৃতি গবেষণা', পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪৯

[২৫] *নাগিনী কন্যার কাহিনী* ; পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৭

[২৬] পূর্বোক্ত ,পৃ. ৯৩

[২৭] পূর্বোক্ত, পৃ. ১১১

[২৮] পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৬

[২৯] পূর্বোক্ত, পৃ. ৭২

[৩০] পূর্বোক্ত, পৃ.৭৪

[৩১] পূর্বোক্ত, পৃ. ৯১

[৩২] পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫১

[৩৩] পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৮

[৩৪] পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৪

[৩৫] পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৭

[৩৬] পূর্বোক্ত, পৃ. ৮১

[৩৭] পূর্বোক্ত, পৃ. ১০১

[৩৮] পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৩

[৩৯] পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮২

[৪০] পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৩-৮৪

Dhaka University Institutional Repository

[৪১] সৈয়দ আজিজুল হক ; "নাগিনী কন্যার কাহিনী : জীবন তৃষ্ণাই মূল কথা"; *তারাশঙ্কর স্মারকগ্রন্থ*, সম্পাদক : ভীষ্মদেব চৌধুরী; নবযুগ প্রকাশনী, প্র. প্র. ২০০১, ঢাকা, পৃ. ১৩২

[৪২] বিজিতকুমার দত্ত ; "নাগিনী কন্যার কাহিনী, পুনর্বিবেচনা", *তারাশঙ্কর অন্বেষা*, সম্পাদক : সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্র. প্র. ১৯৮৭, কলকাতা, পৃ. ৪১

[৪৩] *নাগিনী কন্যার কাহিনী* ; পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৭

[৪৪] পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৯

[৪৫] পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৩–১৪

[৪৬] পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৫

[৪৭] পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৫–০৬

[৪৮] রাঢ়ে বেদেরা আসত বর্ষাকালে।তারা কালকেউটে ধরত,সাপের খেলা দেখাত। তারাশঙ্কর দেখেছেন সদ্য-ধরা সাপ নিয়ে খেলা করতে। দ্বিজপদ ও রাধিকা বেদেনীর সঙ্গে তাঁর কথা হতো। দ্র. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ; *আমার কালের কথা*, *তারাশঙ্কর রচনাবলী*, দশম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ ;জৈষ্ঠ্য ১৩৫৮, কলকাতা, পৃ. ৪৩৮–৩৯

[৪৯] তারাশাঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ; *আমার কথা*, সম্পাদক : শ্রীসরিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়,অনামিক পাবলিশার্স, কলকাতা, প্র. প্র. পৌষ ১৪০২, পৃ. ৩৭

[৫০] *নাগিনী কন্যার কাহিনী* , পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৬–৭৭

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
অরণ্য-বহ্নি উপন্যাসে সাঁওতাল জীবনের রূপায়ণ

সাঁওতাল জীবন ও ঐতিহাসিক সাঁওতাল বিদ্রোহ নিয়ে লেখা *অরণ্য-বহ্নি* (১৯৬৬) তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। আদিবাসী এক নৃ-গোষ্ঠীর গৌরবময় ইতিহাস অবলম্বনে রচিত *অরণ্য-বহ্নি* বাংলা সাহিত্যের এক মূল্যবান সৃষ্টি। সাঁওতালদের নিয়ে ১৯৪০ সালে তারাশঙ্কর রচনা করেন *কালিন্দী* উপন্যাস। *কালিন্দীতে* সামন্ত-জমিদার ও শিল্প মালিকদের সংঘর্ষে সাঁওতালরা কীভাবে উন্মূলিত হয়েছে তাই দেখিয়েছেন ঔপন্যাসিক। আর *অরণ্য-বহ্নি*-তে তিনি অরণ্যচারী স্বাধীনচেতা সাঁওতালদের সরল জীবনধারা ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী, দেশী মহাজন, জোতদার, পশ্চিমা ব্যবসায়ী ও মহেশ দারোগার মতো মানুষ কীভাবে বিধ্বস্ত ও বিপন্ন করে তুলেছিল এবং অরণ্যচারী এই নিরীহ জনগোষ্ঠী কীভাবে অস্তিত্ব সংকট থেকে উত্তরণের জন্য সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিল, তারই বিশ্বস্ত চিত্র এঁকেছেন। ১৮৫৪-৫৫ সালের ঐতিহাসিক সাঁওতাল বিদ্রোহই এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় বিষয়। আদিম নিরুত্তাপ এই জনগোষ্ঠীর ওপর শত রকমের নৃশংস অত্যাচার, শোষণ ও বঞ্চনায় ক্ষুব্ধ ও অতিষ্ঠ হয়েই সাঁওতাল ভ্রাতৃযুগল সীধু ও কানুর নেতৃত্বে ১৮৫৪ সালে বিদ্রোহের দাবাগ্নি প্রজ্বলিত হয়েছিল। তারাশঙ্কর শৈশবে তাঁর পিসীমার কাছে এই বিদ্রোহের গল্প শুনেছিলেন। শ্রুত গল্পের সঙ্গে ইতিহাসের তথ্য ও কল্পনার রং মিশিয়ে রচনা করেন তিনি *অরণ্য-বহ্নি* উপন্যাস। বীরভূম ও সাঁওতাল পরগণার কাছাকাছি অবস্থানের কারণে এবং সাঁওতালদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ব্যক্তিগত নিবিড় পরিচয়ের সূত্রে তারাশঙ্কর সাঁওতালদের নিখুঁত ও বাস্তবানুগ জীবনচিত্র অঙ্কনে সক্ষম হয়েছেন। বীরভূম ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলের কাহার, বেদে, সাঁওতাল, হাড়ি, বাগদী, ডোম ইত্যাদি অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষের নিকটজন ছিলেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে দেখেছেন সাঁওতাল কৌমের জীবনযাত্রা এবং তারই প্রতিফলন ঘটেছে *অরণ্য-বহ্নি* উপন্যাসে। আর তাই রচনাকাল থেকে একশ পঁচিশ বছর পূর্বে সংঘটিত সাঁওতাল বিদ্রোহের চিত্র পাঠকের সামনে বাস্তবতার স্পর্শ বুলিয়ে দিতে সক্ষম হয়।

অরণ্য-বহ্নি উপন্যাসে বিধৃত হয়েছে যে অঞ্চলের কাহিনী তার অবস্থান ও অবস্থা সম্পর্কে তারাশঙ্কর উপন্যাসের সূচনা-পর্বেই বলেছেন —'তখন বাংলাদেশ বলতে বাংলা বিহার উড়িষ্যা তিন প্রদেশ একসঙ্গে। যে অঞ্চলের কথা বলছি, সে অঞ্চল উত্তরে ভাগলপুর থেকে গঙ্গার পশ্চিমে তিন পাহাড়, রাজমহল থেকে দক্ষিণে বীরভূম জেলার ময়ূরাক্ষীর উত্তর এবং গোটা সাঁওতাল পরগনা এবং দেওঘর নিয়ে একটি বিস্তীর্ণ এলাকা। ... রাজমহল থেকে সমস্ত দক্ষিণ এলাকা তখন জেলা মুর্শিদাবাদের এলাকা। এবং দেওঘর সাঁওতাল পরগনা নিয়ে বিস্তীর্ণ অঞ্চল বীরভূম জেলার অন্তর্গত। ইংরেজ দেওয়ানীর পর পারমানেন্ট সেটেলমেন্টের সময় থেকে এসব অঞ্চলে বন কেটে চাষের ক্ষেত তৈরি হচ্ছে। পাহাড়ের মাথায় সাঁওতালদের গ্রাম থেকে সাঁওতালরা সমতলে নেমে এসে গ্রামে বসতি তৈরি করে জমি ভাঙছে।' [১] তবে স্বতন্ত্র জেলা হিসেবে সাঁওতাল পরগণা গঠিত হয় ১৮৫৫ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহের পরে। ওই সময় সাঁওতালদের স্বতন্ত্র এলাকা হিসেবে জেলাটির সীমান্তও নির্ধারিত হয়। বিদ্রোহের পূর্বে সাঁওতালরা বাস

Dhaka University Institutional Repository

করত উত্তরে ভাগলপুর, দক্ষিণে বীরভূম, পূর্বে দেওঘর ও মধুপুর অঞ্চল এবং পশ্চিমে ভাগীরথীর সমস্ত অরণ্য অঞ্চলে।

সাঁওতাল পরগণা নবাবী আমলেও ছিল জনমানবশূন্য বনভূমি। ১৭৯৩ সনে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় সাঁওতালরা পাহাড়ের মাথা থেকে সমতলে নেমে এসে বন কেটে বসতি স্থাপন ও চাষের জমি তৈরি করতে শুরু করে। বীরভূমসহ প্রায় গোটা সাঁওতাল পরগণাই রুক্ষ কঠিন মাটিতে গঠিত। তারাশঙ্করের নিজের বর্ণনা থেকে এ অঞ্চলের ভূমিবৈশিষ্ট্য সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ করা যায় —'অঞ্চলটাই পাথর কাঁকর আর লালমাটির অঞ্চল। শক্ত কঠিন রুক্ষ মাটি। লাল ধুলোয় ভরা। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে যেতে শালবনের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। মধ্যে মধ্যে পড়ে বিস্তীর্ণ প্রান্তর। সে প্রান্তর ধূসর রুক্ষ, মধ্যে মধ্যে বড় বড় পাথরের চাঁই মাথা ঠেলে বেরিয়ে যেন থাবা গেড়ে বসে আছে। এর মধ্যে আপনার চোখে পড়বে দু-চারটে পঁচিশ থেকে তিরিশ-চল্লিশ ফুট উঁচু পাথরের ঢিবি; তাকে ঘিরে জন্মেছে শালগাছ —ক্বচিৎ কোথাও একটা বড় বটগাছও আপনার চোখে পড়বে। তারপরই আবার মাইলের পর মাইল বিস্তীর্ণ শালজঙ্গল।[২] এই কঠিন অরণ্য অঞ্চলে সাঁওতালরা তাদের বীরত্বপূর্ণ শ্রমের বিনিময়ে জঙ্গল কেটে পাথর সরিয়ে চাষের জমি তৈরি করে। এ-রকম শ্রমকঠিন কাজে সাঁওতালদের সমতুল্য ছিল না কেউ। তাই সাঁওতালদের জমির লোভ দেখিয়ে ইংরেজরা পাহাড় থেকে সমতলে নামিয়ে এনে জমি তৈরির কাজে লাগিয়ে দেয়। প্রথম দিকে তাদের খাজনা দিতে হত না। নবাবী আমলেও তারা খাজনা দিত না। এদিকে ইংরেজ আমলে হিন্দু মহাজন-জমিদাররাও এ অঞ্চলে ভূমি বন্দোবস্ত নিয়ে চাষের জমি তৈরি করে গোটা অঞ্চলের চেহারা পাল্টে দিচ্ছিল। ক্রমে স্বাধীনচেতা সরল সাঁওতালেরা স্বভূমি থেকে বিচ্যুত হয়ে বঞ্চিত জীবনের মুখোমুখি হয়। অধিক হারে কর আরোপ করা হয় তাদের ওপর। সামাজিক রাজনৈতিক ও আর্থনীতিক ভাবেও শোষণের শিকার হয় তারা। হিন্দু মহাজনরা সাঁওতালদের উৎপন্ন ফসল কম দামে কিনে অভাবের সময় বিক্রি করত চড়া দামে। ঋণভারে জর্জরিত করে দেনার দায়ে তাদের মুনিষ বা ক্রীতদাসে পরিণত করে রাখত বংশপরম্পরায়। ইংরেজ সরকারের আশীর্বাদপুষ্ট মহেশ দারোগা থেকে শুরু করে ওই অঞ্চলে সবাই ছিল মহাজন জোতদারদের সহায়। কোথাও অন্যায়ের কোনো প্রতিকার সাঁওতালেরা পেত না। জোর করে উঠিয়ে নিয়ে সাঁওতাল রমণীদের সম্ভ্রমহানি করলেও ইংরেজ কর্মচারীদের বিচার হত না। জোরপূর্বক ধর্মান্তরিত করা হত শত শত সাঁওতালকে। কালক্রমে বহুদিনের পুঞ্জীভূত যন্ত্রণা, দুঃখ-কষ্ট, ক্ষোভ বিস্ফোরণে রূপ নিল। জমি ধর্ম সম্ভ্রম সব হারিয়ে নিরীহ সাঁওতালরা ক্রোধে প্রতিশোধ গ্রহণে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়।। পুলিশ মহাজন আর ইংরেজের ত্রিমুখী অত্যাচারে অতিষ্ঠ নিরুপায় সাঁওতালরা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে গোষ্ঠীগত অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থেই। তখন মূলত, চুনার মুর্মু মাঝির দুই তরুণ ছেলে সিধু ও কানুর নেতৃত্বে হাজার হাজার সাঁওতাল বিদ্রোহ ঘোষণা করে ১৮৫৪ সালে।[৩] বিদ্রোহের প্রারম্ভে বিক্ষুব্ধ সাঁওতালরা মহিষের হালে আট আনা ও গরুর হালে চার আনা হারের বেশি খাজনা দিতে অস্বীকৃতি জানায়। হাজার হাজার বিদ্রোহী সাঁওতাল পদব্রজে কলকাতা অভিমুখে রওনা হয়। চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে বিদ্রোহের আগুন। সঙ্ঘবদ্ধ বিদ্রোহী সাঁওতালেরা প্রথমে আক্রমণ করে হিন্দু জমিদার মহাজনদের। এরপর সুপ্রশিক্ষিত ইংরেজ বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় স্বভূমির অধিকারের দাবিতে। ইংরেজদের সঙ্গে আদি যুদ্ধাস্ত্র তীর-ধনুক, টাঙ্গী নিয়ে যুদ্ধ করে তারা জয়ও লাভ করে বেশ কিছু জায়গায়। অত্যাচারী দারোগা, মহাজন আর জোতদারদের হত্যা করে বেশ কিছুদিন অরণ্যভূমি নিজেদের দখলে আনতেও সমর্থ হয় তারা। "পূর্বে মুর্শিদাবাদ জঙ্গিপুর কাঁদী থেকে রামপুরহাট নারায়ণপুর হয়ে গণপুর তিলকুড়ি বিষ্ণুপুর আন্দারপুর কাপিষ্ঠা রাজনগর আমজোড়া ঘাট

Dhaka University Institutional Repository

থেকে পশ্চিম দেওঘরের ধার পর্যন্ত ত্রিশ থেকে চল্লিশ হাজার সাঁওতাল সুদীর্ঘ দিনের শোষণের অত্যাচারে ঘৃণার জন্য পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত ক্ষোভে ইতিহাসের অমোঘ বিধানে আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাতের মত আকাশে উঠে ছড়িয়ে পড়েছিল গলিত লাভার মত।"[৪] কিন্তু শেষে সরল দৈববিশ্বাসী সাঁওতাল সম্প্রদায় ১৮৫৫ সালে সশস্ত্র যুদ্ধে পরাজিত হয় নির্মমভাবে। হাজার হাজার সরল নির্বোধ সাঁওতাল স্বভূমির স্বাধীনতা ও মুক্তির জন্য অকাতরে প্রাণ বিসর্জন দেয়। ইংরেজ বাহিনী কাপুরুষের মত ধোকা দিয়ে সমতলে নামিয়ে এনে নির্বিচারে গুলি করে হত্যা করে তাদের। কানু নিহত হয় গুলিতে এবং সিধু ধরা পড়লে তাকে ফাঁসি দেওয়া হয়। এভাবে সাঁওতাল বিদ্রোহ সমাপ্ত হয়। তবে ওই বিদ্রোহের পরপরই ব্রিটিশ সরকার সাঁওতালদের জন্য স্বতন্ত্র আবাসভূমি 'সাঁওতাল পরগণা' নামের নতুন জেলা গঠন করে। ১৮৫৫ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহের বর্ণনায় ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে লিখেছেন —'অরণ্য-রাজ্যে সুখে শান্তিতে বসবাস করার জন্য তারা জমি করেছে, গ্রাম বসিয়েছে, শান্তির দেশ গড়ে তুলেছে। সেই শান্তি আজ নষ্ট হতে চলেছে, তাদের শ্রমের অংশ লুট করে নেবার জন্য কোম্পানীর অনুগত জমিদার ও মহাজনী ব্যবসাদারের দল হাত বাড়িয়েছে— এ যে অসহ্য। তারা প্রতিবাদ জানাল, কিন্তু বৃটিশ শাসক তাদের কথায় কর্ণপাত করল না। দিনে দিনে অত্যাচার বেড়ে যেতে লাগল। আর সহ্য করতে পারে না নিরীহ অশিক্ষত সাঁওতালরা। তাদের সহ্যের সীমা যখন অতিক্রম করল তখন তারা বহুদিনের জমানো বিক্ষেভে ফেটে পড়ল বিদ্রোহের তূর্য নিনাদে ১৮৫৫ সালে।'[৫]

দুই

একটি আদিম, সরল, পরিশ্রমী ও স্বাধীনতাপ্রিয় জনজাতি আর্থনীতিক ও রাজনৈতিক মুক্তির জন্য কীভাবে দুঃসাহসিক সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, ইতিহাসের অবজ্ঞাত সভ্যতার আলোকবঞ্চিত আদিবাসী মানুষের রচনা করা সত্যিকারের ইতিহাস অবলম্বন করেই তারাশঙ্কর রচনা করেছেন *অরণ্য-বহ্নি* উপন্যাস। সাঁওতালরাই এই উপন্যাসের প্রধান কুশীলব। সাঁওতালদের ভাষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, চিন্তাচেতনা, জীবনধারা, পারিবারিক-সামাজিক প্রতিষ্ঠান — অর্থাৎ সাঁওতাল জীবনচর্যার সঙ্গে তারাশঙ্করের সম্পৃক্তি ছিল নিবিড়। তাই তিনি সাঁওতালদের মহান সংগ্রাম ও স্বাধীনতার স্পৃহা নিয়ে রচনা করেন তাঁর এই ঐতিহাসিক উপন্যাস।

সাঁওতালরা ঐক্যবদ্ধ সুশৃঙ্খল সমবায়ী এক জনগোষ্ঠী। আরণ্যক জীবনের ধর্ম অনুযায়ী তারা গোষ্ঠীবদ্ধ জীবন যাপন করতে অভ্যস্ত। কৃষ্ণকায় সাঁওতাল আদিবাসীরা দুর্দান্ত পরিশ্রমী, সাহসী, সত্যবাদী এবং সরল। অরণ্যচারী এই জনগোষ্ঠীর জীবিকার প্রধান অবলম্বন কৃষিকাজ। শিকারের ক্ষেত্রেও সাঁওতালদের রয়েছে যথেষ্ট সুনাম। পরিশ্রমের জন্য তাদের সুখ্যাতি সর্বজন বিদিত। প্রাচীনকাল থেকেই সাঁওতাল সমাজে বিভিন্ন গোত্রের অস্তিত্ব ছিল। সাঁওতালদের মধ্যে মুর্মু, টুডু, হাঁসদা, হেমব্রম, সরেন, কিস্কু ইত্যাদি মোট বারোটি সাঁওতাল গোত্র বিদ্যমান।[৬] এইসব গোত্রের একজন করে গোত্রপতি বা সর্দার থাকে। ওই সর্দারই স্ব স্ব গোত্রের কর্তাব্যক্তি। তাকে সবাই মান্য করে। গোত্রপতির উপাধি হচ্ছে মাঝি। মাঝি গোত্রের বিচার-আচার ও শাসন কার্য পরিচালনার অধিকারী। বিভিন্ন গোত্রের কয়েকজন মাঝির মধ্য থেকে একজন 'পরগনাইৎ' মনোনীত হয়। পরগণা বা বৃহত্তর অঞ্চলের 'মালিক' বলেই তাকে 'পরগনাইৎ' বলা হয়। মাঝিরা 'পরগনাইৎ'কে মেনে চলে এবং প্রয়োজনে তার পরামর্শ নেয়। সাঁওতালেরা ফৌজদারী দেওয়ানী

Dhaka University Institutional Repository

কোর্ট-কাচারি ইত্যাদি মানে না। সমাজে তাদের নিজস্ব বিচার-ব্যবস্থা বিদ্যমান। মাঝি অথবা পরগনাইৎরাই ওইসব বিচারকার্য পরিচালনা করে থাকে। মাঝিরা কোনো বিচারকার্যে অক্ষম হলে পরগনাইতের শরণাপন্ন হয়। মাঝি-পরগনাইতের সুশৃঙ্খল শাসনে পরিচালিত হয় সাঁওতালদের আদিবাসী সমাজ। মাঝি এবং পরগনাইতের মধ্যেও সুশৃঙ্খলপূর্ণ সুসম্পর্ক বজায় থাকে। একেকটি গোত্র মিলে গড়ে ওঠে একেকটি গ্রাম এবং ওই গ্রামের প্রধান মনোনীত হয় মাঝি। তারা দেবস্থান 'জহার সর্ণা'য় মজলিস বসিয়ে নিজেদের সমস্যার সমাধান করে। সাঁওতালদের সমাজে পূর্বকালে রাজাও ছিল। সকলেই তাঁকে মান্য করত। মুর্মুরা বিশ্বাস করে যে, পূর্বে রাজা তাদের গোত্রের মধ্যেই ছিল। সিধু-কানুর পিতা চুনার মুর্মু মাঝির কথায় এই বিশ্বাসের প্রমাণ পাওয়া যায় :

চুনার বলে— শুন কুষ্ঠি মুর্মুঠাকুর রাজগোষ্ঠী
মরংবোঙ্গার ছিষ্টি — অদৃষ্টের দোষে এই দশা—
প্রথমে দিকুরা তাড়ে তুরুকেরা তার পরে
বনে বনে ঘুরে ঘুরে হাতি থেকে হইলাম মশা।
তথাপি ধরমে মানি দিন খাই দিন আনি
দিকুরা করে টানাটানি দিনরাত সবকিছু ধরে—
সব দিই দিইনা ধর্ম মুর্মু বুঝে তার মর্ম—
করে নাক ছোট কর্ম সাঁওতালে এই মান্য করে।[৭]

সাঁওতালদের বিশ্বাস তাদের সুখী সমৃদ্ধ ও গৌরবময় একটা স্বাধীন আরণ্যক জীবন ছিল। গভীর অরণ্যে পাহাড়ের চূড়ায় তারা ভয়ানক জন্তু-জানোয়ারের সঙ্গে লড়াই করে টিকে ছিল। সেসব দিনের জন্য আজও সাঁওতালরা হাহাকার করে। কৃষি-প্রিয় শ্রমনিষ্ঠ সাঁওতালরা আবাদযোগ্য জমির লোভে পাহাড়-অরণ্যের সঙ্গম স্থলে 'দামিন ই কোহ'তে এসে মহাবিক্রমে কাঁকর-পাথর ও অরণ্য পরিষ্কার করে জমি তৈরি করে, ঊষর ভূমি কর্ষণে-কর্ষণে উর্বর করে তোলে। কিন্তু ইতিহাসের এক বিশেষ কালে এসব বুনো আদিম সত্যিকারের ভূমিপুত্ররা ভূমির অধিকার থেকে বঞ্চিত হতে শুরু করে।

বন্যপ্রাণী, বিরূপ প্রকৃতি এবং ক্ষুধার সঙ্গে সাঁওতালদের সংগ্রাম চিরন্তন। হতদরিদ্র এই অরণ্যসন্তানেরা জমিদার মহাজনদের বিলাস ব্যসনে সহায়ক শ্রমিক হিসেবে কাজ করলেও তাদের কাছে সাঁওতালরা অচ্ছুত। শ্রমজীবী এই দরিদ্র জনগোষ্ঠীর চাহিদাও ছিল খুবই সামান্য। ছল-চাতুরী, মিথ্যাচরিতা ধূর্ততা ছিল তাদের স্বভাববিরুদ্ধ বিষয়। তারা এমনই বিশ্বাসমুগ্ধ এক জনগোষ্ঠী, যারা বিদ্যুৎ চমকানোর মধ্যেও নিজেদের দেবতা 'বোঙ্গার' ইশারা খোঁজে। স্বীয় জীবনধারা ও সংস্কৃতির প্রতি তারা লালন করে গভীর অনুরাগ। তথাকথিত সভ্য সমাজের দৃষ্টিতে সাঁওতালরা নিম্নশ্রেণির মানুষ হিসেবেই পরিগণিত। শত বঞ্চনা, লাঞ্ছনা ও দারিদ্র্যের মধ্যেও সদাহাস্য ও আনন্দমুখর থাকতে তারা ভালবাসে। হাড়-ভাঙা পরিশ্রমের পরেও তারা বিভিন্ন পূজা-পার্বণ-উৎসবে নাচ-গান ও আনন্দ-উল্লাসে মেতে ওঠে। সভ্য সমাজ চিরকালই তাদের কাছ থেকে নিয়েছে অঢেল, দেয়নি কিছুই। সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশের স্তরে স্তরে সাঁওতালদের অবদান অনস্বীকার্য, তথাপি তারা থেকেছে বঞ্চিত ও নিগৃহীত। অশিক্ষিত, বিষয়বুদ্ধিহীন ও অন্ধবিশ্বাসনির্ভর সাঁওতালরা নিজেদের নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে নির্বিবাদে স্বাধীনভাবে বসবাস

Dhaka University Institutional Repository

করতে চেয়েছে। কিন্তু তারা ইতিহাসের এক বিশেষ লগ্নে ইংরেজ রাজশক্তি ও দেশীয় মহাজনের শোষণের শিকার হতে শুরু করে। তথাকথিত সুসভ্য ইংরেজ শাসকদের প্রতিনিধি মি. সাদারল্যান্ডের উক্তি থেকে সাঁওতাল সমাজের প্রতি ইংরেজদের দৃষ্টিভঙ্গি অনুধাবন করা যায় : 'ওইসব ব্ল্যাক নিগারদের নিয়ে মাথা ঘামিয়ো না। ওরা মরবার জন্যই জন্মেছে এবং অন্যের জন্য খেটে মরবে।' [৮] সাঁওতালরা সভ্য মানুষের খাওয়া-পড়া, বিলাস ও আরামের ব্যবস্থা করে দেয় অথচ নিজেরা থাকে চির অবহেলিত। সামান্য দশটি টাকা ঋণের জন্য গোটা জনগোষ্ঠীর অর্ধেক আজীবনের জন্য, ক্ষেত্রবিশেষে বংশানুক্রমে ক্রীতদাসে পরিণত হয়।

আদিবাসী আরণ্যক জনগোষ্ঠী চিরকালই তাদের জ্ঞান ও ক্ষমতার বাইরের প্রচণ্ড শক্তিকে মহাশক্তিমানরূপে কল্পনা করে এসেছে। অন্ধবিশ্বাস আর সংস্কারচালিত সাঁওতালরা মেঘ বিদ্যুৎ আর বজ্রপাতকে দেবতদার শক্তির প্রকাশ হিসেবে বিশ্বাস করে। এসবের মধ্যেই তারা দেবতার আদেশ-নির্দেশের এবং ধর্মীয় বিধানের বিশেষ ইঙ্গিত খুঁজে নেয়। সাঁওতালরা সূর্যকে পুরুষ 'বোঙ্গা' বা পুরুষ দেবতা বলে মান্য করে। আর বোঙ্গা হচ্ছেন তাদের শ্রেষ্ঠ দেবতা। বৃহৎ শক্তিমান অনেক কিছুতেই সাঁওতালরা বোঙ্গার প্রতিনিধি শক্তি বলে গণ্য করে।

তিন

বিভিন্ন সাঁওতাল গোত্রের মধ্যে নানা টোটেম বিদ্যমান ; হাঁসদা গোত্রের টোটেম হাঁস, মুর্মুদের টোটেম নীল গাভী ইত্যাদি। তারা বিশ্বাস করে স্ব স্ব টোটেম থেকেই তাদের উৎপত্তি। শালপাতা তাদের কাছে বিশেষ তাৎপর্যবহ। সাঁওতালরা প্রয়োজনের সময় দূরবর্তী কোনো স্থানে সাংকেতিক বার্তা প্রেরণের জন্য শালপাতা ব্যবহার করে। সাঁওতাল সমাজে প্রচলিত নিয়মকানুন, বিধি-নিষেধ ও সংস্কারগুলো কঠোরভাবে মেনে চলতে হয়। সামাজিক অনুশাসনের প্রতি সাঁওতালেরা গভীর শ্রদ্ধাশীল। প্রথা, পদ্ধতি বা বিধি-নিষেধগুলো উপেক্ষিত হলে পাপ হয় এবং তা থেকে সমাজে অশান্তি নেমে আসে বলে তাদের বিশ্বাস। নিজস্ব জীবনাধারা কিংবা সংস্কৃতির সীমারেখা অতিক্রম করা সাঁওতালদের জন্য মহাপাপ। মাটিকে তারা অন্নদাত্রী হিসেবে শ্রদ্ধা করে। এ কারণেই ধরিত্রীর বুকে লাঙলের কর্ষণ তাদের জন্য নিষিদ্ধ। চুড়া মাঝির মায়ের কথা থেকে সাঁওতালদের এসব চিন্তা, রীতি ও বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায় : 'পাহাড়ের মাথাতে ছিলাম, এইসব দিকুদের সঙ্গে মুসলাদের সঙ্গে সাত ছিল না, পড়খান জেটে এই সায়েব লোকের সঙ্গে সাত ছিল না। শিকার করতিস— জোয়ার ভুট্টা লাগাতিস— বোঙ্গার পূজো করতিস, এখন জমিনের লোভে পাহাড় থেকে নামলি, জাদ্দ মুলুকে গেরাম করলি, ধরতির বুকে ফাল চালছিস, ধান করছিস— তাথে কি হছে তুদের? আ? কি হছে?' [৯]

এক গোত্রের সাঁওতাল স্বগোত্রে বিয়ে করতে পারে না। এ ধরনের অবৈধ বিয়ে সম্পন্ন হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সমাজে হেয় হয়, নিন্দিত হয়। *অরণ্য-বহ্নি* উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র লাল মাঝির বাবা হাঁসদা হয়ে হাঁসদা মেয়ে বিয়ে করেছিল বলে তাদের বংশে এই স্থায়ী খুঁত কখনোই মুছে যায়নি।[১০] চুনার মাঝির মা সাঁওতালদের সংস্কার ও পূর্ব ঐতিহ্যের ধারক। তাই বজ্রপাতের মধ্যেও সে দেবতার রোষ প্রত্যাশা করে, ওইসব ঘটনা-দুর্ঘটনা সাঁওতালদের কৃতকর্মর ফল বলে বিশ্বাস করে। সাঁওতালদের ওপর নানাবিধ শোষণ-অত্যাচারকেও তাদের কৃতকর্মের ফল হিসেবেই ধরে নেয় তারা। চুনার মাঝির মায়ের কথা থেকে তৎকালীন সাঁওতালদের সামাজিক অবস্থার স্পষ্ট ধারণা লাভ করা যায় : 'সব লিয়ে লিছে— দিকুরা সব

Dhaka University Institutional Repository

লিয়ে লিয়ে। শুধু জমিন লিছে? জনম লিছে। লিছে না! তুরা জব্দিতে এসে দেনা করছিস— দিকুদের কাছে জনম বিকাইছে। গুলাম হছিস। তুরা রাস্তা বন্দিতে কাম করতে যাছিস! লোহার সড়ক হবে— লোহার ঘোড়ার গাড়ি ছুটবে। তুরা পাহাড় কাটছিস, পথ বানাইছিস— পুয়সার লোভে ছুটছিল দলে দলে— মেয়্যাগুলোকে লিয়ে ছুটছিস। আমি কুছু জানছি না— তু কুছু জানিস না— সিখানে ডবকা ডবকা মেয়্যাগুলাকে লিয়া ওই পুরখানা শালারা দিকু শালারা দাড়িওলা শালারা কি করছে তোরা জানিস না। পাপ হছে না! পুন্যি হছে! তুরা দু ভাই তু আর কান্হুর সঙ্গে ওই করন রায় মাঝির দুই বিটী ফুল আর টুশকির হাড় কাবাদি করলে তুদের বাপ; সেই তখন তুরা এতটুকুন— তুরা বড় হলি মরদ হলি। তুরা দুভাই সাদী করলি না— পিরীত করলি লিটিপাড়ার বিশু মাঝির দুটো ময়্যার সঙ্গে। কি হল? তাদের বাপ খাটতে গেল রাস্তা বন্দিতে— ময়্যা দুটোকে লিয়ে গেল সোঙ্গে। দেখগা কি হল তোদের? — আক্কায় হল না?[১১]

অরণ্যের বিপদসঙ্কুল পরিবেশে কেউ কখনো বিপদে পড়লে সাঁওতালরা আন্তরিকতার সঙ্গেই তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসে। বিপদগ্রস্তকে সাহায্য করার বিনিময়ে সাঁওতালরা কখনো কারো কাছ থেকে অর্থ অর্থ গ্রহণ করে না। সাঁওতাল সম্প্রদায় নীতিনিষ্ঠ আদিম জাতিগোষ্ঠী। নারীর প্রতিও তারা শ্রদ্ধাশীল। যুদ্ধের মহা উন্মাদনার সময়ও তারা পারতপক্ষে নারী হত্যা করেনি।[১২] সাঁওতাল কৌমগোষ্ঠী নিজস্ব সংস্কৃতি ও জীবনধারার প্রতি গভীরভাবে আস্থাশীল। এ কৌমসমাজের বিশ্বাস-জীবন-জীবিকা নিয়ে স্বতন্ত্র ঐতিহ্যমণ্ডিত এক সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে, যা তাদের উপকথা ও নিজস্ব পুরাণকথার মধ্যেই কেন্দ্রীভূত। সাঁওতাল কৌম নিজের উপকথা ও লোককথাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়। এ-সব উপকথা-লোককথাকে ঘিরেই তাদের অদ্ভুত বিশ্বাসের জগৎ আবর্তিত। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় সাঁওতালদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসেছিলেন বলে তাদের জীবনধারা, সংস্কৃতি, বিশ্বাস, উপকথা ও লোককথাকে গভীরভাবে জানতে ও অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। *অরণ্য-বহ্নি* উপন্যাসেও তিনি সাঁওতালদের জীবন, জীবিকা, বিশ্বাস, উপকথা, খাদ্য, পোশাক, বিনোদন, অনুষ্ঠান ইত্যাদির বাস্তব চিত্র এঁকেছেন। এটি তার বাস্তব অভিজ্ঞতারই ফল।

অরণ্য-বহ্নি উপন্যাসে তারাশঙ্কর বিভিন্ন প্রসঙ্গে সাঁওতাল কৌমের বিভিন্ন উপকথা উপস্থাপন করেছেন। সাঁওতাল সমাজে প্রচলিত লোককথায় আছে যে, সাঁওতালদের দুঃখে যখন পৃথিবী কেঁপে উঠেছিল তখন মা চণ্ডীর টনক নড়ল, তাঁর আসন টলে উঠল, মুকুট পড়ে গেল। দেবী চণ্ডী জয়া বিজয়াকে খড়ি পেতে দেখতে বললেন পৃথিবীতে কী অনাচার ঘটেছে— যার জন্য তার আসন পর্যন্ত টলে উঠল। জয়া বিজয়া খড়ি পেতে দেখে বললেন —'মা শ্বেতদ্বীপের সাদা মানুষেরা দত্যির মত দাপাদাপি করছে, পৃথিবীর বুক জুড়ে লোহার বাঁধন বাঁধছে। তাতে পাহাড় কেটে খাল কাটছে— খাল পুড়িয়ে পাহাড় তুলছে। মানুষদিগে চাবুক মারছে। কুঠি করছে— সেখানে তারা গরীবের জাত মান গতর সবকিছু বরবাদ করছে— তাই তাঁরা কাঁদছে।' দেবী চণ্ডী তখন অভয় দিলেন এবং তাদেরকে জানিয়ে দিতে বললেন— তিনি ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। নির্যাতিত গবীবদের অর্থাৎ সাঁওতালদের রক্ষা করার জন্য তিনি কালকেতু আর বিরুপাক্ষকে মর্ত্যে পাঠালেন। সঙ্গে পাঠালেন দেবীর সঙ্গিনী ডাকিনীকেও। রামচন্দ্রপুরের ধার্মিক ব্রাহ্মণ ত্রিভুবন ভট্টাচর্যের মাধ্যমে চণ্ডী এ কথা সাঁওতালদের জানিয়ে দিলেন। এই ত্রিভুবন

Dhaka University Institutional Repository

ভট্টাচার্যই বলেছিলেন— সিধু-কানুই সেই দেবী-প্রেরিত বিরুপাক্ষ-কালকেতু। ব্রাহ্মণকন্যা ভৈরবী হচ্ছে মা চণ্ডীর সঙ্গিনী ডাকিনী। সাঁওতালরা তাই সিধু-কানুকে তাদের ত্রাণকর্তা হিসেবে বিবেচনা করেছিল। সাঁওতালদের লোককথায় আছে দেবী চণ্ডীর অট্টহাসিতে সেদিন এ অঞ্চলের বনে বনে ঝড় উঠেছিল, বজ্রপাত হয়েছিল। সাঁওতালদের লোকপুরাণে আছে পৃথিবী যখন পাপে ভরে যায়, ধর্মের স্থলে অধর্ম আসে তখন দেবী কখনো নিজে আসেন, কখনো ওই কালকেতু-বিরুপাক্ষকে পাঠান।[১৩] ত্রিভুবন ভট্টাচার্য ঝড়ের রাতে ওই প্রত্যাদেশ পেয়েছিলেন। তিনি সিধু-কানুকে কালকেতু-বিরুপাক্ষ বলে চিনেওছিলেন। সিধু-কানুকে দেখে ভট্টাচার্য বলে উঠেছিল, 'তুদের লেগে বসে আছি রে আমি! সেই ঝড়ের রাত থেকে। আজ আলি, আয়, আয়। ওরে যে তোদের মরংবোঙ্গা সেই আমার ন্যাংটা বেটী! কালী মা! হাঁ রে। তেমনি তোদের চেহারা বটে! বটে! লে তোদের লেগে আমি কবচ নিয়ে বসে আছি.... চণ্ডীর বীজ লেখা সেই কবচ তাদের হাতে বেঁধে দিয়েছিলেন। যা তোরা দিগ্বিজয় করবি। আমি শুনেছি রে লিটিপাড়ায় যা হয়েছে শুনেছি। মা আমাকে স্বপ্ন দিয়েছেন। ঝড় উঠেছে, বাজ পড়েছে, তোদের নাচবার সময় হয়েছে। নাচ গা তোরা।'[১৪] অন্যদিকে সাঁওতালরা পৃথিবী সৃষ্টির এক অদ্ভুত ইতিহাসেও বিশ্বাসী। তাদের উপকথায় আছে— পৃথিবীর সর্বত্র প্রথমে ছিল পানি আর পানি। তারপর ঈশ্বর সৃষ্টি করলেন দুটি 'হাঁস-হাঁসিল'। হাঁস ঠাকুরকে বললে আমাদের তো বানালে কিন্তু কিন্তু আমরা থাকব কোথায়,খাবো কী? ঠাকুর তখন কুমিরকে ডেকে বললেন সমুদ্রের তলদেশ থেকে মাটি ওঠাতে। কুমির মাটি নিয়ে ডাঙায় উঠতে উঠতে গলে খসে পড়ল সব মাটি। এরপর ঠাকুরের নির্দেশে চেষ্টা করল কাঁকড়া — সেও ব্যর্থ হল। সবশেষে ঠাকুর ডাকলেন 'লেণ্ডং' অর্থাৎ কেঁচোকে। ঠাকুর সেই সাথে ডাকলেন কচ্ছপকেও। কেঁচো পানির ওপর কচ্ছপকে দাঁড় করিয়ে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখল কচ্ছপের পা। কেঁচোর লেজটি রাখল কচ্ছপের পিঠের ওপর, আর মুখ রাখলে সমুদ্রের তলদেশে। মুখ দিয়ে মাটি খেয়ে লেজ দিয়ে সেই মাটি কচ্ছপের পিঠের ওপর রাখতে লাগল। মাটি আর গলল না। এভাবে কেঁচো কচ্ছপের পিঠে মাটি তুলে তৈরি করল পৃথিবী।[১৫] তারাশঙ্কর *অরণ্য-বহ্নি* উপন্যাসে সাঁওতালদের জীবনধারা ও বিশ্বাসকে স্পষ্ট করবার জন্য এসব উপকথা ব্যবহার করেছেন। তাদের একটি উপকথায় আছে — সাত ভাই'র এক বোন ছিল। ভাইদের খুব ভাল বাসত বোনটি। কিন্তু ভাই ও বৌদিদিরা বোনটিকে সহ্য করতে পারত না। সাত ভাই রাজার পুকুর খনন কাজে গেল। বোনটি প্রতিদিন ভাইদের জন্য নিয়ে যেত খাবার। কিন্তু পুকুর খনন শেষে সাত ভাই মিলে বোনটাকে মেরে পুকুরে পুঁতে রাখল। বাড়ি গিয়ে সবাই জানাল বোনকে বাঘে খেয়ে ফেলেছে। বউরাও খুশিতে হাসল। মরংবোঙ্গা দেখলেন সবই, তিনি বললেন, 'তু বাঁচ গ, তু ভাল মেয়্যা।' মেয়েটি বাঁচল, তবে মানুষ হয়ে নয়, একটি পদ্মফুল হয়ে। রাজা পুকুর দেখতে এসে ফুটন্ত লাল পদ্মটি দেখতে পেলেন। চাকরকে সেটি তুলে আনার নির্দেশ দিলেন তিনি। চাকর ফুলটিকে ধরতে গেলে ফুলটি সরে গেল এবং বলল— রাজা ছাড়া কেউ তাকে ধরতে পারবে না। রাজা স্বয়ং নেমে সযত্নে তুলে নিয়ে এলেন পদ্ম ফুলটিকে। ফুলটি তখন মেয়ে হয়ে গেল। রাজা তখন মেয়েটিকে বিয়ে করে রানির মর্যাদা দিলেন। মেয়েটি বলল মরংবোঙ্গা এজন্যেই তাকে পুকুরে পদ্মফুল রূপে ফুটিয়েছিল। রাজবাড়িতে বিশাল ভোজসভার আয়োজন হল, সেখানে রানির সাত ভাই এল নিমন্ত্রিত হয়ে। হিংসায় তারা বোনকে পাতকুয়ায় ফেলে দেওয়ার পরিকল্পনা করল। বোঙ্গার তাতে ক্রোধ হল, বোঙ্গা বললেন, 'মাটি তু ফেটে যা।' মাটি ফাঁক হলে সাত ভাই বউসহ মাটির গভীরে তলিয়ে গেল।[১৬] চুনার মুর্মুর সাঁওতালদের প্রাচীন

Dhaka University Institutional Repository

ঐতিহ্যের কথা বলে সাবধান করে তার মেয়ে মানকীকে। অতীতের গৌরব-গাথা প্রকাশ পায় তার ওইসব কথকতায়। মুর্মু মাঝি বলে, 'মুর্মু ঠাকুর সাঁওতালদের রাজা ছিল। সেই বালী রাজা ছিল সবচেয়ে উঁচু পাহাড়ের কাছে। হিন্দুদের এক রাজা সেখানে তাদের পরাজিত করল। সেখান থেকে পালিয়ে বালী রাজার ছেলে রাজা হল আবার। সেখানে সাঁওতালদের জাতভাইরা তখনো সেখানে অবস্থান করছে। সেখানেও তুরুকদের সঙ্গে তাদের ভীষণ লড়াই হল। রাজার ছিল এক কন্যা। ছত্রী রাজারা সে পরমা সুন্দরী কন্যাকে বিয়ে করতে চাইল। কন্যা বাবাকে ছেড়ে দেওয়ার শর্তে ছত্রী রাজার সঙ্গে যেতে রাজি হল। তুরুক রাজা সম্মত হয়ে সাঁওতাল রাজাকে মুক্তি দিল। সাঁওতাল রাজ কন্যার পাল্‌কি এলো তুরুক রাজার কাছে। পালকি খুলে তুরুক রাজা দেখলেন রাজকন্যা বিষ খেয়েছে। মুমূর্ষু অবস্থায় রাজকন্যা বলল— 'তুরুক আমি মুর্মুঠাকুর রাজার বিটী— আমি ধরম দিব না হে। আমি মরলম।'[১৭]

সাঁওতাল সংস্কৃতি বিচিত্র এবং সমৃদ্ধ। কাজের ফাঁকে নানা পূজা-পার্বণ ও অনুষ্ঠানে তারা আনন্দ খোঁজে। স্বভাবগতভাবেও সাঁওতালরা আমোদপ্রবণ জাতি। নানারকম লৌকিক পূজা-পার্বণ উৎসবে তারা নাচ-গানে মেতে ওঠে। তাদের একান্ত গোষ্ঠীগত পূজা হল মরংবোঙ্গার পূজা। বোঙ্গার অবস্থানস্থলকে তারা 'জহরসর্ণা' বলে। পূজার সময় ওই 'জহর সর্ণা'য় তারা পশু-পাখি বলি দেয়। এ-সময় দেবস্থানে মিলিত হয়ে তারা হাড়িয়া বা মদ পান করে, নাচে গানে উন্মাতাল হয়। তখন কর্মপ্রিয় শ্রমজীবী সাঁওতালরা অন্যমানুষ। বুনো আদিম উন্মাদনায়ই তারা আনন্দ খুঁজে পায় সবচেয়ে বেশি। বিপদে-সংকটে আনন্দ-সমৃদ্ধিতে সাঁওতালরা তাদের দেবতার সাহায্য কামনা করে। এছাড়াও সাঁওতাল সম্প্রদায় হিন্দুদের প্রভাবে দুর্গাপূজা ও কালীপূজা করে। দুর্গা পূজার আনন্দ যাপনে কৌমের বালক-বালিকা, যুবক-বৃদ্ধ সবাই অংশ নেয়। তারা নাচ-গান করে মাদল বাজিয়ে। আলোচ্য উপন্যাসে দেখা যায় সাঁওতালরা যুদ্ধযাত্রা ও যুদ্ধজয় উভয় ক্ষেত্রেই দুর্গাপূজা ও কালীপূজার আয়োজন করেছে।

নৃত্য-গীত সাঁওতালদের জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। বিভিন্ন পূজা-পার্বণে তারা নাচ-গানের মাধ্যমে উল্লাস প্রকাশ করে। তবে দিনব্যাপী কঠোর পরিশ্রমের পর প্রতিরাতেই সাঁওতাল নারীপুরুষ মদ পান করে আনন্দ-উল্লাসে মেতে ওঠে। সিধুর স্ত্রী ফুলের মতো সব সাঁওতাল নারীই নাচে পারদর্শী। ফুল স্বামী সিধুর সঙ্গে হেলেদুলে নাচে। সাঁওতাল গৃহে কোনো অতিথি এলেও এভাবেই তারা নেচে-গেয়ে অভ্যর্থনা জানায় অতিথিকে। বাঁশি ও মাদলের তালের সাথে সাথে নেচে গেয়ে অতিথির সঙ্গে হাস্য রসিকতাও করে সাঁওতালরা। এর মূল উদ্দেশ্য অতিথির আনন্দ বর্ধন। খুব আপন লোককে ওরা গান গেয়ে মাটিতে বসতে দেয়। সাঁওতালদের গানেরও রয়েছে নানা ধরন। সাধারণভাবে সবসময় গাওয়ার জন্য রয়েছে 'লাগডে' গান, বিয়ের অনুষ্ঠানে বিয়ের গান বা 'বাপরা সিরিং' আর বীজ ছড়ানোর জন্য ও ধান ভানার জন্য গীত হয় 'রহয় সিরিং'। এছাড়া বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন রকম ঋতুর গানও তারা গায়। বিদ্রোহের বা হুলার গানও আছে তাদের। ১৮৫৪ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহের সময় বিদ্রোহের গান গেয়ে গ্রামে গ্রামে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছিল তারা। সিধুর প্রণয়িনী রুকনী কিশোর-সৈনিকের বেশ ধারণ করে বিদ্রোহের গান গেয়েছিল:

... দিকুরা সব লুঠলো, সাদা মানুষ জুটলো
কালো মেয়্যা লুটলো-হড়ে ধরম চাড়লো—
মরংবোঙ্গা ক্ষেপলো

Dhaka University Institutional Repository

জল হল নাই। তাথেই জল হল না-ই
মরংবোঙ্গা রাগলো— শুভোবাবু জাগল
টাঙ্গি নিয়ে ছুটলো—
সায়েব দিড়ে কাটলো— কালো মেয়্যা কাড়লো;
চোখের পানি মুছলো—
আবার তারা হাসলো— ইবার জল হবে রে—
ওরে ডর না-ই ।[১৮]

চার

আরণ্য-সন্তান সাঁওতালদের জীবনযাত্রাও আদিম ও আরণ্যক। বনের শিকার করা পশুর মাংস আগুনে পুড়িয়ে লবণ-মরিচ মাখিয়ে খায় সাঁওতালরা। অভাব ছিল শুধু লবণের। লবণ তাদের কাছে দুর্মূল্য দ্রব্য। ফেনে-লবণে সামান্য ভাত খেয়ে সাঁওতালরা মাঠে কাজ করে। গরু, মহিষ, খরগোশ, শূকর, মুরগি ইত্যাদি নানা রকম প্রাণীর মাংস তাদের প্রিয় আহার্য। এছাড়া তাদের প্রিয় পানীয় হাড়িয়া বা মদ । কাজের ফাঁকে ফাঁকে সাঁওতালরা নিজেদের তৈরি 'চুটি' বা বিড়ি খায়। বুট কলাই ইত্যাদি শস্য সিদ্ধও তাদের খাদ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত। খাদ্যের বিষয়ে সাঁওতালদের তেমন বাছবিচার নেই। নিজেরা শস্য উৎপাদন করে প্রচুর, কিন্তু তারপরও নিজেদের প্রয়োজনীয় খাবারের ঘাটতি থেকেই যায় তাদের। উৎপন্ন শস্যের প্রায় সবটুকুই চলে যায় জমিদার-মহাজনের ঘরে। সাঁওতালেরা নিজেদের উৎপন্ন দ্রব্যের নগণ্য দাম পায়, কিন্তু তাদেরই উৎপাদিত যে-কোনো দ্রব্য হাট-বাজার থেকে ক্রয় করতে হয় আকাশচুম্বী দামে।

সাঁওতালরা আদিম প্রাকৃত মানুষ। গায়ের রং তাদের কষ্টিপাথরের মতো কালো ; পরনে থাকে একফালি মাত্র কাপড়, মাথায় বাবরি চুল। ছোট বাবরিতে তারা গুঁজে রাখে ফুল, গলায় পরে পুতির মালা। 'মেয়েরা কষ্টিপাথরে খোদাই করা সুঠামগঠন নারীমূর্তি। ডাগর চোখ, কাপল ছোট, মাথার চুল ঘন কিন্তু লম্বায় খুব দীর্ঘ নয়। সিঁথি কাটেনা, সমান করে উজিয়ে টেনে চুল পাকিয়ে খোঁপা বাঁধে। খোঁপায় থাকে জিজির গাঁথা কাঁটা ফুল। কিন্তু তাও দেখা যায় না। সেখানো থোকা থোকা হলুদ ফুল আর লাল ফুল গুঁজে রাখে।... এদের পরনে দুপ্রস্ত সাঁওতালী তাঁত বোনা মোটা সূতোর কাপড় ; রঙিন; একপ্রস্থ কোমর থেকে নিচের দিকে, অপর প্রস্তটাকে কোমরে একপ্রান্তে গুঁজে বুক ঢেকে পিঠ বেড়ে কোমরে আঁটসাঁট করে জড়িয়ে গোঁজে।'[১৯] সাঁওতাল মেয়েদের সাজগোজ খুব পছন্দ। উজ্জ্বল রঙিন কাপড় অধিক পছন্দ তাদের। সাঁওতাল যুবকদের হাতে সর্বদা তীর ধনুক শোভা পায়। বিভিন্ন পূজাপার্বণ ও অনুষ্ঠানে তারা অপেক্ষাকৃত ভাল কাপড় পরতে পছন্দ করে।

আদিম এই জনগোষ্ঠীর বিনোদনেরও কমতি নেই। কাজের অবসরে তারা নৃত্য-গীত ও পানাহারের মাধ্যমে আনন্দে মেতে ওঠে। মাদল ও বাঁশির সুরে পাহাড়ের নীরব পরিবেশকে তারা আনন্দে ভরিয়ে তোলে। সাঁওতাল নরনারী হাস্য-রসিকতা করতে পছন্দ করে। আবার তারা অশ্লীল কথার মধ্যেও

Dhaka University Institutional Repository

একধরনের আনন্দ খুঁজে পায়। সাঁওতাল যুবকদের অধিকতর আনন্দের বিষয় হল শিকার করা। গোটা জাতিটাই আনন্দপ্রবণ একটা জাতি। শিঙ্গা, মাদল, বাঁশি হচ্ছে সাঁওতালদের প্রধান সাংস্কৃতিক উপাদান।

সাঁওতালরা মূলত কৃষিজীবী। কৃষিই তাদের আদি পেশা। চাষযোগ্য জমির প্রতি সাঁওতালদের রয়েছে গভীর অনুরাগ। তাদের পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের ফলে হাজার হাজার একর অরণ্যভূমি উর্বর চাষযোগ্য জমিতে পরিণত হয়েছে। আলোচ্য উপন্যাসে দেখা যায়, ভূমিকর্ষণের প্রয়োজনেই সাঁওতালরা প্রথমে 'দামিন-ই-কোহ'তে এসে জড়ো হয়েছিল। অথচ, জমিদার ও মধ্যস্বত্বভোগীদের কূটকৌশলে অসংখ্য সাঁওতাল শেষ পর্যন্ত ঋণের ভারে জর্জরিত হয়ে শ্রমদাসে পরিণত হয়। ফলে তারা জীবিকা হিসেবে রেললইন তৈরির কাজ, মাটি কাটার কাজ ইত্যাদি ভিন্ন পেশা বেছে নিতে বাধ্য হয়। শিকার ও কৃষিকাজ ছেড়ে সাঁওতালরা যখন অন্যান্য পেশায় যাচ্ছিল তখন থেকেই তাদের জীবনধারায় পরিবর্তনের সূত্রপাত। ইতিহাসের এই কালপর্ব থেকেই তারা ক্রমে বিচ্যুত হয়ে পড়ছিল স্বকীয় সংস্কৃতি থেকে।

সাহিত্যের সর্বত্র ভাষার গুরুত্ব অপরিসীম। বক্তব্যের বিশ্বাসযোগ্যতা , চরিত্রের সঠিক চিত্রায়ন ও শিল্পের যথার্থতার জন্যই ভাষা গুরুত্বপূর্ণ। তারাশঙ্কর বিশেষ অঞ্চলের নিম্নশ্রেণির মানুষদের নিয়ে অধিক লিখেছেন। এদের সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল বলে এদের ভাষাও তিনি আয়ত্ত করেছিলেন। *অরণ্য-বহ্নি* উপন্যাসে বীরভূমের আঞ্চলিক ভাষার বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে মিলিয়েই সাঁওতালি ভাষা ব্যবহার করেছেন তিনি। বাঙালি জমিদার-মহাজনের সঙ্গে নানামাত্রিক নৈকট্যের কারণে সাঁওতালি ভাষাও অবিমিশ্র থাকেনি উপন্যাসে। তথাপি এ-কথা নির্দ্বিধায় স্বীকার করে নিতে হবে যে, তারাশঙ্কর সাঁওতালি ভাষা ব্যবহারে দক্ষ ছিলেন। তাই তিনি মিশ্রভাষা ব্যবহার করতে পেরেছেন। *অরণ্য-বহ্নি* উপন্যাসে ত্রিবিধ ভাষা ব্যবহার লক্ষণীয়। 'আমি' রূপী সর্বজ্ঞ ঔপন্যাসিকের ভাষা তারাশঙ্করের নিজের ভাষা — যা বিশুদ্ধ চলতি ভাষা। পটশিল্পী নয়ন পালের পদ্যাশ্রয়ী পটচিত্রের বর্ণনা বাংলা কাহিনীকাব্যের প্রাচীন ঐতিহ্যকে ধারণ করে আছে। আর তৃতীয় ভাষাটি সাঁওতালদের নিজস্ব আঞ্চলিক ভাষা। আদিবাসী সাঁওতালদের ভাষা, সংস্কৃতি ও জীবনাচার সম্পর্কে তারাশঙ্করের ছিল বাস্তব অভিজ্ঞতা। তাই এই উপন্যাসে ঔপন্যাসিক সাঁওতালি শব্দ, বাক্যাংশ ও সংলাপ, ছড়া ও গান অবলীলায় ব্যবহার করেছেন। কিন্তু পাঠকের নিকট তা দুর্বোধ্য হয়ে ওঠেনি ; বরং আঞ্চলিকতার স্বাদ ও অনুভবযোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে। দুর্বোধ্যতার আশঙ্কা থেকে থেকে কখনো তিনি দুর্বোধ্য ও অজ্ঞাত শব্দের অর্থ সরাসরি প্রতিশব্দ যোগে বুঝিয়ে দিয়েছেন। যেমন: '... আর আমাদের বাড়ি যাবি তো আয়। দাকা (অর্থাৎ ভাত) দিব, সিম (অর্থাৎ মুরগী) দিব, আর হাড়িয়া (অর্থাৎ পচুই মদ) খাস তো দিব।'[২০] এখানে তারাশঙ্কর কিছু সাঁওতালি শব্দ প্রতিশব্দসহ ব্যবহার করেছেন। আবার এমন বাক্যের ব্যবহারও লক্ষণীয় — আকাশে কালো মেঘ দেখে সাঁওতালরা বলছে, 'বাবারে, কারীড়াং বিমীল বাকাপ পানা! (ভীষণ কালো মেঘ উঠল হে!) — বিজলী মালকাও কানা! (বিদ্যুৎ চিকুরছে হে!) — দা গায় (জল হবে) মারংহায়েদা গায় (ঝড় হবেক হে!)[২১]। তারাশঙ্কর এভাবেই সাঁওতালি ভাষাকে বুঝিয়ে দিয়েছেন রাঢ়ী অপভ্রংশ ব্যবহার করে, যা পাঠকদের কাছে গ্রহণযোগ্য ও মানানসই হয়েছে। *অরণ্য-বহ্নি* উপন্যাসে সাঁওতালদের কর্ম-উদ্দীপনা, বিদ্রোহ, হাস্য-যন্ত্রণার কথা প্রকাশিত হয়েছে তাদের নিজস্ব ছড়া, গান ও সাঁওতালি ভাষার সংলাপ সহযোগে। আত্মীয়কে অভ্যর্থনায় সাঁওতালরা গান গায় :

সিগিডো দুবুই জান, কুপুল্‌কো হিজা জা

Dhaka University Institutional Repository

সাও নারিগা পাটী বিলাকম

...

গান্‌ডুরো বানো জান পটিয়া বানো জান—[২২]

সাঁওতালদের ভাষায় তাদের নিজস্ব সৃজনশীলতা, সারল্য, সৌর্য ও স্বকীয় সংস্কৃতির পরিচয় মেলে।

সাঁওতালরা সৌন্দর্য সচেতন ও পরিচ্ছন্ন এক জনগোষ্ঠী। কারুশিল্পেও তারা দক্ষ। ঘরের দেওয়ালে মাটি ও গোবর দিয়ে আঙুলের সাহায্যে তারা খেজুর পাতার নকশা আঁকে ; যত্ন করে মনোহর বাঁশি ও ধনুক তৈরি করে। সুন্দর ডালা, কুলা ও পাটি তৈরি করতেও তারা ওস্তাদ। তাদের তৈরি এসব সামগ্রী থেকে তাদের সৌন্দর্য ও শিল্পচেতনার পরিচয় পাওয়া যায়।

পাঁচ

সাঁওতাল সমাজে পিতৃতান্ত্রিক প্রথা প্রচলিত। তথাপি নারী সেখানে অবহেলিত নয়। অশিক্ষিত অরণ্যবাসী আদিম এই কৌমের নর-নারীর সম্পর্ক অন্যান্য আদিবাসী গোষ্ঠীর চেয়ে বেশ সংহত। বর্তমান উপন্যাসে আমরা প্রত্যক্ষ করি সাঁওতাল পুরুষদের পাশাপাশি নারীরাও সমান পরিশ্রমী। নারী প্রাত্যহিক সকল কাজেই পুরুষকে সহযোগিতা করে। শ্রমের ক্ষেত্রে কেউ পিছিয়ে নেই। যার ফলে নারীর অবস্থান এই সমাজেও বেশ সুসংহত। তথাকথিত শিক্ষিত না হয়েও তাদের মধ্যে হাস্যরস, সম্মিলিত আনন্দ উল্লাসের প্রবণতা লক্ষণীয়। তবে তা বহুলাংশে আরণ্যক আমেজমণ্ডিত।

সাঁওতাল কৌমে গোত্রপতির প্রাধান্য বেশি। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলে গোত্রপতির শাসন মান্য করে। কঠোর গোত্র শাসনের ফলে কখনো নারীর সামাজিক জীবনও হয় শৃঙ্খলাবদ্ধ। কেনারাম ভক্ত মহেশ দারোগার কামনা চরিতার্থের জন্য মাহাতো, হাড়ী, বাগদী, বাউরী ইত্যাদি নিচু শ্রেণির আদিবাসী নারীদের ধরে নিয়ে আসত। কিন্তু কখনো সাঁওতাল নারীদের দিকে হাত বাড়াতো না।[২৩] কারণ সাঁওতালদের নিজেদের সমাজ ব্যবস্থা অত্যন্ত দৃঢ় ও সংঘবদ্ধ ছিল। আর সাঁওতাল নারীরা ছিল স্বাধীনচেতা, একরোখা, উদ্ধত, সহজ-সরল ও রসিকতা প্রিয়। সাজ-সজ্জা ও সৌন্দর্যের প্রতি যেমন তাদের আগ্রহ তেমনি তারা কর্মপ্রিয়ও। অন্যায়ের প্রতিবাদ করা তাদের চরিত্রের সহজাত একটা প্রবণতা। কানুর স্ত্রী টুশকি 'জহর-সর্ণা' থেকে ফেরার পথে পিছিয়ে পড়া সিধু-কানুকে যে সুরে ডেকেছিল তা থেকেই সাঁওতাল নারীর অবস্থান ও স্বভাব সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। 'শূনছ হে-হেই! হেই দু ভেয়েরা! বলি পিছাও কেন হে? ঘর দুয়ারে পাটকামগুলা করবেক কে? বলি দিগ্‌রা চারটে কাঁদছেক, ভুখ লাগল, তাদের খেতে দিব, না ঘর কাম করব? হঁ। আমাদিগে কিনে আনছিস না কি? দিগ্‌রাগুলা আমরা বাপের ঘর থেকে আনলম লয়? লাজ লাগে না তুদের?'[২৪] এই অংশটুকু থেকে আমরা সাঁওতাল নারীর উদ্ধত স্বভাব ও স্থূল রসবোধের পরিচয় পাই। সাঁওতাল নারীর সবকিছুতে পুরুষের সাথে আছে সম অংশগ্রহণ। পরিশ্রমের ক্ষেত্রে যেমন নারী-পুরুষের সমতা ছিল, তেমনি আনন্দ উল্লাসেও তারা একত্র অংশ নিত। একসঙ্গে গ্রামের নানা অনুষ্ঠানে নারীরা নাচে গায়, মদপানে আনন্দ করে। অরণ্যবাসী হলেও সাঁওতাল সমাজে নারীর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বিদ্যমান। সাঁওতাল নারী সম্বন্ধে ইংরেজরা ভাবতো 'এদেশের সন্টাল মেয়েগুলো মাথায় কাপড় ঢাকা দেয় না, সামনাসামনি কথাবার্তা বলে— লজ্জা করে না, হাসে।

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু তারা বুনো জাত, অসভ্য জাত, তাদের স্বাস্থ্য আছে, যৌবন আছে— তারা লোভনীয় কিন্তু অত্যন্ত একগুয়ে।' [২৫]

তথাকথিত সভ্য মানুষের দৃষ্টিতে সাঁওতালরা বুনো জাত, অশিক্ষিত-বর্বর হলেও *অরণ্য-বহ্নি* উপন্যাসে নরনারীর মধ্যে উন্নত মানবীয় প্রেম পরিলক্ষিত হয়। এ সমাজে নারী-পুরুষের সম্পর্ক কেবল কামনাসর্বস্ব নয়। সিধু-কানু প্রথম যৌবনে রুকনী-টুকনীর প্রতি প্রেমাসক্ত হয়েছিল। রুকনী-টুকনীও সিধু-কানুকে মন দিয়েছিল। কিন্তু বাবা চুনার মুর্মুর ইচ্ছায় দুই ভাই ফুল ও টুশকীকে বিয়ে করে। কিন্তু তারা কেউই অতীতপ্রেমের সুখস্মৃতি ভুলতে পারে না। রুকনি-টুকনি খ্রিস্টান হয়ে রাস্তাবন্দির কাজে চলে গিয়েছিল তাদের বাবার সাথে। সেখানেও তারা, সিধু-কানুকে মন দিয়েছিল বলে অন্য কাউকে বিয়ে করেনি। রুকনী-টুকনী-মানকী ইংরেজ সাহেব কর্তৃক অপহৃত ও ধর্ষিত হয়। রুকনী ঘুমন্ত সাহেবকে কিরিচ দিয়ে হত্যা করে পালিয়ে আসে। দুরন্ত সাহসী সাঁওতাল নারী তার সম্ভ্রম হারানোর প্রতিশোধ নেয় হত্যার মাধ্যমে।

সাঁওতালরা অরণ্যবাসী হলেও তাদের জৈবিক কামনা বাসনা নিতান্ত আরণ্যক প্রকৃতির ছিল না। নারী-পুরুষের মধ্যে আমরা হার্দিক প্রেম-ভালোবাসাই দেখতে পাই। মানকী-লালমাঝির মধ্যে গভীর প্রেম প্রত্যক্ষ করা যায়। মানকী লালমাঝির জন্য ঘর ছেড়েছে, বিয়ে করেছে, কিন্তু কোনো পঙ্কিলতা তাদের স্পর্শ করেনি। জৈবিক কামনা উপন্যাসে নর-নারীর প্রেমের হার্দিক পথ ধরেই এসেছে। সিধু-কানুও তাদের প্রথম প্রেম রুকনী-টুকনীর প্রতিও কোনো সমাজ-নিষিদ্ধ আবেগ প্রকাশ করেনি, এমনকি পিতৃআজ্ঞা রক্ষার্থে ফুল আর টুশকীকে বিয়ে করবার পর স্ত্রীর সঙ্গেও স্বাভাবিক ভালবাসাপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখেছে। সাঁওতালদের বৈবাহিক সম্পর্ক ও বন্ধন সুদৃঢ়।

সাঁওতাল সমাজে পিতাকে যথেষ্ট সম্মান করা হয়। পারিবারিক ও সামাজিক কঠোর অনুশাসন এবং বড়দের প্রতি সম্মানবোধই সাঁওতাল কৌমে নরনারীর মর্যাদাপূর্ণ ও শৃঙ্খলাপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখেছে। সাঁওতাল পরিবারের কেন্দ্রীয় শক্তি ছিল পিতা বা জ্যেষ্ঠর হাতে। এই প্রথার প্রতি সম্ভ্রমবোধ সাঁওতালদের সমাজজীবনকে অন্য অনেক কৌম থেকেই করেছিল নীতিসিদ্ধ, উদ্দাম, ব্যাভিচারিতামুক্ত ও সুশৃঙ্খল। তবে, সাঁওতালদের মধ্যে র্বণভেদ কিছুটা লক্ষণীয়। একগোত্রের পুরুষ অন্যগোত্রের নারীকে, বিশেষত উঁচু-নিচু শ্রেণির মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন তারা একদম পছন্দ করে না। উপন্যাসে তাই মুর্মু বংশের মেয়ে মানকীকে চুনার মুর্মু হাঁসদা বংশের ছেলের কাছে বিয়ে দিতে চায়নি। তারা পালিয়ে বিয়ে করেছিল। কাহার বা বেদের মতো সাঁওতাল নর-নারীর মধ্যে আমরা কামনার উদগ্র ও নগ্ন আকাঙ্ক্ষা প্রত্যক্ষ করি না। তাদের মধ্যে একটি পরিশীলিত মানসিকতা ও শৃঙ্খলাপূর্ণ সমাজব্যবস্থা বিরাজমান।

কর্মজীবনেও নারী পুরুষের মধ্যে আছে সহযোগিতা ও সহমর্মিতাপূর্ণ সম্পর্ক। সাঁওতাল নারী-পুরুষ উভয়ই প্রচণ্ড পরিশ্রমী। নারী গৃহকর্মের পাশাপাশি বাইরের কাজে এমনকী শিকারের কাজেও পুরুষকে সহায়তা করে। ১৮৫৪-৫৫ সালে সাঁওতালদের সেই অগ্নিঝরা বিদ্রোহের দিনেও আমরা অবাক বিস্ময়ে লক্ষ করি নারী পুরুষের পাশাপাশি যুদ্ধ করছে ; তীর ধনুক টাঙ্গি তলোয়ার এগিয়ে দিয়ে সশরীরে যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থান করছে। রুকনী পুরুষের বেশে সিধুর দেহরক্ষীর ভূমিকা পালন করেছে। সাঁওতালদের গ্রামে গ্রামে ঘোড়ায় চড়ে সংবাদ আদান প্রদান করছে সে। যুদ্ধের সময় আমরা রুকনীকে পাই একজন অসম সাহসী নারী রূপে। তার দূরদর্শিতা সাঁওতালদের যুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিল। টুকনীকে

Dhaka University Institutional Repository

দেখি কানুর পাশে থেকে যুদ্ধ করতে। এমন বীরাঙ্গনা নারীর মধ্যে আবার কোমল রূপও লক্ষণীয়। সিধু যখন রুকনীকে বিয়ে করার প্রস্তাব দেয় তখন রুকনী জবাব দেয় , 'না। ফুল কাঁদবেক। আমি তুমার চাকরানী শুভোবাবু! ফুলের চাকরানী। শুধু আমাকে তুমার চাকর কর শুভোবাবু, সিপাই কর। তুমি লড়াই করবে, আমি তুমার সাথে থাকব। টাঙি লিব, ধেনুক কাড় লিব— লড়ব আমি তুমার পাশে দাঁড়ায়ে।'[২৬] সিধু রুকনীকে সোনার হার দিয়েছিল। রুকনী তা চাদরে বেঁধে রেখেছিল সিধুর স্ত্রী ফুলের জন্য; আর বলেছিল, 'আমার ফুলরানীর দাও আগে রাজাবাবু, আমি তাকে দিব! ই হারটোও দিব। সিপাহী হার পরে গ! আমি কি মেয়া বটি।'[২৭]

সাঁওতাল বিদ্রোহের সময় সিধু-কানু দুই ভাইয়ের প্রেরণা ও শক্তি হিসেবে পাশে থেকেছে রুকনী টুকনী দুই বোন। রুকনী সিধুর দেওয়া সিঁদুর পরেনি। সাঁওতালদের মুক্তি ও সিধু-কানুর সেবাই ছিল তখন তার ব্রত। তাই নয়ন পাল ছড়ায় তাদের সম্পর্কে বলেছেন :

সাধকের শক্তি যারা তারা নয় বধূ।
তারা হয় জীবনের মনোরমা শুধু। [২৮]

রুকনী একদিকে নিজের স্বার্থমগ্ন প্রেমের চেয়ে দেশকে বড় করে দেখেছে, অন্যদিকে ফুলকেও সে কষ্ট দিতে চায়নি। সিধুর ফাঁসির পর তার স্ত্রী ফুল রুকনীকে আশ্রয় দিয়েছিল, কাছে রেখেছিল। স্বামীর প্রত্যাশিতাকে স্থান দিয়ে আদিম সাঁওতাল নারী ফুল অনন্য মহৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

প্রকৃতির আদিম সন্তান সাঁওতালেরা সত্যিকারের বীর ছিল। তাদের চরিত্রে কোনো শঠতা ছিল না। বন্য হলেও তারা ছিল সুশৃঙ্খল জাতি। নারীর প্রতি পুরুষের অপরিসীম আন্তরিকতা ও মর্যাদাবোধ ছিল। সেকালের 'সংবাদ প্রভাকর' যাই বলুক বাস্তবিক অর্থে বিদ্রোহে উন্মাদনায় দু-একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া তারা নারী হত্যা থেকে বিরত থেকেছে যুদ্ধের সময়ও।[২৯] 'সংবাদ প্রভাকরে' সাঁওতাল বিদ্রোহের সময় সাঁওতালদের অত্যাচারের অতিরঞ্জিত খবর প্রকাশিত হয়েছিল। পত্রিকাটি বিদ্রোহ দমনে ইংরেজ বাহিনী প্রেরণের এবং হিন্দু জমিদার প্রেরিত কাল্পনিক খবরই প্রকাশ করত। নারীর ওপর অত্যাচারের খবরটি অতিরঞ্জিত ছিল। আবদারপুরের দুর্লভ সত্যবাদী ধ্বজু মল্লিক জানান যে, 'মেয়েছেলের ওপর অত্যাচার শুনিনি।' [৩০] যুদ্ধের সময়ও সাঁওতালরা নারী ও শিশু হত্যা থেকে বিরত থেকেছে। এ থেকে সাঁওতালদের উন্নত মানবীয় পরিচয়ই পাওয়া যায়। তারা নারীকে অবজ্ঞা করত না। স্বীয় সমাজের নারীর মর্যাদা রক্ষার জন্য তারা অসীম সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিল। উপন্যাসে বিধৃত বিদ্রোহের কাহিনীতে রুকনী, টুকনী ও মানকী অপহৃত হলে তারা প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হয়। রাতের আঁধারে সাহেবদের হত্যা করে তারা মেয়েদের উদ্ধার করে নিয়ে আসে। বৃদ্ধ চুনার মুর্মুর অসহায় বিধবা বোনকে সাংসারিক প্রতিকূলতার মধ্যেও নিজের ঘরে আশ্রয় দিয়েছিল। এসব ঘটনা তাদের সমাজে নারীর প্রতি মর্যাদাবোধেরই প্রমাণ দেয়।

ছয়

সাঁওতাল সম্প্রদায় মিশ্র ধর্মের অনুসারী ছিল। শিক্ষাবঞ্চিত এই আদিম জাতিগোষ্ঠী তাদের চিন্তার বাইরে যা কিছু ঘটে তাকেই অলৌকিক বলে মেনে নেয়। ওই সবকিছুতেই তারা খুঁজে পায় দেব মাহাত্ম্য। সাঁওতালদের প্রধান দেবতা মরং বোঙ্গা। তাদের ধর্মীয় জীবনে হিন্দু সংস্কৃতির গভীর প্রভাব রয়েছে। দুর্গা ও কালীকেও তারা মান্য করে, পূজা দেয়। হিন্দু ধর্মের মতো পৌত্তলিকতার প্রচলন আছে

Dhaka University Institutional Repository

তাদের ধর্মেও। ঝড়, বৃষ্টি, দাবানল, বজ্রপাত সবকিছুর মধ্যেই তারা বোঙ্গার ইচ্ছা-অনিচ্ছার প্রতিফলন লক্ষ করে। রোগ-শোক, ক্ষুধা-দারিদ্র্য, ভাল ফসল পাওয়া ইত্যাদি সবকিছুর জন্যই তারা বোঙ্গাকে স্মরণ করে, বোঙ্গার পূজা করে। তাদের সবরকম দুঃখ-দুর্দশার কারণ হিসেবে বোঙ্গার অসন্তুষ্টিকে বিবেচনা করে তারা। আবার এই সরল বিশ্বাসী সাঁওতালরা প্রয়োজনে সবকিছু লণ্ড-ভণ্ড করে দিতে পারে। তাই সিধু ও কানু বোঙ্গার 'টাঙ্গি' প্রাপ্তির প্রার্থনা করে যাতে অত্যাচারী ইংরেজ ও জোতদারদের কেটে ফেলতে পারে। তাদের জীবনে প্রতিটি ক্ষেত্রেই রয়েছে ধর্মীয় বিশ্বাসের অবস্থান। তাই তারা যে কোনো কাজে এবং প্রত্যেক ঋতুতে বোঙ্গার পূজা দেয়। শূকর, মুরগী, হাঁস ইত্যাদি দেবস্থান জহর সর্নায় বোঙ্গার উদ্দেশে বলি দেয়।

ক্ষুধার যন্ত্রণা থেকে রেহাই পাওয়া এবং বেঁচে থাকার জন্য সাঁওতালদের কেউ কেউ পাদরিদের প্ররোচনায় খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করে, মিশনারিতে যায়। সেখানে তারা ঈশা ও মেরিকে ডাকতে শেখে। কিন্তু তারা সাঁওতাল-ধর্ম, বোঙ্গার প্রতি বিশ্বাসকে ছাড়তে পারে না। বিপদে আপদে, যে কোনো সংকটে একইসঙ্গে ঈশা, মেরি, বোঙ্গা, দুর্গা, কালীকে ডাকে। তাঁদের কাছেই সাঁওতালরা আশ্রয় খোঁজে, সাহায্য প্রার্থনা করে। এভাবে সাঁওতালদের কাছে সব ধর্ম যেন একাকার হয়ে যায়। সব ধর্মকেই তারা নিজেদের মধ্যে ধারণ করে আছে। কোথাও এই মিশ্রণ কোথাও তাদের নিজেদের মধ্যে সমস্যা তৈরি করেনি। হিন্দুদের দূর্গা পূজার সময় তারা মহানন্দে দলে দলে যোগ দেয়, মাদল বাজায়, বাঁশি বাজায়, নাচে-গায়, 'হাড়িয়া' পান করে। *অরণ্য-বহ্নি*-তে সিধু-কানু সাঁওতাল বিদ্রোহের সময় মূর্তি গড়িয়ে পুরোহিত আনিয়ে দুর্গা পূজা করেছিল। ভৈরবী মায়ের অনুকরণে লাল ও রুকনী দেবী কালীকে বুকের রক্ত দিয়ে তুষ্ট করেছিল। সাঁওতালদের কাছে বোঙ্গা, কালী, দূর্গা এক মহাশক্তিতে রূপান্তরিত হয়। যুদ্ধের সময় বোঙ্গার নির্দেশ ও সাহায্য কামনা করে তারা। বোঙ্গার আশীর্বাদে ইংরেজদের বন্দুকের গুলি জল হয়ে যাবে বলেও তারা বিশ্বাস করে। সমগ্র সাঁওতাল সম্প্রদায় বিশ্বাস করে মরং বোঙ্গা সিধু-কানু দুই ভাইকে শুভোবাবু অর্থাৎ রাজা করেছেন। তারা সাঁওতালদের রাজা। সাঁওতালদের বিশ্বাস তাদের চিরকালীন দুঃখ দূর করার জন্যই বোঙ্গা তাদের পাঠিয়েছেন। আদিম সরল অরণ্যচারী সাঁওতাল জাতিকে তাদের অন্ধ বিশ্বাস দ্বারাই পরাজিত করেছিল ধূর্ত মানবতাশূন্য ইংরেজ বাহিনী। সাঁওতালরা বিশ্বাস করেছিল বোঙ্গা ও দুর্গার মিলিত আশীর্বাদে গুলি জল হয়ে যাবে, তাদের গায়ে লাগবে না। ইংরেজরা সাঁওতালদের এই সরল বিশ্বাসের সুযোগ নিয়েছিল। প্রথমে তারা ফাঁকা গুলি করেছিল। সাঁওতালরা তা বুঝতে না পেরে দলে দলে সমতলে নেমে আসে। তারা মনে করেছিল সত্যি সত্যি গুলি জল হয়ে গেল। এই সুযোগে সরল পরাক্রমশালী হাজার হাজার সাঁওতালকে গুলি করে নির্মমভাবে হত্যা করেছিল কূটকৌশলী ইংরেজ বাহিনী। ইতিহাসের সে এক কলঙ্কজনক ঘটনা অধ্যায়।

সাত

সাঁওতালরা বিচিত্র এক আদিবাসী জনগোষ্ঠী । তাদের জীবনাচারও বিচিত্র রকমের। তাদের মধ্যে গোষ্ঠীগত ঐক্য প্রবল। সহজ, সরল, প্রাণবন্ত তাদের জীবনধারা। নিরন্তর সংগ্রাম তাদের শুধু বেঁচে থাকার জন্য। জমিদার ও মহাজনরা তাদের সরলতার সুযোগে সর্বস্ব কেড়ে নিলেও তারা প্রতিবাদ করতে চাইত না। সাঁওতালদের ধোকা দিয়ে ঋণ দিয়ে ক্রীতদাসে পরিণত করত তারা। বিক্রয়ের সময় দ্রব্যাদি ওজনে কম দিত মহাজন, তাদের বিক্রিত এক কেড়ে ঘিতে এক সেরও হত না। সকল অত্যাচার

Dhaka University Institutional Repository

সাঁওতালরা মুখ বুজে সহ্য করত। তারা এত সহজ সরল আর নির্বোধ ছিল যে, মহাজন ঠাকাচ্ছে বুঝলেও কীভাবে ঠকাচ্ছে তা বুঝত না। সাঁওতালরা কখনো মিথ্যা কথা বলে না এবং মিথ্যা বলা তারা পছন্দও করে না। মিথ্যা শুনলেও তারা অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়। তাদের জীবনাচারে মিথ্যা, ফাঁকি, শঠতা এসবের কোন স্থান নেই। নারী-পুরুষ উভয়ই সমান হারে পরিশ্রম করতে পারে বলে স্বার্থপর সভ্য সমাজ তাদের পরিশ্রমের কদর করত। কেননা কাঁকর মিশ্রিত পাহাড়ি শক্ত অনুর্বর মাটি তাদের হাতের ছোঁয়ায় উর্বর স্বর্ণ প্রসবিনী হয়ে উঠত। কিন্তু যুগ যুগ ধরে বঞ্চনা ছাড়া জীবনে আর কিছুই তারা পায়নি।

সাঁওতালরা পরোপকারী ও অতিথিপরায়ণ। *অরণ্য-বহ্নি* উপন্যাসোক্ত উত্তমপুরুষ লেখক যখন পাহাড়ি রাস্তায় মোটর গাড়ি নষ্ট হয়ে পড়ায় সন্ধ্যার সময় আটকে যান, তখন তারাই তাঁকে বাংলোর সন্ধান দেয়, গাড়ি ঠেলে বাংলোর নিকট পৌঁছে দেয়। সাঁওতালরা তাঁকে বলে— 'সিখানে যা তুরা। গাড়ি রেখে থাকবি্ কাল বাসে চাপে যাবি সায়েবগঞ্জ— মিস্ত্রি লিয়ে এসে মেরামত করিয়ে লিবি। লইলেই এখানেই থাক। আর আমাদের বাড়ী যাবি তো আয়। দাকা (অর্থাৎ ভাত) দিব, সিম (অর্থাৎ মুরগী) দিব, আর হাড়িয়া (অর্থাৎ পচুই মদ) খাস তো তা দিব' [৩১]। গাড়ি পৌঁছে দেওয়ার জন্য লেখক পারিশ্রমিক দিতে চাইলে সাঁওতালরা টাকা নেয়নি। কারণ বিপদগ্রস্ত মানুষকে সাহায্য করা তাদের ধর্ম। সাঁওতালরা লেখকরূপী তারাশঙ্করকে জানিয়েছে তাদের টাকা নিতে নিষেধ আছে। তারা বলেছে—'বারণ করে গেইছে আমাদের শুভোবাবু। সিধু আর কানহু আমাদের শুভোবাবু ছিল।... তারা বইলে গেইছে কি— দেখ্ মানুষের যখুন বিপদ হবে তখুন তাকে বাঁচাবি, রাখবি, নিজের জানটা দিবি, কিছু লিবি না তার কাছে; রাতে মানুষ এসে ঠাঁই চাইলে তাকে ঘরে ঠাঁই দিবি, নিজে বাহার শুবি' [৩২]। বিস্মিত না হয়ে উপায় নেই অরণ্যচারী সাঁওতালদের মধ্যে পরোপকারের এমন চমৎকার মানসিকতায়।

অরণ্যবাসী আদিম অশিক্ষিত সাঁওতালদের কুসংস্কার আর অন্ধবিশ্বাস থাকাটাই স্বাভাবিক। তাদের ভাল মন্দের জন্য তারা দেবতার সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টিকেই দায়ী করে। সবকিছুতেই তাদের দেবতা বোঙ্গার প্রতি তাদের পরম নির্ভরতা। সাঁওতালদের মধ্যে গোত্র বিভাজন থাকলেও অন্যান্য আদিবাসীদের মতো তাদের মধ্যে গোত্রগত চরম কোনো বৈরীভাব নেই। গোত্র শাসনের প্রতি তারা সবাই শ্রদ্ধাশীল। দিনের কঠোর পরিশ্রমের পর রাতে নারী-পুরুষ একত্র নিজেদের তৈরি মদ খেয়ে নাচ-গান করে। গান-বাজনা-নাচ, আনন্দ উল্লাস তাদের সহজাত প্রবণতা। সাঁওতালদের চাওয়া পাওয়া খুব সামান্য। তবে তারা নারী-পুরুষ উভয়েরই সৌন্দর্য প্রিয়। বেদে বা কাহারদের তুলনায় সাঁওতালরা বেশি সৌন্দর্যপ্রিয় ও পরিচ্ছন্ন কৌমগোষ্ঠী।

আদিবাসী এই জনগোষ্ঠী যেমন সরল, তেমনি আবার প্রচণ্ড একগুঁয়ে ও রাগী। তবে তারা প্রকৃত বীরের জাত। হাজার হাজার বছরের শোষণ, বঞ্চনা, অত্যাচার যখন তাদের জীবনকে বিপন্ন করে তুলেছিল তখন অস্তিত্ব রক্ষার জন্যই তারা ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল, বিদ্রোহ করেছিল মহাজন-জমিদার এবং ইংরেজদের বিরুদ্ধে। হাজার হাজার সাঁওতাল সেদিন বেদনার আক্রোশে ফুঁসে উঠেছিল। সাঁওতালরা নির্দ্বিধায় মরতে জানে কিন্তু পিছু হটতে জানে না। সাঁওতালদের নিজেদের আত্মমর্যাদা বোধ সম্পর্কে যেমন সচেতনতা ছিল, তেমনি অন্যের প্রতিও তাদের মানবিকতাবোধ ছিল। তাদের উন্নত মানবিকতাবোধের পরিচয় পাওয়া যায় হান্টারের লেখা থেকেও। হান্টার সাঁওতালদের সম্পর্কে লিখেছেন, 'Even in their moment of success, however, the Santals were not wanting in a sort of barbaric chivalry and gave fair warning of purpose to plunder a town before they actually

Dhaka University Institutional Repository

came.' [৩৩] বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে তখন অপরাধপ্রবণ আদিবাসী গোষ্ঠীও বাস করত। কিন্তু সাঁওতালরা তাদের থেকে ভিন্ন প্রকৃতির। চারিত্রিক দৃঢ়তা, সততা ও শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন তাদের সহজাত স্বভাব। সাঁওতালদের স্বভাব-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে দিলীপ সরেন ছয়টি বিষয় উল্লেখ করেছেন :

১. সাঁওতালদের কাছে প্রাণের চাইতে স্বাধীনতার মূল্য অনেক বেশি।
২. সাঁওতালরা দলিত, শোষিত, নির্যাতিত জনগণের দুঃখমোচনের জন্য নেতৃত্ব দিতে জানে।
৩. অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে সাঁওতালরা ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রাম করতে দ্বিধাবোধ করে না। প্রয়োজন হলে তারা হাসিমুখে প্রাণ বিসর্জন দিতে পারে।
৪. সাঁওতালেরা অনাচার, অত্যাচার ও শঠতাকে ঘৃণা করে।
৫. সৎ, সামাজিক স্বাধীনতা ও স্বাধীনভাবে বাঁচার জন্য অধিকার সাঁওতালদের জীবনে এক চিরন্তন সত্য।
৬. সাঁওতালেরা ভাঙে, কিন্তু মচকায় না।[৩৪]

*অরণ্যবহ্নি*তে আমরা সাঁওতালদের স্বভাব ও জীবনাচরণের যে পরিচয় পাই তার সঙ্গে দিলীপ সরেন এর মন্তব্যের পূর্ণ মিল খুঁজে পাওয়া যায়। তারাশঙ্কর *কালিন্দী* উপন্যাসেও সাঁওতালদের সম্পর্কে এমনই বিশ্বস্ত চিত্র এঁকেছেন।

আট

সাঁওতাল সম্প্রদায় এককালে অরণ্যে স্বাধীন জীবনযাপন করত। তাদের রাজা ছিল, রাজ্য ছিল। শিকার আর কৃষির ওপর নির্ভর করে দূরন্ত সাহসী আর কঠোর পরিশ্রমী এই সাঁওতালরা শান্তিতেই ছিল। তাদের এই গৌরবময় অতীতের কথা স্মরণ করে তারা এখনো বেদনা অনুভব করে। বেঁচে থাকার প্রয়োজনীয় উপকরণ তারা আসুরিক শক্তি দিয়ে অরণ্য থেকেই সংগ্রহ করে নিত। তাদের জীবনে অভাব ছিল শুধু লবণের। কিন্তু একদা তথাকথিত সভ্য মানুষের ভরসায়, সভ্য মানুষের সঙ্গ লাভের প্রত্যাশায় প্রলোভনে পড়ে সাঁওতালরা অরণ্য ঘেরা পাহাড় থেকে সমতলে নেমে এসেছে ; কঠিন ঊষর মাটিকে করেছে উর্বর, চাষোপযোগী। আর ইতিহাসের ওই সময়পর্ব থেকেই তারা আর্থনীতিক শোষণের শিকার হয়েছে। তাদের প্রতি বিস্তারিত হয়েছে হিংস্র স্বার্থলোভীদের থাবা। সভ্য মানুষরা স্বার্থ সিদ্ধির জন্য তাদের অমানবিকভাবে ক্রীতদাসে পরিণত করেছে। সাঁওতালদের দিয়ে জমি তৈরি করিয়ে নিয়ে তারা অবশেষে কেড়ে নিয়েছে তাদের জমি। অরণ্য জীবনে যতটুকু হলে বেঁচে থাকা যায়, সেই আরণ্যক স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে কোন প্রকারে বনের ফলমূল সংগ্রহ করে এবং পশুপাখি, জন্তু-জানোয়ার শিকার করে তা আগুনে পুড়িয়ে তার ক্ষুণ্নিবৃত্তি পূরণ করে। তাদের সাদামাটা জীবনে চাহিদাও অত্যন্ত সীমিত। তথাপি প্রাণপ্রাচুর্যের অভাব নেই সাঁওতালদের। সভ্য মানুষের সংলগ্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক জটিল আর্থনীতিক মারপ্যাঁচে ও শোষণকৌশলে সাঁওতালদের জীবন হয়ে ওঠে বিপর্যস্ত। ব্রিটিশ শাসনামলে ইংরেজদের কর সংগ্রহের কৌশলগত কারণে এদের সমতলে নামিয়ে আনা হয় জমির লোভ দেখিয়ে। অসুর বিক্রমে পাহাড় কেটে, কাঁকর সরিয়ে তারা তৈরি করে দেয় খাস জমি। কিন্তু খাজনা দেওয়ার কথা না থাকলেও তাদের বসতবাটী ও কৃষিজমির ওপর খাজনা আরোপ করা হয়। মহাজন ও জমিদারশ্রেণি তাদের শোষণের প্রক্রিয়া শুরু করে নির্মমভাবে। এভাবেই যখনই সাঁওতালেরা আধুনিক জীবনের জটিলতায় প্রবেশ করে, তখন থেকেই তাদের অবস্থা খারাপ হতে থাকে। বেঁচে থাকার জন্য খাবার আর লজ্জা

Dhaka University Institutional Repository

নিবারণের জন্য এক টুকরো কাপড় হলেই যাদের চাহিদা মিটে যায়, তাদেরকে স্বীয় জীবনধারা থেকে কৌশলে টেনে আনা হয়েছিল অর্থনৈতিক শোষণের জন্য। সাঁওতালরা নিজেদের ধান বিক্রি করবার সময় ওজনে বেশি দিত, কিন্তু যে-কোনো দ্রব্য ক্রয় করবার সময় মহাজনেরা কম দিত ওজনে। এর জন্য দুই ধরনের বাটখারা রাখত মহাজনেরা। বাটখারার নাম ছিল বেচারাম-কেনারাম। চড়া সুদে মহাজনরা সাঁওতালদের টাকা ধার দিত। দশ টাকা ধার নিলে একজন মানুষ সুদে-আসলে সে টাকা বংশ পরম্পরায়ও শোধ করতে পারত না। ফলে সাঁওতালদের ক্রীতদাস হিসেবে থাকতে হতো বংশানুক্রমে। ইংরেজ শাসক, জমিদার, মহাজন ও শাসক প্রতিনিধি মহেশ দারোগাসহ সবাই সাঁওতালদের আর্থনীতিকভাবে শোষণ করত। এক কেড়ে ঘি বিক্রি করে এক সের লবণ পেতনা সাঁওতালেরা। একটি পুঁতির মালা কিংবা একটি নাকছাবি কেনার স্বপ্ন সাঁওতাল নারী বা যুবকের স্বপ্নপূরণ হয় না মাসব্যাপী সঞ্চিত অনেক জিনিস বিক্রি করেও। তাই এক কেড়ে ঘি, এক আটি ময়ূরের পালক ও শিকার করা বাঘের নখ বিক্রি করেও সিধু আড়াই সেরের বেশি লবণ পায়নি। সিধু স্ত্রীর জন্য হাঁসুলী, সন্তানদের জন্য বালা কিনতে পারেনি। শুধু ঘুরেছে আর দেখেছে— 'দোকানে দোকানে কত জিনিস। কত রং কত সুন্দর। কিন্তু তাদের পয়সা নেই। শুধু দেখেই বেড়ালে।' [৩৫] এই ছিল তাদের আর্থনীতিক অবস্থা। সাঁওতালদের আর্থনীতিক অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায় দশ টাকায় একজন মানুষ বিক্রি হয়ে যাওয়ার ঘটনায় এবং বেচারাম-কেনারামের প্রবর্তন থেকে।

নয়

সাঁওতালরা কৃষিজীবী বলেই ভূমির প্রতি তাদের দুর্নিবার আকর্ষণ। পাহাড়ের যেখানেই সুবিধামত জায়গা পাওয়া যায় সেটুকুকেই তারা চাষযোগ্য করে নেয়। পরিশ্রমী হিসাবেও তাদের জুড়ি নেই। *কালিন্দী* উপন্যাসে তারাশঙ্কর সাঁওতালদের সম্পর্কে লিখেছিলেন —'সত্য সত্যই উহারা মাটির কীট। মাটিতেই উহাদের জন্ম, মাটি লইয়াই কারবার, মাটিই উহাদের সব।' [৩৬] মাটির টানেই পাহাড় থেকে সমতলে নেমে এসেছিল সাঁওতালরা। বিহারের ভাগলপুর জেলার আশেপাশে ও বীরভূমের উত্তর পর্যন্ত অসংখ্য গ্রাম তৈরি করেছিল সাঁওতালেরা। 'পাহাড়ের কোলে কোলে বসতি স্থাপন করলে— অসংখ্য গ্রাম গড়ে উঠল। গড়লে তারাই। বন কাটলে সূর্যের আলোকে করলে অবারিত; উঁচু নিচু মাটি কেটে করলে সমতল। পাহাড়ের ঝর্ণাকে পাথর দিয়ে বেঁধে করলে জলাধার। চারি পাশ থেকে বাঘ ভালুক তাড়ালে। সরীসৃপ মারলে— তাদের হঠালে। পাথর কাঁকর মেশানো জমিকে অসুর বিক্রমে কর্ষণে কর্ষণে উর্বর করলে।'[৩৭] কিন্তু তারা জানল না এত পরিশ্রমে গড়া জমি তাদের নিজেদের নয়। ১৮৫৪-৫৫ সালে ডালহৌসী ব্রহ্মদেশ পর্যন্ত হাত বাড়িয়ে ভারতবর্ষ জয় সুসম্পন্ন করলেন। পরে, কৌশলী ইংরেজরা রাজস্ব বৃদ্ধির লক্ষ্যেই অরণ্য অঞ্চলের দিকে হাত বাড়ায়। সাঁওতালদের পাহাড় থেকে জমির লোভ দেখিয়ে সমতলে টেনে আনা হয় এই উদ্দেশ্যে। কিন্তু সাঁওতালদের তৈরি জমি যখন উর্বরতায় পূর্ণতা পেয়েছে তখনই মধ্যস্বত্বভোগী জমিদার-মহাজন শ্রেণি তা কেড়ে নিতে চেয়েছে নানা কৌশলে। এক পুরুষের কঠোর পরিশ্রমে তৈরি জমি পরবর্তী পুরুষরা ভোগ করতে পারেনি কখনোই। বারবার তারা নিজেদের জমি থেকে উৎখাত হয়েছে। *কালিন্দী* উপন্যাসেও আমরা দেখতে পাই সাঁওতালরা নতুন জেগে ওঠা চরের ঘাস কেটে পরিষ্কার করে কঠোর পরিশ্রমে গোটা চরটাকেই সুফলা করে তোলে। সদগোপ চাষীরা

Dhaka University Institutional Repository

যেখানে ভয়ে প্রবেশ করতে পারে না, সেখানে সাঁওতালরা সাপ, বাঘ, জন্তু-জানোয়ার পোকা-মাকড় তাড়িয়ে বসতি স্থাপন করে। কিন্তু দুই জমিদারের দ্বন্দ্বের সুযোগে নব্য ব্যাবসায়ীর কূটচালে নিজেদের গড়া পৃথিবী থেকে উন্মূলিত হয়ে পড়ে সাঁওতালরা। শত শত বছর ধরে সরল সাঁওতালদের সাথে চলে আসছে এমনই আচরণ। সভ্য জাতির শোষণ ও আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তারা পাহাড়ের ধারে জমি তৈরি করে কৃষিকাজে মনোনিবেশ করে বার বার ; কিন্তু তারা অচিরেই প্রত্যক্ষ করে স্বার্থলোভী নির্মম অত্যাচিরীর হস্ত। নিজেদের তৈরি ভূমিতে স্বাধীন বসবাসের অধিকার হারিয়েছে তারা বারবার। রুক্ষ কঠিন মাটি আর ভয়ানক অরণ্যই তাদের প্রাণপ্রিয় ভূমি। সেই ভূমির ওপর আরোপিত কর বছরে বছরে বৃদ্ধি পেয়েছে বহুগুণ। সারল্য, কর্মনিষ্ঠা এবং শ্রমবলিষ্ঠতাই তাদের জন্য কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে। সবাই কেবল স্বার্থের জন্য তাদের প্রতি শোষণের হাত বাড়িয়েছে। অত্যাচার এবং শোষণের মাত্রা ক্রমে কেবল বৃদ্ধিই পেয়েছে। বেনিয়া ইংরেজ রাজত্বের সীমানা বৃদ্ধি, ব্যবসার প্রসার ও রাজস্ব বৃদ্ধির লক্ষ্যে সাঁওতালদের ব্যবহার করেছে শ্রমদাস হিসাবে। ভূমি তৈরির পরই তারা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে সাঁওতালদের। ফলত পিতৃ-পুরুষের প্রিয় অরণ্য-অঞ্চলের অধিকার ও স্বাধীন জীবন যাপনের অধিকার হারিয়ে সাঁওতাল সম্প্রদায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে ; নিজেদের অরণ্যভূমি রক্ষার্থে বিদ্রোহী হতে বাধ্য হয়েছে। *অরণ্য-বহ্নি*-র ঐতিহাসিক বিদ্রোহী সিধু বলে, 'ই আমাদের দেশ বটে। এ দেশটো আমাদের। ই আমাদের দেশ আমরা লিব।— আমাদের দেশ ইটো। সিধুর সঙ্গে সঙ্গে কানু একসাথে বলে উঠল— হঁ, ইটো আমাদের দেশ বটে। আমাদের দেশ।' [৩৮] 'হা, তাদের সে— পূর্বে এই গঙ্গা নদী— দক্ষিণে হুই বর্ধমানের এলাকায় দিকুদের এলাকা— এর মধ্যে এই পাহাড় জঙ্গল বনবাদাড়, নদীনালা, মাঠঘাট, ক্ষেতখামার, গাছপালা জন্তুজানোয়ার পাখি ফড়িং— সব তাদের। সব তাদের। হ্যাঁ, তাদের।' [৩৯]

দশ

মাটির মতো নিরীহ, শান্ত, নিরক্ষর অরণ্যবাসী সাঁওতালদের শোষণ করে সভ্য জগতের সবাই। মহাজন, জমিদার, ইংরেজ শাসক ও শাসন-সহায়ক দারোগা নানা প্রক্রিয়ায় শোষণ নির্যাতন চালিয়েছে নির্বোধ শান্তিপ্রিয় এই আদিবাসীদের ওপর। সাঁওতালদের হাজার বছরের ইতিহাস শুধুই বঞ্চনা আর নির্যাতনের ইতিহাস। কেনারাম ভক্ত আর তার জ্ঞাতি ভাই মহেন্দর ভক্ত— এই দুই মহাজন হিসেবের জটিলতায় ফেলে নিঃস্ব করে দিয়েছিল সাঁওতালদের। দেনার দায়ে এদের ক্রীতদাসে পরিণত করা হয়েছিল। কেনারামের বাড়িতে অর্ধশতাধিক সাঁওতাল ক্রীতদাস ছিল। সুদের অংকটা এমনভাবে কষা হতো যাতে একজন সাঁওতালের ঋণ কখনোই শোধ না হয়। অত্যাচারের ভয়ে তারা কিছুই বলতে পারত না। ভক্তের বাড়িতে থাকত পশ্চিমা দারোয়ান। 'এই যে আশে পাশে দেখছেন সাঁওতালরা কাজ করছে — জনকতক উপু হয়ে হাতজোড় করে বসে আছে, এরা সবাই হল কেনারামের দাদন দেনার মুনিষ। বাবু, দাদন দেনার মুনিষ হল কেনা মুনিষ। দশ টাকা ধার নিলে একটা মুনিষ জনমকার মতো বিকিয়ে যেত; টাকায় মাসে ছ' আনা সুদ, সে সুদ আসলে ভুক্তান হয়ে তের টাকা বারো আনা। পরের মাসে কুড়ি টাকার কাছ বরাবর পৌঁছুত। ফের মাসে কুড়ি টাকা হত সাতাশ টাকা চার আনা। এই শোধ দিতে সাঁওতালরা মহাজন বাড়ি খাটতো পেটভাতা। মজুরি নগদা নাই। তার মানে আজীবন টাকা শোধ হত না ; মরলেও না ; তার ছেলে পিলেদের শোধ দিতে হত। পালাবার জো ছিল না ; তখন জঙ্গিপুরে 'মুনসুবি' (মুনসেফী)

Dhaka University Institutional Repository

আদালত, সেখানে নালিশ ডিক্রি করে, পরওয়ানা এনে গ্রেপ্তার করে জেল খাটাতো। মহেশ দারোগা তার কনেস্টেবল নিয়ে এসে বেঁধে নিয়ে যেত। কেনারাম দশ টাকা তাকে নজরানা দিয়ে সেলাম করত।'[৪০] সর্বত্রই এই অবস্থা বিরাজমান ছিল। জমিদার-রাজা সাঁওতালদের ওপর উদ্ধত হস্ত। সাঁওতাল শ্রমিকদের খাটিয়ে মজুরি দিত না ঠিকমত। —

কেনারাম এক নয় — প্রতি গাঁয়ে গাঁয়ে রয় —
জুড়ে সারা দেশময় এই এক হাল
বামুন কায়েত বদ্যি ধনে মানে যার বৃদ্ধি
সব এককার।[৪১]

সাঁওতাল মুনিষরা মহাজনদের বাড়িতে ও দোকানে কাজ করত। এমন কোনো সুযোগই তারা পেত না যাতে অতিরিক্তি খেটে ঋণশোধ করতে পারে। নিমু হাঁসদা তেমনি মুনিষ হিসেবে ভক্তের বাড়িতে ছেলে ও বউসহ দিনমান খেটেও কেবল খাওয়ার জন্য ধান পেত। অমানুষিক পরিশ্রম করানো হত এসব দাদন দেনার মুনিষদেরকে দিয়ে।

এর মধ্যে কখনো প্রাকৃতিক দুর্যোগে ফসল নষ্ট হলে সাঁওতালরা মহাজনদের কাছ থেকে ধান ধার নিত বাধ্য হয়ে। সুদ-আসলে খাতার মহাজনি জটিল হিসাব বর্বর অশিক্ষিত সাঁওতালদের বোঝার সাধ্য ছিল না। আকাড়ার বছর ভীম মাঝি কেনারামের কাছ থেকে বার শালি ধান নিয়েছিল। এক বছরে সুদে আসলে তা পরিণত হয়েছিল একশ শালিতে। ভীম মাঝির জমিও অনেক ছিল, ধানও ভাল হয়েছিল। হিসাব মতো একশো শালি ধান পরিশোধও করেছিল সে ভক্তকে। তারপরও ওই বছর ভীম মাঝি দুটি ধানের গোলা বেঁধেছিল। কেনারাম ওই সংবাদ শুনে দু-মাস পরে এসেই ভীম মাঝির কাছে আবার একশো শালি ধান চাইল। 'ভীম বললে— সি কি ভকত, সিদিন যি দিলাম তোকে এতশো শালি। ভকত বললে— তা দিলি, সি তো তু তিন বছর আগে যে ধান লিয়েছিলি, তার দরুণ বাকি ছিল আধ শালি— সি তুকে বলেছিলম আর দিতে পারব নাই গ! সিবার আট শালিতে তুকে একশো শালি দিলম। আধ শালি বলেছিলাম দুব নাই। ভকত বললে— তু বললি আমি বলি নাই। সিটো খাতায় লেখা ছিল আমার মনে ছিল নাই। ইবার ধান গিয়ে গিয়ে খাতা লিখতে গিয়ে দেখি সেই আধ শালি ফ বছরে একশো শালি হয়ে হাঁ করে রয়েছে। তুর ইবারকার একশো শলি যেমন লিখলাম ওমনি পুরনো হিসাবে গিলে দিলে। কি করব? খাতার হিসেব সি যদি খেয়ে দেয় তো আমি কি করব। এখন সেটোই শোধ গেল, ইবারের একশো শালি আবার ই কতমাসে বাড়ল। বেড়ে দেড়শো শালি ছড়ায়ে গেইছে হে। তু তো ধরম মানিস। লক্ষ্মীর খাতা— সে খাতা খেয়ে দিলে আমি কি করব। তাকে খেতে দিতে কোথা থেকে ধান আনব।...— আবার একশো শালি দিব তো খাব কি গো ভকত? ভকত বললে— আবার লিবি। দিব। আর না-হয় তো তুর জমিন চার বিঘে লিখে দে! কি গো সব মাঝিরা বল কেনে, আমি অধরমের বাত বললম?'[৪২] ভীম মাঝি প্রতিবাদ করল। কেনারাম গরু, মহিষ, ধান একটা কিছু নিয়েই যেতে চাইল। সে ভীমের ধান, গরু, কাড়া ক্রোক করল। হয় ধান নং জমি, একটা কিছু সে চায়ই। কিন্তু ভীম জোর করে তাড়িয়ে দিল কেনারামকে। কেনারাম বারহেটে তার জ্ঞাতিভাই মহিন্দর ভকতের কাছে গেল এবং পরামর্শ

Dhaka University Institutional Repository

করে আদালতের ক্রোক পরওয়ানা নিয়ে এল। মহেশ দারোগা ভীমকে ধরে নিয়ে গিয়ে ঢুকিয়ে রাখল জেলে। এভাবেই সাঁওতালদের ওপর চক্রাকারে নেমে এসেছে নির্যাতনের ওপর নির্যাতন।

সিভিল সার্ভিসের পুরোনো লোক মিস্টার পোটেন্ট। সাঁওতালরা তাকে মান্য করে। তিনিও সাঁওতালদের প্রতি কিঞ্চিৎ সহানুভূতিশীল ছিলেন। তাই তারা পোটেন্ট সাহেবের কাছে ভট্টাচার্যের দ্বারা লিখিত অভিযোগ জানিয়ে দরখাস্ত করে। হাজার হাজার সাঁওতাল সমবেত হয়ে তার কাছে অভিযোগ জানায়। কিন্তু তাদের অভিযোগ যথাস্থানে পৌঁছায় না। কোনো প্রতিকার তারা পায় না। ভীম মাঝির ছেলে বলে — 'আমার বাবাকে জেহেলে লিয়ে গ্যেল। মিছামিছি জেহেলে লিয়ে গ্যেল। ছেড়ে দে। উকে ছেড়ে দে।'[৪৩] বারহেটের গর্ভু মাঝি জানাল— 'আমার জামন গুলান সব লিয়ে লিলে। আমি কিছু ধারি না। তবু লিলে। আমি লিই নাই। তবু জঙ্গিপুরের তুদের মুনসবি প্যায়াদা এসে বুললেক— হাঁ তু টাকা লিলি। আদালতের হাকিম বুলেছে তু লিলি। এই লিখে দিছে। সঙ্গে সঙ্গে আর একজন নয়, দুই তিন চার পাঁচ দশ বিশ পঞ্চাশ একশো পাঁচশো সাঁওতাল উঠে দাঁড়াল। তারা সবাই বলবে। তাদের বুকের তুষানল আজ বাতাসে জ্বলে উঠতে চাচ্ছে। তারা বলবে।'[৪৪] এভাবেই জীবনের চারদিক থেকে সাঁওতালদের প্রতি নিক্ষিপ্ত হয়ে শোষণের বিচিত্র বিষাক্ত তীর।

ব্রিটিশ শাসকশ্রেণি, মহাজন-জমিদার শ্রেণির হাতেই ছেড়ে দিয়েছিল দরিদ্র নিরীহ সাঁওতালদের। সে যুগে জমিদার মহাজনরাই ছিল কৃষকের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। ব্রিটিশামলে ফসলের পরিবর্তে নগদ অর্থে রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা থাকায় সাঁওতালরা মহাজনদের কাছ থেকে অর্থ ঋণ নিতে বাধ্য হত। এই সুযোগে মহাজনেরা অধিক সুদে টাকা ধার দিয়ে সাঁওতালদের ফসল ও সম্পত্তি কেড়ে নিত। কারণ আইনে ঋণগ্রস্ত কৃষকের সম্পত্তি ক্রোকের ব্যবস্থা ছিল। ঋণ নিলেই সাঁওতালেরা শোষণের জালে আটকা পড়ত সারা জীবনের জন্য। আবার ঋণ না নিলেও তারা রক্ষা পেত না। এমন অবস্থাপন্ন সাঁওতালও ছিল যাদের গরু ধান সবই ছিল। ঋণ নেওয়ার প্রয়োজনও ছিল না, নেয়ওনি। কেনারাম মহাজনের লোভ ছিল পীপড়ার হাড়মা মুর্মুর জমির ওপর। তাই কৌশলে জঙ্গিপুরের কোর্ট থেকে তার সব কিছুর ওপর ক্রোক করার আদেশপত্র নিয়ে এসেছিল। ভীম মাঝির মতো তাকেও বেঁধে নিয়ে যায় মহেশ দারোগা। তারাশঙ্করের *কালিন্দী* উপন্যাসেও আমরা লক্ষ করি মিল মালিক ও মহাজনরা সাঁওতালদের বহু কষ্টে গড়া চরের ভূমি থেকে তাদেরকে উৎখাত করে।

দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে ইংরেজ মিশনারিরা সাঁওতালদের ধর্মান্তরিত করছিল। উজ্জ্বল পোশাক-পরিচ্ছদ, শ্রমিকের কাজ ও খাবারের লোভ দেখিয়ে তারা নিজস্ব সংস্কৃতি ও বিশ্বাসপ্রিয় একাংশ সাঁওতালদের খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত করছিল। খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করলে তাদেরকে রেলপথ তৈরির শ্রমিক হিসেবে কাজ দিত ইংরেজরা। নগদ মজুরির লোভে অনেকেই বেঁচে থাকার তাগিদে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিল। সেখানে সাঁওতাল নারীরা ইংরেজ কর্মচারির দ্বারা শারীরিক নির্যাতন, এমনকী ধর্ষণের শিকারও হয়। তাই সাঁওতালরা পোটেন্ট সাহেবের কাছে আর্তনাদ করে উঠেছিল— 'দিকুরা আমাদিগে চুষে খেলেক, পিষে মেলেক, পাদরীরা আমাদের জাত লিলেক, ধরম ইজ্জত লিলেক রাস্তাবন্দির সায়েবরা।[৪৫] ইংরেজ শাসনের মহিমায় জমিদার মহাজন পেয়াদা পুলিশ ম্যাজস্ট্রেট সকলে মিলে নিরীহ ও হতদরিদ্র এই আদিবাসীদের ওপর নির্মম অত্যাচার ও শোষণ চালিয়েছিল। ইংরেজরা শোষণে এদেরকে সাহায্য করেছিল। কেননা, এরাই ছিল ইংরেজদের শাসনের হাতিয়ার।

Dhaka University Institutional Repository

অরণ্য-বহ্নি উপন্যাসে আছে যে, সাঁওতালদের নেতা সিধু-কানু দেবতার নির্দেশ পায় এসব অত্যাচারিত মানুষ উদ্ধারের। হাজার বছরের নিপীড়িত সাঁওতালদের জাগিয়ে তোলে তারা। দিকে দিকে তারা বিদ্রোহের বাণী প্রচার করতে থাকে। ক্লান্ত শ্রান্ত অত্যাচারিত যে সাঁওতালরা বন্য প্রাণীর সাথে সংগ্রাম করে এবং আরণ্য-সম্পদকে অবলম্বন করে সহজ-সরল জীবনর নিয়ে বেঁচেছিল, সেই নির্যাতিত গোষ্ঠী মুক্তির আহ্বানে উত্তাল হয়ে উঠেছিল সেদিন। ১৮৫৪-৫৫ সালে অত্যাচারের সীমা অতিক্রম করলে হাজার হাজার সাঁওতাল বিদ্রোহে মেতে ওঠে। রুকনী-টুকনী-মানকীকে ইংরেজরা অপহরণ করলে তাদের উদ্ধারের মাধ্যমেই সূচনা ঘটে সাঁওতাল বিদ্রোহের। হাজার হাজার সাঁওতাল দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত বেদনায় উন্মত্ত হয়ে ওঠে ; অকাতরে প্রাণ বিসর্জন দিতে থাকে। কিন্তু আত্মসমর্পণ করেনি তারা কখনো। আধুনিক প্রশিক্ষিত ইংরেজ সৈন্যদের অস্ত্রের বিরুদ্ধে তীর-ধনুক-টাঙ্গি-তলোয়ার নিয়ে অসীম সাহসের সঙ্গে বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধ করেছে তারা। বিশ্ববিজয়ী ইংরেজ বাহিনী নিরীহ, নির্বোধ সাঁওতালদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছে সর্বশেষে। সংস্কারাচ্ছন্ন আদিম বিশ্বাস-নির্ভর হাজার হাজার সাঁওতালকে কৌশলে সমতলে নামিয়ে এনে নির্বিচারে পাখির মত গুলি করে হত্যা করেছিল তারা। যুদ্ধে সাঁওতালরা পরাজিত হয়েছিল কিন্তু আত্মসমর্পণ করেনি। মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও এগিয়ে গেছে তারা মহাবিক্রমে। নিজেদের পরিচিত পাহাড়ি অঞ্চলে সাঁওতালরা গেরিলা কায়দায় যুদ্ধ করে ইংরেজ বাহিনীকে প্রথম দিকে বিপর্যস্ত করে দিচ্ছিল। সম্মুখ যুদ্ধেও বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিল তারা। কিন্তু শেষপর্যন্ত তাদেরকে ইংরেজের চাতুরীর কাছেই পরাজিত হতে হয়। ফলত, ঘটে ইতিহাসের এক নৃশংস ঘটনা। একজন ইংরেজ কর্নেল তীর-ধনুক, টাঙ্গি, তলোয়ারধারী অশিক্ষিত, অন্ধ ধর্মবিশ্বাসী সাঁওতালদেরকে নির্বিচারে হত্যা সম্বন্ধে লিখেছেন— 'There was not a single sepoy in the war who did not feel ashamed of himself.'[৪৬] এই ঘৃণ্য সংগ্রামপুরের যুদ্ধে কানু নিহত হল গুলিতে, সিধু আহত হয়ে কয়েক দিন পর ধরা পড়ে। পরে ফাঁসি হয় তার। এভাবেই ঘটে ঐতিহাসিক সাঁওতাল বিদ্রোহের পরিসমাপ্তি।

এগার

১৭৫৭ সালে পলাশীর প্রান্তরে বাংলার স্বাধীনতা অপহৃত হওয়ার পর ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুগের পর যুগ ছোট ছোট বিদ্রোহ হয়েছে। এর কোনোটি পরিপূর্ণভাবে সফল হতে পারেনি কিংবা সত্যিকারের গণজাগরণ সৃষ্টি করতে পারেনি। কারণ এগুলি সংঘবদ্ধ ও পরিকল্পিত আন্দোলন ছিল না। ১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তিতে ওইসব বিদ্রোহের কোনো প্রত্যক্ষ অবদান না থাকলেও মূলত এসব আন্দোলনই ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের পথকে প্রশস্ত করেছিল। ওই দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে ১৮৫৪-৫৫ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহের রয়েছে গভীর একটি রাজনৈতিক তাৎপর্য। সাঁওতাল বিদ্রোহ কেবল একটি আদিবাসী গোষ্ঠীর অধিকার আদায়ের সংগ্রাম ছিল না। এমনকী দেশীয় জমিদার মহাজনদের বিরুদ্ধেই তাদের বিদ্রোহ সীমাবদ্ধ ছিল না। ইংরেজ শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রাম ও নিজস্ব স্বদেশচেতনাও এই আন্দোলনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিল। কারণ ইংরেজদের বিরুদ্ধে সাঁওতালদের যুদ্ধের প্রেরণা-উৎস ছিল স্বদেশচেতনা। আর চূড়ান্ত যুদ্ধ তারা ইংরেজদের বিরুদ্ধেই করেছিল। দীর্ঘদিনের বঞ্চনা ও ভূমির প্রতি অধিকারহীনতায় স্বাধীনতাপ্রিয় সাঁওতালরা বিদ্রোহ করেছিল। *অরণ্য-বহ্নি* উপন্যাসের পটচিত্র প্রদর্শক ও বর্ণনাকারী নয়ন পালের জ্যেষ্ঠ পিতৃব্য নফর পালও সাঁওতালদের সাথে একত্র ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল। সিউড়ী আদালতে তার সাত বছরের জেল

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছিল। অন্যদিকে, তারাশঙ্করের *কালিন্দী* উপন্যাসে ভিন্ন প্রেক্ষাপটে হলেও সোমেশ্বর চক্রবর্তী সাঁওতালদের নিয়ে যুদ্ধ করেছিলেন ওই স্বাধীনতার চেতনা থেকেই। সোমেশ্বরের মতো সভ্য জগতের মানুষদেরও রাজনৈতিক চেতনায় ঘা দিতে সক্ষম হয়েছিল আরণ্যক সাঁওতালদের বীরত্বপূর্ণ বিদ্রোহ। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না, এরই ধারাবাহিকতায় প্রভাবিত হয়েছে ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিদ্রোহসহ পরবর্তী অন্যান্য ইংরেজ-বিরোধী আন্দোলন। মূলত সাঁওতাল বিদ্রোহের অন্তর্নিহিতহিত দেশপ্রেমের চেতনাই এ-সকল আন্দোলনকে উজ্জীবিত করতে সহায়তা করেছিল। সাঁওতাল বিদ্রোহের সঙ্গে যুক্ত সেনানীদের দেশপ্রেমের রোমাঞ্চকর অনুভবের প্রমাণ মেলে *অরণ্য-বহ্নি* উপন্যাসে : 'চমকে উঠল বিশু। শুধু বিশু কেন, সিধু কানু— নিজেরা বলেও নিজেরাই এ-কথায় চমকে উঠল— আমাদের দেশ। বুলা বাবা বোঙ্গা, বুল! সেই রাত্রির অন্ধকারে নিজেদেরই এই আশ্চর্য কথা দুটি তাদের সারা অন্তরে চকিত একটি বিদ্যুৎরেখা টেনে দিয়ে মেঘের ডাকের মত বেজে উঠল— ই আমাদের দেশ।'[৪৭] এ-প্রসঙ্গে ডক্টর ভীষ্মদেব চৌধুরী বলেন— 'ভারতীয় উপনিবেশে অসংস্কৃত আদিবাসী সাঁওতালদের ওপর সামাজিক নিপীড়নের প্রতিক্রিয়ায় রাষ্ট্রশক্তির প্রতিভূস্থানীয়দের বিরুদ্ধে সংঘটিত এই সংঘবদ্ধ বিদ্রোহের পশ্চাতে সুসংঘটিত রাজনৈতিক বোধ সক্রিয় না থাকলেও নিপীড়নমূলক পরিবেশে সীমাবদ্ধ ভৌগোলিক বা আঞ্চলিক স্বাধীনতা-প্রাপ্তির স্পৃহা সাঁওতাল মানসিকতায় বর্তমান ছিল।'[৪৮]

'সাঁওতাল বিদ্রোহের পশ্চাতে ছিল জমির ওপর একচ্ছত্র অধিকার প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা এবং তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল সাঁওতালদের স্বাধীনতার স্পৃহা, যার ফলে তারা ধ্বনি তুলেছিল : 'নিজ দলপতির অধীনে সাঁওতাল রাজ্য চাই।'[৪৯] সাঁওতালরা স্বাধীনভাবে বাঁচার আর স্বাধীন সাঁওতাল রাজ্যের দাবি তুলেছিল। আর দেশীয় মহাজন-জমিদার এবং ব্রিটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে অপরিসীম বীরত্বে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। ওল্ডহাম লিখেছেন, 'পুলিশ ও মহাজনের অত্যাচারের স্মৃতি যাদের দেশপ্রেম জাগিয়ে তুলেছিল, আন্দোলন তাদের সকলকেই আকৃষ্ট করল, কিন্তু যে মূল ভাবধারাকে কাজে পরিণত করবার চেষ্টা চলছিল তা ছিল সাঁওতাল অঞ্চল ও সাঁওতাল রাজ্য প্রতিষ্ঠার চিন্তা।'[৫০] ১৮৫৫ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহের পূর্বেও বাংলাদেশ ও ভারতের বহু স্থানে অনেক আদিবাসী বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল। কিন্তু ইংরেজদের ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছিল এই সাঁওতাল বিদ্রোহ।

সাঁওতাল বিদ্রোহের রাজনৈতিক তাৎপর্য অনুধাবন করা যায় বিদ্রোহ-পরবর্তী ইংরেজ শাসন-কৌশল এবং দেশীয় গণমানুষের সংগ্রামী চেতনার ইতিহাস লক্ষ করলে। বাস্তব ইতিহাসে আমরা দেখতে পাই ১৮৫৫ সালের পর ইংরেজ শাসক শ্রেণি সাঁওতালদের জন্য সাঁওতাল পরগণা প্রতিষ্ঠা করে। সাঁওতাল বিদ্রোহের পূর্ব পর্যন্ত শাসকগোষ্ঠী এদের ঐক্যের শক্তিকে অনুধাবন করতে না পারলেও বিদ্রোহের পর তাদের আধিকার বিষয়ে কিছুটা সচেতন হয়েছিল। তাই ১৮৫৭ সালে মুন্ডা বিদ্রোহ দমনে ইংরেজরা ছিল আরও বেশি সতর্ক ও যত্নবান। কিন্তু তাদের এই সচেতনতা সত্ত্বেও এ সময় সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়েই জাতীয়তাবাদী চেতনার আবাহন অনিবার্য হয়ে উঠছিল। এমনকী বাংলার নির্যাতিত কৃষকসমাজও এই কালে শোষণ নির্যাতনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ওঠার চেষ্টা করে। সাঁওতাল বিদ্রোহ এভাবে যুগে যুগে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও অধিকার আদায়ের সংগ্রামে প্রেরণা সঞ্চার করেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় আদিবাসীরা বৃটিশ শাসকদের এদেশ থেকে বিতাড়নের আহ্বান জানিয়েছে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুকে।[৫১]

Dhaka University Institutional Repository

সাঁওতালরা বুঝতে সক্ষম হয়েছিল তাদের জীবনের সীমাহীন দুঃখ-দুর্দশা ও বঞ্চনার জন্য বিদেশী শাসক ও দেশীয় জমিদার-মহাজনদের শোষণই দায়ী। তাই তারা ব্রিটিশ রাজশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল ; চরম আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে শাসক শ্রেণির ঘৃণ্য স্বেচ্ছাচারিতার স্বরূপ জনসমক্ষে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছিল। খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষও সেদিন একারণেই সাঁওতালদের পতাকাতলে সামিল হয়েছিল। শোষণ উৎপীড়ন ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সাঁওতালদের এই সংগ্রাম সমস্ত বঞ্চিত ও স্বাধীনতা-প্রিয় মানুষকে একসূত্রে গ্রথিত করার প্রেরণা যুগিয়েছিল। অগণ্য সাঁওতালের বিদ্রোহ এবং সাঁওতাল নেতাদের বীরত্বপূর্ণ অবদান ভারতীয় রাজনৈতিক ইতিহাসের এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়।

বারো

পৃথিবীর সব আদিবাসীদের সাধারণ প্রত্যাশা হচ্ছে নিজস্ব অঞ্চল,সংস্কৃতি ও জীবনধারার মধ্যে স্বাধীনভাবে বাস করার অধিকার। তথাকথিত সভ্য সমাজ ও সভ্যতার জটিলতা থেকে তারা চিরকালই দূরে থাকতে চেয়েছে। এভাবেই তারা দীর্ঘ দিন নিজেদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছিল। প্রকৃতির খাঁটি সন্তান আদিবাসীরা অকৃপণ প্রকৃতির স্বস্থানে বসবাসে তুষ্ট এবং প্রকৃতির কোলে জীবনাবসানে পরিতৃপ্ত। অথচ সভ্যতা ও সভ্য মানুষের সংস্পর্শে এসেই এইসব আদিম জনজাতির পরিবর্তন ঘটেছে। সাঁওতালরাও এর ব্যতিক্রম নয়। *অরণ্য-বহ্নি* উপন্যাসে আমরা দেখতে পাই পাহাড়ের মাথায় সাঁওতালদের সুখ সমৃদ্ধপূর্ণ যে আরণ্যক জীবন ছিল তার জন্য তারা আক্ষেপ করেছে। আবার একইভাবে সেইসব সোনালি দিনের জন্য তারা গর্বও অনুভব করে। কৃষিজীবী এই আরণ্য-সন্তানেরা বারবার নানাভাবে সভ্য মানুষের দ্বারা প্রতারিত ও বঞ্চিত হয়েছে। আদিবাসী মানুষদের ওপর তথাকথিত সভ্য মানুষের শোষণ, নির্যাতন, ভিন্ন সংস্কৃতির মিশ্রণ, ধর্মান্তরিতকরণ প্রভৃতি অপকৌশল তাদেরকে বিরূপ অভিজ্ঞতায় ভারাক্রান্ত করেছে। পাহাড় থেকে সমতলে নেমে এসে দরিদ্র সাঁওতালরা আরও বেশি দরিদ্র হয়েছে ; ছিটকে পড়েছে কৃষিকাজ থেকে, নিযুক্ত হয়েছে মহাজন-জমিদারদের কৃষি শ্রমিক, গৃহপরিচারণা কিংবা দোকান ও ব্যবসার কাজে। এভাবেই কৃষিজীবী সাঁওতালরা দাসত্বপূর্ণ শ্রমজীবন গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে।

ইংরেজরা এদেশে তাদের শাসন ও শোষণের বুনিয়াদ শক্ত করার জন্য রেলপথ তৈরি করেছিল। সাঁওতালরা অত্যধিক পরিশ্রমী বলেই রেলপথ নির্মাণের কাজে তাদের কদর ছিল। কম মুজুরি দিয়ে এদের খাটানো সহজ ছিল। কর্মহীন দরিদ্র মানুষদের নগদ মুজুরির লোভ দেখিয়ে স্বীয় পেশা থেকে টেনে আনা হয় নির্মাণ শ্রমিক হিসাবে। রাস্তাবন্দির কাজে এসে সাঁওতালদের মধ্যে পরিবর্তন ঘটতে থাকে। হাতে আসা কাঁচা পয়সা তাদের মানসিকতা ও জীবনধারায় এনে দেয় এই পরিবর্তন।। ইংরেজ কর্মচারিরা দরিদ্র সাঁওতালদের কাজ ও পয়সা দিয়ে বশীভূত করল। তাদের মর্যাদা, অধিকার সম্ভ্রম সবই লুণ্ঠিত হতে থাকল ক্রমে ক্রমে। বেঁচে থাকার তাগিদে একাংশ সাঁওতাল আধুনিক কূটকৌশলী আর্থনীতিক শক্তির কাছে বাধ্য হয়েই স্বীকার করে নিয়েছিল পরাভব।

বহিরারোপিত সংস্কৃতি ও আগ্রাসনের ফলে বারবার সাঁওতালদের জীবনে নেমে এসেছে দুঃখ,দারিদ্র্য ও হতাশা। *কালিন্দী* উপন্যাসেও আমরা লক্ষ করি শোষণ ও আগ্রাসনের ফলে সাঁওতালরা নিজেদের গড়া চর থেকে কীভাবে বিতাড়িত হয় তার মর্মন্তুদ দৃশ্য। যন্ত্রমালিক বিমলবাবু কৌশলে কালিন্দীর চর দখল করে নিলে সাঁওতালদের নিজেদের গড়া চর থেকে একদিন চলে যেতে বাধ্য হয়। পরিশ্রমী ও সৎ সাঁওতালদের

Dhaka University Institutional Repository

জীবনে দারিদ্র্যের নির্মম কষাঘাতে তাদের নৈতিকতার অবক্ষয় ঘটে। তাই কমল মাঝি আক্ষেপ করে অহীন্দ্রকে বলে— 'ইয়ারা সব আর সি সাওতাল নাই। ইয়ারা মিছা কথা বলে, কাজ করতে গিয়ে গেরস্তকে ঠকায়, খাটে না, ইয়ারা লেভী হইছে। পাপ হইছে উয়াদের। উয়ারা খেপতে পারবে না। উয়ারা ধরম লষ্ট করলে'। [৫২] সাঁওতালদের এই পরিবর্তন ঘটেছে বাহিরারোপিত আগ্রাসন ও সংস্কৃতিরই প্রভাবে। সেজন্যই সাঁওতাল কন্যা সারি মিল মালিক বিমলবাবুর রক্ষিতা হয় নির্দ্বিধায়। টাকা পেয়ে তার স্বামী ও পিতামহ পালিয়ে যায় রাতের অন্ধকারে বিনা প্রতিবাদে। কাঁচা টাকার লোভে কৃষিকাজ ছেড়ে তারা বিমলবাবুর মিলে কাজ করতেই বেশি আগ্রহী হয়।

কালিন্দী উপনস্যাসে আমরা সাঁওতালদের যে পরিবর্তন লক্ষ করি তা মূলত শুরু হয়েছিল *অরণ্য-বহ্নি* থেকেই। *কালিন্দী* ও *অরণ্য-বহ্নি* উপন্যাস দুটিতে বহিরারোপিত সংস্কৃতি ও তার আগ্রাসন কৌম-জীবনকে কীভাবে বিপর্যস্ত করেছিল তার বিশ্বস্ত চিত্র তুলে ধরেছেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। আগ্রাসনের ফলে তাদের সমাজ সংস্কৃতি মূল্যবোধ অর্থনীতি ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকারের বিবর্তনের পরিচয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে *অরণ্য-বহ্নি* -তে।

ক্লান্ত শ্রান্ত অত্যাচারিত যে কৌমজীবন শত শত বছর ধরে একমুঠো অন্ন, বনজ ফল ও শিকারের উপর নির্ভর করে বেঁচেছিল , বহিঃশক্তির প্রভাবে তাদের জীবন বিপন্ন হয়ে গেল। তারা উন্মূলিত হয়ে গেল নিজস্ব জীবন ও সংস্কৃতি থেকে। শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তারা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল। স্বাধীন সরল ও প্রত্যয়ী অনন্য জীবনীশক্তি সম্পন্ন এক কৌমগোষ্ঠী হারালো তাদের নিজেদের সংস্কৃতি ও আত্মপ্রত্যয়। তবু পরাজিত হয়েও ঐতিহসিক বিদ্রোহের মধ্যে তারা যে স্ফুলিঙ্গ-বীজ বপন করে রেখেছে স্বজাতির ভাবীকালের মানুষের জন্য নিশ্চয়ই তা এক অনিঃশেষ প্রেরণা-উৎস।

তথ্যনির্দেশ

[১] ত রাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়; *অরণ্য-বহ্নি* ;, তারাশঙ্কর রচনাবলী, অষ্টাদশ খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ভাদ্র ১৩৮৭, কলকাতা, পৃ. ৩২৩

[২] তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়; *অরণ্য-বহ্নি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২৩

[৩] *অরণ্য-বহ্নি* উপন্যাসে তারাশঙ্কর ১৮৫৪ সালের ঘটনা বর্ণনা করেছেন এবং ১৮৫৪ সালে সাঁওতাল বিদ্রোহের কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু সিধু-কানুর নেতৃত্বে প্রকৃত সাঁওতাল বিদ্রোহ প্রকাশ পায় ১৮৫৫ সালে। এ প্রসঙ্গে ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে লিখেছেন: '৩০ জুন ১৮৫৫— ভগনাডিহি গ্রামে বিশাল জনসমাবেশে সিধু-কানুর ভাষণ এবং শোষণহীন স্বরাজ প্রতিষ্ঠার জন্য দশ হাজার সাঁওতালের শপথ গ্রহণ। কলিকাতা অভিমুখে প্রথম গণ-পদযাত্রা। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রথম গণ-পদযাত্রা। (দ্র. ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে ; *সাঁওতাল গণসংগ্রামের ইতিহাস* ; পার্ল পাবলিশার্স, পঞ্চম পরিবর্ধিত সংস্করণ, ১৯৯৬, পৃ. ১৪৫)

[৪] তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়; *অরণ্য-বহ্নি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩৮

[৫] ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে ; *সাঁওতাল গণসংগ্রামের ইতিহাস* , পূর্বোক্ত, পৃ. ৬

[৬] ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে ; পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৯

[৭] তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়; *অরণ্য-বহ্নি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭৩

[৮] তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়; *অরণ্য-বহ্নি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮৫

[৯] তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়; *অরণ্য-বহ্নি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪৭

[১০] তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়; *অরণ্য-বহ্নি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭৪

[১১] তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়; *অরণ্য-বহ্নি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪৭

[১২] 'সিধু কানু হুকুম দিয়ে কেটেছিল। ছেলেও কেটেছে বাবু। তবে মেয়ে কাটা শুনি নাই।' তারাশঙ্কর

[১৩] তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়; *অরণ্য-বহ্নি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩৭-৩৮

বন্দ্যোপাধ্যায়; *অরণ্য-বহ্নি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩৬

Dhaka University Institutional Repository

[১৪] তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়; *অরণ্য-বহ্নি*, পূর্বোক্ত, পৃ.
[১৫] তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়; *কালিন্দী*, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, দ্বাদশ মুদ্রণ, ভাদ্র ১৪০৫, কলকাতা, পৃ. ৬৯
[১৬] তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়; *অরণ্য-বহ্নি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭০-৭২
[১৭] তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়; *অরণ্য-বহ্নি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭২
[১৮] তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়; *অরণ্য-বহ্নি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১৭
[১৯] তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়; *অরণ্য-বহ্নি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২৫
[২০] তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়; *অরণ্য-বহ্নি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২৭
[২১] তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়; *অরণ্য-বহ্নি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬৬
[২২] তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়; *অরণ্য-বহ্নি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭৭
[২৩] তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়; *অরণ্য-বহ্নি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩৭
[২৪] তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়; *অরণ্য-বহ্নি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫১
[২৫] তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়; *অরণ্য-বহ্নি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪২
[২৬] তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়; *অরণ্য-বহ্নি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২৪
[২৭] তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়; *অরণ্য-বহ্নি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩৭
[২৮] তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়; *অরণ্য-বহ্নি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪২
[২৯] তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়; *অরণ্য-বহ্নি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২৬
[৩০] তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়; *অরণ্য-বহ্নি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩৩
[৩১] তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়; *অরণ্য-বহ্নি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২৭
[৩২] তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়; *অরণ্য-বহ্নি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২৮
[৩৩] তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়; *অরণ্য-বহ্নি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩০
[৩৪] ডক্টর সমরেশ মজুমদার; *কালিন্দী*, , পৃ.১০৬
[৩৫] তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়; *অরণ্য-বহ্নি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫৫
[৩৬] তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়; *কালিন্দী*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৭
[৩৭] তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়; *অরণ্য-বহ্নি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮২
[৩৮] তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়; *অরণ্য-বহ্নি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০৭-৮
[৩৯] তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়; *অরণ্য-বহ্নি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২৩
[৪০] তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়; *অরণ্য-বহ্নি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩৬-৩৭
[৪১] তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়; *অরণ্য-বহ্নি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩৭
[৪২] তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়; *অরণ্য-বহ্নি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬৩
[৪৩] তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়; *অরণ্য-বহ্নি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯১
[৪৪] তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়; *অরণ্য-বহ্নি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯১
[৪৫] তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়; *অরণ্য-বহ্নি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯০-৯১
[৪৬] তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়; *অরণ্য-বহ্নি*, পূর্বোক্ত, পৃ. অ-৪৪৬
[৪৭] তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়; *অরণ্য-বহ্নি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০৭-৮
[৪৮] ভীষ্মদেব চৌধুরী; *তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস : সমাজ ও রাজনীতি*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্র.প্র. ১৯৯৮, পৃ. ২৭১
[৪৯] ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে ; *সাঁওতাল গণসংগ্রামের ইতিহাস* , পূর্বোক্ত, পৃ. ৫
[৫০] ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে ; পূর্বোক্ত, পৃ. ৫
[৫১] পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭
[৫২] তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়; *কালিন্দী*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭১

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

ভারতবর্ষীয় কৌমসমাজ ও সংস্কৃতি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস-সাহিত্যের অন্যতম বিশিষ্ট প্রসঙ্গ। রাঢ় অঞ্চলের বিভিন্ন আদিবাসী জনগোষ্ঠীর বিবর্তনশীল জীবনপ্রবাহের সঙ্গে যে সখ্য ও নিবিড়তা তিনি আশৈশব লালন করে এসেছিলেন, ওই সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতার জগৎ বারবার তাঁর কথাসাহিত্যে নানাভাবে শিল্পিত হয়েছে। বর্তমান অভিসন্দর্ভে আলোচিত তিনটি উপন্যাস *হাঁসুলী বাঁকের উপকথা*, *নাগিনী কন্যার কাহিনী* এবং *অরণ্য-বহ্নি* এই অভিজ্ঞতা-লালিত অনুভবের উল্লেখযোগ্য স্মারক।

বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক-সত্তা সচেতনভাবে সমাজবিজ্ঞান ও নৃবিজ্ঞানের প্রায়োগিক দর্শনকে আয়ত্ত না করেও সৃষ্টিশীল প্রেরণা ও স্বোপার্জিত অভিজ্ঞতার বলে সমাজসত্য ও সমাজরূপকে এমনভাবে শিল্পের সামগ্রী করে তুলতে সক্ষম হন যে, মনে হয় তিনি বুঝি ওই জ্ঞানশাখারই বিশেষজ্ঞ কিংবা গবেষক। তারাশঙ্করের উল্লিখিত তিনটি উপন্যাসে ভারতীয় উপমহাদেশের তিনটি আদিবাসী কৌম জনগোষ্ঠীর জীবন এমন বিশ্বস্তরূপে চিত্রিত ও উপস্থাপিত হয়েছে যে, সমাজবিজ্ঞানী ও নৃবিজ্ঞানীরাই আজ আকর-উৎসরূপে গ্রন্থত্রয়কে বিবেচনা করছেন। ফলে, গোষ্ঠীজীবন নির্ভর সাহিত্য রচনায় তারাশঙ্করের সৃজনকৌশলটি সাহিত্যগবেষণার ক্ষেত্রে আরও নিগূঢ়ভাবে অনুশীলন করবার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। বর্তমান অভিসন্দর্ভে দেখনো হয়েছে যে, সমাজ-নৃবিজ্ঞান আর জীবনসত্যের সংযোগ ঘটায় আলোচ্য তিনটি উপন্যাস আদিবাসী মানুষের বিশ্বস্ত দর্পণ হয়ে উঠেছে। আদিবাসী মানুষকে তারাশঙ্কর অবলোকন করেছেন গভীর মমতায়, তাদের জীবনচর্যার নিয়ত পালাবদলকে তিনি উপলব্ধি করেছেন পূর্ণ নিরাসক্তিতে। ফলে, তাঁর উপন্যাসে আদিবাসী কৌম জনগোষ্ঠীর জীবনের রূপায়ণ হয়ে উঠেছে সমাজ ও সময়গতির অকপট ভাষ্য।

বর্তমান অভিসন্দর্ভে ভারতবর্ষীয় কৌম মানবগোষ্ঠী সম্পর্কে তারাশঙ্করের দৃষ্টিভঙ্গির বৈশিষ্ট্য ও বিশেষত্ব তুলে ধরা হয়েছে। তারাশঙ্কর তাঁর স্বোপার্জিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার বৈভব দিয়ে তিনটি আদিবাসী জনগোষ্ঠী— কাহার, বেদে এবং সাঁওতাল জাতিসত্তার উৎস, বিকাশ ও পরিণতির ঐতিহাসিক ধারক্রমকে চিহ্নিত করেছেন। বিশেষত, উল্লিখিত কৌম গোষ্ঠীসমূহের সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় বিবর্তনধারা উপস্থাপনে অভিজ্ঞ তারাশঙ্কর অনেক বেশি নিবিড়, সূক্ষ্ম এবং আন্তরিক। ফলে, ভারতবর্ষীয় কৌমসমাজের অসম্পূর্ণ ইতিহাসের সম্পূরক সংযোজন হিসেবেও তারাশঙ্করের অভিজ্ঞতাঋদ্ধ কাহার, বেদে কিংবা সাঁওতালদের জীবনচর্যার রূপায়ণ গুরুত্ববহ।

অভিসন্দর্ভে আলোচিত প্রথম উপন্যাস *হাঁসুলী বাঁকের উপকথা*-য় উপস্থাপিত হয়েছে ভারতবর্ষের অন্যতম ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী কাহারদের সভ্যতার আলোকবঞ্চিত জীবনপ্রবাহ, দৈবনির্ভর জীবনবোধ আর এরই সমান্তরালে বৈশ্বিক টানাপোড়েন। এই জটিল সমাজ-বাস্তবতাকে তারাশঙ্কর কোন দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যবেক্ষণ করেছেন তা বিশ্লেষণ করে অভিসন্দর্ভে দেখানো হয়েছে যে, দ্বিতীয় বিশ্বযদ্ধের ভয়ঙ্কর বাস্তবতা, বহিরারোপিত আগ্রাসন এবং নগদ অর্থের প্রলোভন প্রাচীন এই উপকথা-নিয়ন্ত্রিত কৌমগোষ্ঠীর বিলয়কে কীভাবে অনিবার্য করে তুলেছে। দ্বিতীয় উপন্যাস *নাগিনী কন্যার কাহিনী*-তে তারাশঙ্কর

Dhaka University Institutional Repository

ভারতবর্ষের আরেক অবলুপ্তপ্রায় জনগোষ্ঠী বিষবেদেদের সমাজ উৎকেন্দ্রিক জীবনপ্রবাহের গতি, প্রকৃতি ও স্বরূপ নিরূপণ করেছেন। স্বকীয় লোকপুরাণ, লোককথা ও উপকথা নিয়ন্ত্রিত এই স্বাধীনচেতা গোষ্ঠীর যাযাবর জীবনই চূড়ান্ত নিয়তি। বিপদজনক জীবন ও পেশায় নিয়োজিত এই কৌমের জীবনকথার রূপায়ণে তারাশঙ্কর যে দক্ষতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তা তুলনাতীত। *নাগিনী কন্যার কাহিনী* উপন্যাসে বিষবেদে কৌমের জীবন ও সমাজমূলে প্রবেশ করে ওই গোষ্ঠীর জীবনসত্যকে তারাশঙ্কর আবিষ্কার করেছেন এবং তাদের অণুপুঙ্খ ও অকৃত্রিম জীবনপট নির্মাণ করেছেন। তৃতীয় উপন্যাস *অরণ্য-বহ্নি*-তে ঐতিহাসিক সাঁওতাল বিদ্রোহ বা গণসংগ্রামের কথা ও কাহিনী, ঔপনিবেশিক শাসনামলের নির্মম প্রতিক্রিয়া এবং তার প্রভাবে গোষ্ঠীমানসে জেগে ওঠা দ্রোহ ও দেশচেতনার মধ্যে এক অবিনাশী আশাবাদ ব্যক্ত করতে চেয়েছিলেন তারাশঙ্কর। কিন্তু দলীয় রাজনৈতিক আদর্শের কারণেই *অরণ্য-বহ্নি* শেষপর্যন্ত সংগ্রামী কৌমজনতার মুক্তির শিল্প না হয়ে, ইতিহাস রাজনীতি কল্পনা ও পুরাণের মিশ্রণে একটি আকর্ষণীয় রোমান্সে পরিণত হয়েছে। তবে এই উপন্যাসেও তারাশঙ্কর আদি সাঁওতাল জাতিগোষ্ঠীর জীবনের অণুপুঙ্খ বিবরণ, বিশেষত তাদের নৃতাত্ত্বিক উৎস-পরিচয়, স্বকীয় জীবনচর্যা, ধর্ম, সংস্কৃতি, অর্থনীতি এবং প্রাতিস্বিক দেশচেতনাকে অসামান্য নৈপুণ্যে রূপায়ণ করেছেন। সাঁওতালদের জীবনের রূপায়ণ-সূত্রে তারাশঙ্কর দেখাতে চেয়েছেন এই আদিম নৃ-গোষ্ঠীর মানুষের অদম্য সংগ্রামী মানসিকতা, স্ব-সংস্কৃতি ও স্বাধিকার রক্ষায় তাদের আপসহীন প্রত্যয়ের কথা।

সভ্যতাগর্বী নাগরিক মানুষই ভারতবর্ষীয় আধুনিক রাষ্ট্রসমূহের কর্ণধার। উপমহাদেশীয় আদিবাসী কৌম জনগোষ্ঠী সভ্যতার সুষম আলোকবঞ্চিত হয়ে উপজাতি নামক বৈষম্যমূলক অভিধাতেও আজ অনেক ক্ষেত্রে চিহ্নিত হচ্ছে। যারা প্রকৃত আদিবাসী, স্বভূমে কিংবা স্বদেশে তারাই আজ 'পরবাসী'। কথাশিল্পী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় আলোচ্য তিনটি উপন্যাসে অকৃত্রিম দরদ ও মমতা দিয়ে ভারতবর্ষীয় তিন কৌম জনগোষ্ঠীর যে জীবনরূপ অঙ্কন করেছেন তা অকৃত্রিম এবং ক্ষেত্রবিশেষে আদি জাতিগোষ্ঠীর ভবিষ্যৎ মুক্তির সংকেতেও ঋদ্ধ।

◎

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট

Dhaka University Institutional Repository

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনপঞ্জি

১৮৯৮ ৮ শ্রাবণ (২৩ জুলাই) সূর্যোদয়ের পূর্ব-লগ্নে পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলার লাভপুর গ্রামে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় জন্ম গ্রহণ করেন। ব্রাহ্মমুহূর্তে জন্ম বলে শাস্ত্রমতে জন্মদিন ৭ শ্রাবণ। তাঁর পিতার নাম হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (জ. ১১ পৌষ ১২৭১-মৃ. ১৩১২), জননী প্রভাবতী দেবী (১২৮৭-১৩৭৬), মাতামহ চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। তাঁর পিতামহের নাম দীনদয়াল বন্দ্যোপাধ্যায় (মৃ. ৭ অগ্রহায়ণ ১৩০১), পিতামহী : মানদাসুন্দরী ; প্রপিতামহের নাম রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রপিতামহী উমাময়ী দেবী।

১৯০৩ হাতেখড়ি।

১৯০৫ পিতৃবিয়োগ।

১৯১৪-১৫প্রবেশিকা পরীক্ষায় অকৃতকার্য।

১৯১৫-১৬ লাভপুর যাদবলাল এইচ. ই. স্কুল থেকে মেট্রিকুলেশন পাশ। প্রথমে কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে এবং পরে সাউথ সাব আরবান কলেজে ভর্তি হন। শারীরিক অসুস্থতা ও রাজনৈতিক কারণে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা অসমাপ্ত থেকে যায়।
১২ মাঘ (২৬ জানুয়ারি) স্বগ্রামের বন্ধু লক্ষ্মীনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের বোন উমাশশীর সঙ্গে পরিণয়বদ্ধ হন। স্ত্রীর ডাক নাম ফন্টি।

১৯২১ সক্রিয়ভাবে অহিংস-অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে গান্ধীবাদে দীক্ষিত হন।

১৯২৭ নিজের সহ-সম্পাদনায় লাভপুর থেকে মাসিকপত্র পূর্ণিমা প্রকাশ লাভ করে। পত্রিকাটির ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় স্বরচিত প্রথম গল্প 'মুকুন্দের মজলিশ'-এর প্রকাশিত হয়।

১৯২৮ 'কল্লোল' পত্রিকার ফাল্গুন ১৩৩৪ সংখ্যায় গল্প "রসকলি", কালিকলম পত্রিকায় *চৈতালী ঘূর্ণি*-র "বীজগল্প" "শ্মশানের পথে"র প্রকাশ।

১৯২৯-৩০ 'উপাসনা' পত্রিকায় পর্যায়ক্রমে চৈতালী ঘূর্ণি প্রকাশিত (কার্তিক-চৈত্র ১৩৩৬) হতে থাকে।

১৯৩০ আইন-অমান্য আন্দোলনে অংশ নিয়ে কারাবরণ। ডিসেম্বর (১৯৩০) জেল থেকে মুক্তিলাভ। সক্রিয় রাজনীতির সংস্রব বর্জন এবং সাহিত্য-সাধনার মাধ্যমে দেশ হিতৈষণার সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

১৯৩১-৩২ বোলপুরে প্রেস প্রতিষ্ঠা।
বীরভূম ষড়যন্ত্র মামলার সাক্ষী হওয়ায় সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে পরিচয়। সুভাষচন্দ্রের অসাধারণ ব্যক্তিত্বে অভিভূত হন তারাশঙ্কর।

১৯৩২-৩৩ প্রথম রবীন্দ্রসাক্ষাৎ লাভ।
নিজের প্রেসে সরকার-বিরোধী প্রচারপত্র ছাপার অভিযোগে জারি করা মামলায় তিরস্কৃত হন। বন্ড প্রদান সাপেক্ষে প্রেস চালু রাখার আদেশ। সুভাষচন্দ্রের নির্দেশে সরকারকে বন্ড না দেওয়ার এবং প্রেস প্রত্যাহার উঠিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ।
"শনিবারের চিঠি" পত্রিকার সহকারী সম্পাদক পদে যোগদান।
কলকাতার মনোহরপুকুর সেকেন্ড লেনে টিনের ছাউনি দেয়া ঘর ভাড়া করে বসবাস।

১৯৪২-৪৩ ফ্যাসি-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৪৭-৪৮ ১৫ আগস্ট ১৯৪৭ তারিখে মা, পিসিমা এবং গ্রামবাসীর আহ্বানে লাভপুরে স্বাধীন ভারতের পতাকা উত্তোলন।

হাঁসুলী বাঁকের উপকথা উপন্যাস রচনার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শরৎ-স্মৃতি পদক (১৯৪৭) প্রদান করে সম্মানিত করেন।

১৯৪৮-৪৯ ৩০ জানুয়ারি ১৯৪৮ তারিখে মহাত্মা গান্ধীর হত্যাকাণ্ডে গভীরভাবে হতাশ এবং মর্মাহত হন।

সন্দীপন পাঠশালা উপন্যাসের চলচ্চিত্র প্রদর্শনের জন্য মুক্তিলাভ। চলচ্চিত্রটিতে মাহিষ্য-সম্প্রদায়কে হীনভাবে উপস্থাপন করার অভিযোগে ২৩ চৈত্র (১০ এপ্রিল ১৯৪৯) তারিখে হাওড়ার মাহিষ্য-সম্প্রদায়ের বিক্ষুব্ধ জনতার হাতে শারীরিকভাবে আহত ও লাঞ্ছিত হন।

১৯৫২ ১ এপ্রিল ১৯৫২ তারিখে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সদস্য মনোনীত হন।

১৯৫৪-৫৫ ৭ শ্রাবণ তারিখে জননী প্রভাবতী দেবীর কাছ থেকে দীক্ষাগ্রহণ করেন।

১৯৫৫-৫৬ *আরোগ্য-নিকেতন* উপন্যাসের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রদত্ত রবীন্দ্র-স্মৃতি পুরস্কার লাভ।

১৯৫৯-৬০ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক 'জ গত্তারিণী পদক' প্রদান।

বিধান সভার সদস্যপদ থেকে অবসর গ্রহণ (মার্চ ৩১, ১৯৬০)।

রাজ্যসভার সদস্য হিসেবে রাষ্ট্রপতির মনোনয়ন লাভ (এপ্রিল ১, ১৯৬০) ও শপথ গ্রহণ।

১৯৬০ হাওড়ার মাহিষ্য সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে নাগরিক সংবর্ধনা প্রদান।

লাভপুরবাসী কর্তৃক সংবর্ধনা প্রদান।

১৯৬২-৬৩ ভারত সরকারের দেওয়া (১৯৬২) 'পদ্মশ্রী' উপাধিতে সম্মানিত।

১৯৬৪ ১৪-২৩ আগস্ট কলকাতার একাডেমী অব্ ফাইন আর্টস ভবনে তারাশঙ্কর-অঙ্কিত চিত্রাবলি ও কাটাকুটায় নির্মিত মূর্তির প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত।

১৯৬৫-৬৬ রাজ্যসভার পদ থেকে অবসর গ্রহণ।

নাগপুরে অনুষ্ঠিত নিখিলভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে সভাপতির দায়িত্বলাভ।

১৯৬৭-৬৮ 'জ্ঞানপীঠ পুরষ্কারে' সম্মানিত। 'কলকাতা কর্পোরেশন' প্রদত্ত নাগরিক সংবর্ধনা।

১৯৬৮-৬৯ ভারত স রকার কর্তৃক 'পদ্মভূষণ' উপাধি প্রদান (১৯৬৮)।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সম্মানসূচক ডি. লিট. ডিগ্রি প্রদান (১৯৬৮)।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত সম্মানসূচক ডি.লিট ডিগ্রি প্রদান (১৯৬৯)।

ডিসেম্বর ৬, ১৯৬৯ তারিখে জননী প্রভাবতী দেবীর জীবনাবসান।

১৯৬৯-৭০ সাহিত্য অকাদেমির ফেলোশিপ লাভ (১৯৬৯)।

নকশালবাদীদের হত্যা পরিকল্পনায় তারাশঙ্করের নাম অন্তর্ভুক্ত।

১৯৭১ বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে জনমত গঠনে অংশগ্রহণ। আমৃত্যু 'বাংলাদেশ সহায়ক শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী সমিতি'র সভাপতির দায়িত্ব পালন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রথম উপন্যাস *একটি কালো মেয়ের কথা* রচনা ও প্রকাশ।

ভাদ্র ২৮, ১৩৭৮ ; সেপ্টেম্বর ১৪, ১৯৭১ তারিখ মঙ্গলবার সকাল ৬.৪২ মিনিটে মৃত্যু।

তথ্য-উৎস

আমার কথা : ('শনিবারে চিঠি', জ্যৈষ্ঠ-ভাদ্র ১৩৭১) : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
আমার কালের কথা : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
আমার পিতা তারাশঙ্কর : সরিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

আমার সাহিত্য জীবন : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
'উষালোকে' : নব পর্যায় চতুর্থ সংখ্যা ।। জানুয়ারি-মার্চ ২০০৬
গ্রামের চিঠি : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
তারাশঙ্কর : রচনাবলী প্রথমখণ্ড-চতুর্বিংশ খণ্ড
তারাশঙ্কর-স্মৃতিচারণ : (কলকাতা : মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ১৪০৯) : বাণী রায়
ভীষ্মদেব চৌধুরী : তারাশঙ্কর বনেদ্যাপাধ্যায়ের উপন্যাস : সমাজ ও রাজনীতি (১৯৯৮)
'শনিবারের চিঠি' : তারাশঙ্কর সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৭১
'সাহিত্য ও সংস্কৃতি' : তারাশঙ্কর স্মৃতি সংখ্যা ১৩৯৯
Tarashankar Bandyopadhyay : Mahasveta Devi

Dhaka University Institutional Repository

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থপঞ্জি

১৯২৬ *ত্রিপত্র* (কাব্যগ্রন্থ) ; প্র. প্র. : ১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯২৬।

১৯৩১ *চৈতালী ঘূর্ণি* (উপন্যাস) ; প্র. প্র. : অক্টোবর ১৯৩১, আশ্বিন ১৩৩৮।

১৯৩৩ *নীলকণ্ঠ* (উপন্যাস) ; প্র. প্র. : অক্টোবর ১৯৩৩, আশ্বিন ১৩৪০। প্রকাশক ; গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স, কলকাতা।

পাষাণপুরী (উপন্যাস) ; প্র. প্র. : জুলাই ১৯৩৩, আষাঢ় ১৩৪০। প্রকাশক : বর্মন পাবলিশিং হাউজ, কলকাতা।

১৯৩৫ *রাইকমল* (উপন্যাস) ; প্র. সং. : আশ্বিন ১৩৪১। প্রকাশক : শ্রী সজনীকান্ত দাস, রঞ্জন প্রকাশনালয়, কলকাতা।

১৯৩৬ *প্রেম ও প্রয়োজন* (উপন্যাস) ; প্র. প্র. : জুলাই ১৯৩৬, আষাঢ় ১৩৪২। প্রকাশক : বরেন্দ্রনাথ ঘোষ, ২০৪, কর্নওয়ালিস স্ট্রিট, কলকাতা।

১৯৩৭ *জলসাঘর* (ছোটগল্প সংকলন) ; প্র. প্র. : শ্রাবণ ১৩৪৪।

আগুন (উপন্যাস) ; প্র. প্র. : সেপ্টেম্বর ১৯৩৭ (১৩৪৪)।

১৯৩৯ *রসকলি* (ছোটগল্প সংকলন) ; প্র. প্র. : বৈশাখ ১৩৪৫ (১৩৩৯)।

ধাত্রী দেবতা (উপন্যাস) ; প্র. প্র. : আশ্বিন ১৩৪৬ (১৯৩৯)। প্রকাশক : রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, কলকাতা।

১৯৪০ *কালিন্দী* (উপন্যাস) ; প্র. প্র. : ভাদ্র ১৩৪৭ (১৯৪০)। প্রকাশক : কাত্যায়নী বুক স্টল, কলকাতা।

বেদেনী (ছোটগল্প সংকলন) ; প্র. প্র. : আশ্বিন ১৩৪৭। প্রকাশক : ভারতীভবন, কলকাতা।

১৯৪২ *কবি* (উপন্যাস) ; প্র. প্র. : ১৩৪৮ (মার্চ ১৯৪২)। প্রকাশক : কাত্যায়নী বুক স্টল, কলকাতা।

তিনশূন্য (ছোটগল্প সংকলন) ; প্র. প্র. : ১৯৪২।

কালিন্দী (নাটক) ; প্র. প্র. : ১৯৪২। কালিন্দী-র নাট্যরূপকে চলচ্চিত্ররূপ দেন নরেশ মিত্র।

দুই পুরুষ (নাটক) ; প্র. প্র. : আষাঢ় ১৩৪৯ (১৯৪২)। প্রকাশক : রঞ্জন পাবলিশিং হাউজ, কলকাতা।

১৯৪৩ *পথের ডাক* (নাটক) ; প্র. প্র. ফাল্গুন ১৩৪৯ (১৯৪৩)। প্রকাশক : কাত্যায়নী বুক স্টল, কলকাতা।

গণদেবতা (উপন্যাস) ; প্র. প্র. : ২০ কার্তিক ১৩৫০ (১৯৪৩)। প্রকাশক : শান্তিরঞ্জন সোম, ৬৭ সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট, কলকাতা।

প্রতিধ্বনি (ছোটগল্প সংকলন) ; প্র. প্র. : ১৯৪৩। উৎসর্গ : জগদ্বন্ধু দত্ত।

দিল্লী কা লাড্ডু (ছোটগল্প সংকলন) ; প্র. প্র. : ১৯৪৩।

১৯৪৪ *মন্বন্তর* (উপন্যাস) ; প্র. প্র. : ১৩৫০ (জানুয়ারি ১৯৪৪)। প্রকাশক : মিত্রালয়, কলকাতা।

পঞ্চগ্রাম (উপন্যাস) ; প্র. প্র. : মাঘ ১৩৫০ (১৯৪৪)। প্রকাশক : কাত্যায়নী বুক স্টল, কলকাতা।

যাদুকরী (ছোটগল্প সংকলন) ; প্র. প্র. : ফাল্গুন ১৩৫০ (১৯৪৪)।

স্থলপদ্ম (ছোটগল্প সংকলন) ; প্র. প্র. : ১৯৪৪।

১৩৫০ (ছোটগল্প সংকলন) ; প্র. প্র. : অগ্রহায়ণ ১৩৫১ (১৯৪৪)।

১৯৪৫ *বিংশ শতাব্দী* (নাটক) ; প্র. প্র. : মাঘ ১৩৫১ (১৯৪৫)।

চকমকি (প্রহসন) ; প্র. প্র. : ১৯৪৫। প্রকাশক : মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা।

দ্বীপান্তর (নাটক) ; প্র. প্র. : ১৩৪৫।

প্রসাদমালা (ছোটগল্প সংকলন) ; প্র. প্র. : ১৯৪৫।

হারানো সুর (ছোটগল্প সংকলন) ; প্র. প্র. : ১৯৪৫।

১৯৪৬ *সন্দীপন পাঠশালা* (উপন্যাস) ; প্র. প্র. : মাঘ ১৩৫২ (১৯৪৬)।

ঝড় ও ঝরাপাতা (উপন্যাস) প্র. প্র. : অগ্রহায়ণ ১৩৫৩ (নভেম্বর ১৯৪৬)। প্রকাশক : বসুমতী সাহিত্য-মন্দির,কলকাতা।

অভিযান (উপন্যাস) ; প্র. প্র. : পৌষ ১৩৫৩ (১৯৪৬)। প্রকাশক : মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা।

১৯৪৭ *ইমারত* (ছোটগল্প সংকলন) ; প্র. প্র. : ১৯৪৭। উৎসর্গ : বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

রামধনু (ছোটগল্প সংকলন) ; প্র. প্র. : ১৯৪৭।

তারাশঙ্করের শ্রেষ্ঠগল্প ; প্র. প্র. : ১৯৪৭।

শ্রীপঞ্চমী (ছোটগল্প সংকলন) ; প্র. প্র. : ১৯৪৭। প্রকাশক : মিত্রালয়, কলকাতা।

হাঁসুলী বাঁকের উপকথা (উপন্যাস) প্র. প্র. : আষাঢ় ১৩৫৪ (১৯৪৭)

১৯৪৮ *সন্দীপন পাঠশালা* (কিশোর সংস্করণ) ; প্র. প্র. : ১৯৪৮।

Dhaka University Institutional Repository

তামস তপস্যা (উপন্যাস) ; প্র. প্র. : ১৩৫৪ বঙ্গাব্দ (১৯৪৮)। প্রকাশক : মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা।

১৯৪৯ *কামধেনু* (ছোটগল্প সংকলন) ; প্র. প্র. : ১৯৪৯ (ভাদ্র ১৩৫৫)।

১৯৫০ *পদচিহ্ন* (উপন্যাস) প্র. প্র. : বৈশাখ ১৩৫৭ (এপ্রিল ১৯৫০) প্রকাশক : কাত্যায়নী বুক স্টল, কলকাতা।

মাটি (ছোটগল্প সংকলন) প্র. প্র. : ১৯৫০।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠগল্প (বাছাই গল্প-সংগ্রহ) ; প্র. প্র. : ১৯৫০।

১৯৫১ *আমার কালের কথা* (আত্মজীবনী) প্র. প্র. : বৈশাখ ১৩৫৮ (১৯৫১)।

যুগবিপ্লব (নাটক) ; প্র. প্র. ১৯৫১। প্রকাশক : ক্যাতয়নী বুক স্টল, কলকাতা।

১৯৫২ *উত্তরায়ণ* (উপন্যাস) ; প্র. প্র. : ১৯৫২। প্রকাশক : মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা।

শিলাসন (ছোটগল্প সংকলন) ; প্র. প্র. : ১৯৫২।

১৯৫৩ *নাগিনী কন্যার কাহিনী* (উপন্যাস) ; প্র. প্র. : আশ্বিন ১৩৫৯। প্রকাশক : ডি. এম. লাইব্রেরী, কলকাতা।

আরোগ্য নিকেতন (উপন্যাস) ; প্র. প্র. : চৈত্র ১৩৫৩ (এপ্রিল ১৯৫৩)। প্রকাশক : বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা।

বিচিত্র স্মৃতি কাহিনী (স্মৃতিকথা) ; প্র. প্র. : ১৯৫৩।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রিয়গল্প (বাছাই গল্প-সংগ্রহ) ; প্র. প্র. ১৯৫৩।

১৯৫৪ *আমার সাহিত্যজীবন* ১ম খণ্ড (আত্মজীবনী) ; প্র. প্র. : শ্রাবণ ১৩৬০। প্রকাশক : বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা।

স্বর্গ-মর্ত (উপন্যাস) প্র. প্র. : ১৯৫৪। প্রকাশক : ডি. এম. লাইব্রেরী, কলকাতা।

স্ব-নির্বাচিত গল্প (গল্প সংকলন) ; প্র. প্র. : ১৯৫৪।

১৯৫৫ *চাঁপাডাঙার বৌ* (উপন্যাস) : প্র. প্র. : শ্রাবণ ১৩৬১। প্রকাশক [?]।

গল্প সঞ্চয়ন (বাছাই গল্প-সংগ্রহ) : প্র. প্র. : ১৯৫৫

বিস্ফোরণ (ছোটগল্প সংকলন) ; প্র. প্র. ১৯৫৫। প্রকাশক : বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা।

১৯৫৬ *কৈশোর স্মৃতি* (স্মৃতিকথা) : প্র. প্র. : ১৯৫৬।

বিচারক (উপন্যাস) ; প্র. প্র. : শ্রাবণ ১৩৬৩ (আগস্ট ১৯৫৬)। প্রকাশক : তুলিকলম, কলকাতা।

পঞ্চপুত্তলী (উপন্যাস) ; প্র. প্র. : ভাদ্র ১৩৬৩। প্রকাশক : ডি. এম. লাইব্রেরী, কলকাতা।

ছোটদের শ্রেষ্ঠগল্প (ছোটগল্প বাছাই করা গল্পের সংকলন) ; প্র. প্র. : ১৯৫৬

কালান্তর (উপন্যাস) ; প্র. প্র. : ভাদ্র ১৩৬৩ (১৯৬৫)। প্রকাশক : [?]।

কালাভং (গল্প সংকলন) ; প্র. প্র. : ভাদ্র ১৩৬৩

১৯৫৭ *কালরাত্রি* (নাটক) ; প্র. প্র. : ১৯৫৭

বিষপাথর (ছোটগল্প সংকলন) ; প্র. প্র. : ১৯৫৭। প্রকাশক : শ্রীগুরু লাইব্রেরী।

১৯৫৮ *সপ্তপদী* (উপন্যাস) ; প্র. প্র. : পৌষ ১৩৬৪ (১৯৫৮)। প্রকাশক : বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।

বিপাশা (উপন্যাস) : প্র. প্র. : মাঘ ১৩৫৪ (১৯৫৮)। প্রকাশক : ডি. এম. লাইব্রেরী, কলকাতা।

রাধা (ঐতিহাসিক উপন্যাস) ; প্র. প্র. : ফাল্গুন ১৩৬৪ (মার্চ ১৯৫৮)। প্রকাশক : ত্রিবেণী প্রকাশন, কলকাতা। গ্রন্থাবদ্ধ হওয়ার পূর্বে উপন্যাসটি শারদীয় 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

১৯৫৯ *মানুষের মন* (ছোটগল্প সংকলন) প্র. প্র. : বৈশাখ ১৩৬৫ (এপ্রিল ১৯৫৯)।

ডাকহরকরা (উপন্যাস) ; উপন্যাসটির বীজগল্প 'ডাকহরকরা' ১৩৪৩ বঙ্গাব্দের কার্তিক সংখ্যা 'প্রবাসী'-তে প্রকাশিত হয় এবং *জলসাঘর* গল্পগ্রন্থে সংকলিত হয়।

রচনা সংগ্রহ ১ম খণ্ড (উপন্যাস-নাটক-গল্পের সংগ্রহ) ; প্র. প্র. : ১৩৬৫

রবিবারের আসর (ছোটগল্প সংকলন) ; প্র. প্র. : ১৩৬৫ (জুলাই ১৯৫৯)

মস্কোতে কয়েকদিন (ভ্রমণকাহিনী) ; প্র. প্র. : আশ্বিন ১৩৬৫ (১৯৫৯)। প্রকাশক : অভিজিৎ প্রকাশনী, কলকাতা।

১৯৬০ *যোগভ্রষ্ট* (উপন্যাস) ; প্র. প্র. : শ্রাবণ ১৩৬৭ (১৯৬০)। প্রকাশক : ত্রিবেণী প্রকাশন প্রাইভেট লিঃ, কলকাতা।

মহাশ্বেতা (উপন্যাস) ; প্র. প্র. : অগ্রহায়ণ ১৯৬৭ (১৯৬০)। প্রকাশক : বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।

না (উপন্যাস) ; প্র. প্র. : অগ্রহায়ণ ১৯৬৭ (১৯৬০)।

পৌষলক্ষ্মী (ছোটগল্প সংকলন) ; প্র. প্র. শ্রাবণ ১৩৬৭ (১৯৬০)। প্রকাশক : করুণা প্রকাশনী, কলকাতা।

আলোকাভিসার (ছোটগল্প সংকলন) ; প্র. প্র. : ১৩৬৭। প্রকাশক উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির, কলকাতা।

১৯৬১ *প্রেমের গল্প* (বাছাই গল্প-সংকলন) ; প্র. প্র. : ১৯৬১

Dhaka University Institutional Repository

নাগরিক (উপন্যাস) ; প্র. প্র. : ১৯৬১

১৯৬২ *নিশিপদ্ম* (উপন্যাস) ; প্র. প্র. : মাঘ ১৩৬৮ (ফেব্রুয়ারি ১৯৬২)। প্রকাশক : বাক্‌সাহিত্য, কলকাতা।
অ্যাকসিডেন্ট (গল্প সংকলন) ; প্র. প্র. : ১৯৬২
সংঘাত (নাটক) ; প্র. প্র. : ১৯৬২
ছোটদের ভালো ভালো গল্প (বাছাই গল্প-সংগ্রহ) ; প্র. প্র. : ১৯৬২
চিরন্তনী (গল্প সংকলন) ; প্র. প্র. : ফাল্গুন ১৩৬৮

১৯৬৩ *কান্না* (উপন্যাস) ; প্র. প্র. : বৈশাখ ১৩৬৯। প্রকাশক : গ্রন্থপ্রকাশ, কলকাতা।
যতিভঙ্গ (উপন্যাস) ; প্র. প্র. : ১৩৬৯। প্রকাশক [?]।
আমার সাহিত্য জীবন ২য় খণ্ড (আত্মজীবনী) ; প্র. প্র. : বৈশাখ ১৩৬৯
তমসা (গল্প সংকলন) ; প্র. প্র. : ১৯৬৩ (১৩৭০)
কালবৈশাখী (উপন্যাস) ; প্র. প্র. : জ্যৈষ্ঠ ১৩৭০ (জুন ১৯৬৩)। প্রকাশক : প্রাইমা পাবলিকেশনস্, কলকাতা।
ভারতবর্ষ ও চীন (প্রবন্ধ) ; প্র. প্র. : ১৩৭০ (১৯৬৩) : প্রকাশক : এম. সি. সরকার, কলকাতা।
গল্প পঞ্চাশৎ (বাছাই গল্পের সংগ্রহ) ; প্র. প্র. : আশ্বিন ১৩৭০ (অক্টোবর ১৯৬৩)।
একটি চড়ুই পাখি ও কালো মেয়ে (উপন্যাস) ; প্র. প্র. : আশ্বিন ১৩৭০ (অক্টোবর ১৯৬৩)। প্রকাশক : বাক্ সাহিত্য, কলকাতা।
আয়না (ছোটগল্প সংকলন) ; প্র. প্র. : ১৯৬৩ (১৩৭০)।

১৯৬৪ *জঙ্গলগড়* (ঐতিহাসিক উপন্যাস) ; প্র. প্র. : ফাল্গুন ১৩৭০। (ফেব্রুয়ারি ১৯৬৪)। প্রকাশক : গ্রন্থপ্রকাশ, কলকাতা।
চিন্ময়ী (ছোটগল্প সংকলন) ; প্র. প্র. : ১৩৭১ (১৯৬৪)।
মঞ্জুরী অপেরা (উপন্যাস) ; প্র. প্র. : বৈশাখ ১৩৭১ (১৯৬৪)। প্রকাশক : ডি. এম. লাইব্রেরী, কলকাতা।
ভুবনপুরের হাট (উপন্যাস) ; প্র. প্র. : আষাঢ় ১৩৭১ (১৯৬৪)। প্রকাশক : শ্রীগুরু লাইব্রেরী, কলকাতা।
সংকেত (উপন্যাস) : প্র. প্র. : আষাঢ় ১৩৭১ (১৯৬৪)। প্রকাশক : মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা।
বসন্তরাগ (উপন্যাস) ; প্র. প্র. : আষাঢ় ১৩৭১ (১৯৬৪)। প্রকাশক : গ্রন্থপ্রকাশ, কলকাতা।
একটি প্রেমের গল্প (ছোটগল্প সংকলন) ; প্র. প্র. : মাঘ ১৩৭১ (১৯৬৪)।

১৯৬৫ *বিচিত্রা* (উপন্যাস) ; প্র. প্র. : আষাঢ় ১৩৭২ (১৯৬৫)।
গন্নাবেগম (ঐতিহাসিক উপন্যাস) ; প্র. প্র. : আষাঢ় ১৩৭২ (১৯৬৫)। প্রকাশক : মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা।

১৯৬৬ *অরণ্য-বহ্নি* (ঐতিহাসিক রোমান্স) ; প্র. প্র. : এপ্রিল ১৯৬৬। প্রকাশক : গ্রন্থম, কলকাতা।
হীরাপান্না (উপন্যাস) ; প্র. প্র. : জ্যৈষ্ঠ ১৩৭২ (১৯৬৬)
গুরুদক্ষিণা (উপন্যাস) ; প্র. প্র. : শ্রাবণ ১৩৭২ (১৯৬৬)। প্রকাশক : দেব সাহিত্য কুটির প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।
কিশোর সঞ্চয়ন (গল্পসংগ্রহ) প্র. প্র. : ১৯৬৬।

১৯৬৭ *তপোভঙ্গ* (ছোটগল্প সংকলন) প্র. প্র. : ১৩৭৩। প্রকাশক : রবীন্দ্র লাইব্রেরী, কলকাতা।
দীপার প্রেম (ছোটগল্প সংকলন) প্র. প্র. : ১৩৭৩।
মহানগরী (উপন্যাস : প্র. প্র. : আষাঢ় ১৩৭৩ (১৯৬৭)। প্রকাশক : তুলি-কলম, কলকাতা।
শঙ্করবাঈ (ঐতিহাসিক উপন্যাস) ; প্র. প্র. : কার্তিক ১৩৭৪ (নভেম্বর ১৯৬৭)। প্রকাশক : দেব সাহিত্য কুটির, কলকাতা।
শুকসারী-কথা (উপন্যাস) প্র. প্র. : ভাদ্র ১৩৭৪ (১৯৬৭)। প্রকাশক : মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা।
নারী রহস্যময়ী (ছোটগল্প সংকলন) ; প্র. প্র. : ১৯৬৭ (১৩৭৪)।
পাঞ্চকন্যা (ছোটগল্প সংকলন) ; প্র. প্র. : ১৯৬৭ (১৩৭৪) প্রকাশক : রবীন্দ্র লাইব্রেরী।
শিবানীর অদৃষ্ট (ছোটগল্প সংকলন) ; প্র. প্র. ১৯৬৭ (১৩৭৪)

১৯৬৮ *গবিন সিংহের ঘোড়া* (ছোটগল্প সংকলন) ; প্র. প্র. : ১৯৬৮
জায়া (ছোটগল্প সংকলন) ; প্র. প্র. ১৯৬৮

১৯৬৯ *মণি বউদি* (উপন্যাস); প্র. প্র. : শ্রাবণ ১৩৭৫। প্রকাশক : বাক্ সাহিত্য প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।
ছায়াপথ (ঐতিহাসিক উপন্যাস) ; প্র. প্র. : আষাঢ় ১৩৭৬ (১৯৬৯)। প্রকাশক : ডি. এম. লাইব্রেরী, কলকাতা।
এক পশলা বৃষ্টি (ছোটগল্প সংকলন) প্র. প্র. : ১৯৬৯।
ছোটদের শ্রেষ্ঠগল্প (কিশোর গল্প-সংগ্রহ) ; প্র. প্র. : ১৯৬৯
মিছিল (ছোটগল্প সংকলন) ; প্র. প্র. ১৯৬৯

Dhaka University Institutional Repository

১৯৭০ *কালরাত্রি* (উপন্যাস) প্র. প্র. : নববর্ষ ১৩৭৭ (এপ্রিল ১৯৭০) । প্রকাশক : তুলি-কলম, কলকাতা। রূপসী *বিহঙ্গিনী* (ছোটগল্প সংকলন) ; প্র. প্র. : ১৯৭০।

১৯৭১ *ফরিয়াদ* (উপন্যাস) প্র. প্র. : ১ বৈশাখ ১৩৭৮ (১৯৭১)। প্রকাশক : মণ্ডল বুক হাউস, কলকাতা। *অভিনেত্রী* (উপন্যাস) ; প্র. প্র. : ফাল্গুন ১৩৭৭ (১৯৭১) প্রকাশক : তুলি-কলম, কলকাতা।

মৃত্যুর পর প্রকাশিত গ্রন্থ

১৯৭১ *রবীন্দ্রনাথ ও বাংলার পল্লী* (প্রবন্ধ সংকলন) ; প্র. প্র. : ভাদ্র ১৩৭৮ (সেপ্টেম্বর ১৯৭১)। প্রকাশক : সাহিত্য সংসদ, কলকাতা।

শতাব্দীর মৃত্যু ১ম খণ্ড (উপন্যাস) : প্র. প্র. : ১৩৭৮ (১৯৭১)। প্রকাশক : মণ্ডল বুক হাউস, কলকাতা। ১৯৭১ ; প্র. প্র. : ১৩৭৮ (১৯৭১)। প্রকাশক : মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা। ১৯৭১ গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তারাশঙ্কর রচিত সর্বশেষ দুটি উপন্যাস একটি কালো মেয়ের কথা-র ও সুতপার তপস্যা।

১৯৭২ *ব্যর্থ-নায়িকা* (উপন্যাস) ; প্র. প্র. : জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৯। প্রকাশক : বাক্‌সাহিত্য, কলকাতা।

সখী ঠাকুরণ (ছোটগল্প সংকলন) ; প্র. প্র. : জ্যৈষ্ঠ ১৯৭৯। প্রকাশক : মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা।

তারাশঙ্কর-রচনাবলী প্রথম খণ্ড ; প্র. প্র. : ৮ শ্রাবণ ১৩৯৭ (জুলাই ১৯৭২)। প্রকাশক : মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা।

তারাশঙ্কর-রচনাবলী দ্বিতীয় খণ্ড ; প্র. প্র. : শ্রাবণ ১৩৭৯ (জুলাই ১৯৭২) প্রকাশক : পূর্বোক্ত

তারাশঙ্কর-রচনাবলী তৃতীয় খণ্ড ; প্র. প্র. : আশ্বিন ১৩৭৯ (১৯৭২)। প্রকাশক : পূর্বোক্ত

১৯৭৩ *তারাশঙ্কর-রচনাবলী* চতুর্থ খণ্ড ; প্র. প্র. : বৈশাখ ১৩৮০ (১৯৭৩)। প্রকাশক : পূর্বোক্ত

নবদিগন্ত (রাজনৈতিক রোম্যান্স) ; প্র. প্র. : আষাঢ় ১৩৮০ (১৩৭৩)। প্রকাশক : দেব সাহিত্য কুটির প্রাঃ লিঃ, কলকাতা।

তারাশঙ্কর-রচনাবলী পঞ্চম খণ্ড ; প্র. প্র. : ২২ শ্রাবণ ১৩৮০ (১৯৭৩)। প্রকাশক : পূর্বোক্ত

তারাশঙ্কর-রচনাবলী ষষ্ঠ খণ্ড ; প্র. প্র. : ৬ ভাদ্র ১৩৮০ (১৯৭৩) প্রকাশক : পূর্বোক্ত

১৯৭৪ *তারাশঙ্কর-রচনাবলী* সপ্তম খণ্ড ; প্র. প্র. : চৈত্র ১৩৮০ (১৯৭৪) প্রকাশক : পূর্বোক্ত

কাঞ্চনী বিলের ধারে মালঞ্চার চর (কিশোর উপন্যাস); প্র. প্র. : ১৩৮০। প্রকাশক: দেব সাহিত্য কুটির, কলকাতা।

জনপদ (উপন্যাস) ; প্র. প্র. : ১৩৮০। প্রকাশক : ডি. এম. লাইব্রেরী, কলকাতা।

তারাশঙ্কর-রচনাবলী অষ্টম খণ্ড ; প্র. প্র. : ২২ শ্রাবণ ১৩৮১ (১৯৭৪)। প্রকাশক : পূর্বোক্ত

১৯৭৫ *তারাশঙ্কর-রচনাবলী* নবম খণ্ড ; প্র. প্র. : ১ ফাল্গুন ১৩৮১ (১৯৭৫)। প্রকাশক : পূর্বোক্ত

তারাশঙ্কর-রচনাবলী দশম খণ্ড; প্র. প্র. : বৈশাখ ১৩৮২ (১৯৭৫)। প্রকাশক : পূর্বোক্ত

তারাশঙ্কর-রচনাবলী একাদশ খণ্ড ; প্র. প্র. : ভাদ্র ১৩৮২ (১৯৭৫) প্রকাশক : পূর্বোক্ত

Dhaka University Institutional Repository

তারাশঙ্কর-বিষয়ক সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

অচিন্ত্য বিশ্বাস : *তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়: কবি* ; কলকাতা, ১৯৯৯

অলোক রায় : *তারাশঙ্কর: দেশ কাল* ; [?]

অমরেশ দাশ : *তালাশঙ্করের উপন্যাস* ; কলকাতা, ১৯৯৮

আদিত্য মুখোপাধ্যায় : *তারাশঙ্কর: সময় ও সমাজ* ; কলকাতা , ১৯৯৩

উজ্জ্বলকুমার মজুমদার (সম্পাদক) : *তারাশঙ্কর : দেশ কাল সাহিত্য* ; কলকাতা, ১৩৮৪

উজ্জ্বলকুমার মজুমদার ও সরিৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদক) : *তারাশঙ্কর স্মারক গ্রন্থ*, কলকাতা, ১৪০৬

উদয়চাঁদ দাস : *কবি তারাশঙ্কর ও তারাশঙ্করের কবি* ; কলকাতা, ১৯৯৮

কাঞ্চনকুন্তলা মুখোপাধ্যায় (সম্পাদক): *পত্ররেখায় তারাশঙ্কর* ; কলকাতা

ক্ষেত্রগুপ্ত : *তারাশঙ্কর : অনুসন্ধান ৯৮* ; কলকাতা, ১৯৯৮

গৌরমোহন রায় : *তারাশঙ্কর সাহিত্য সমীক্ষা* ; কলকাতা, ১৯৯৮

গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য : *বিভূতিভূষণ- তারাশঙ্কর : ব্যক্তিরূপ* ; কলকাতা, ১৯৮৯

চৈতালী বন্দ্যোপাধ্যায় : *উপন্যাসে আঙ্গিক: বিভূতিভূষণ ও তারাশঙ্কর* ; কলকাতা, ১৯৯০

দেবেশ রায় : *তারাশঙ্কর : নিরন্তর দেশ* ; কলকাতা, ২০০৩

ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় (সম্পাদক) : *যুগলবন্দী গল্পকার: তারাশঙ্কর মানিক* ; কলকাতা, ১৯৯৪

: *তারাশঙ্কর : সমকাল ও উত্তরকালের দৃষ্টিতে* ; কলকাতা, ১৯৯৯

নিতাই বসু : *তারাশঙ্করের শিল্পিমানস* ; কলকাতা, ১৯৮৮

প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্য (সম্পাদিত) : *তারাশঙ্কর : ব্যক্তিত্ব ও সাহিত্য* , নতুন দিল্লী, ২০০১

বাণী রায় : *তারাশঙ্কর – স্মৃতিচারণ* ; কলকাতা, ১৪০৯

বিমলকুমার মুখোপাধ্যায় : *এক আকাশ : দুই নক্ষত্র* ; কলকাতা, ১৯৯৮

বিশ্বনাথ দে (সম্পাদক) : *তারাশঙ্কর স্মৃতি* ; কলকাতা

বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য : *ছোটগল্প ত্রয়ী– তারাশঙ্কর-বিভূতিভূষণ-মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়* ; কলকাতা , ১৯৮৫

ভীষ্মদেব চৌধুরী : *তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস : সমাজ ও রাজনীতি* ; ঢাকা, ১৯৯৮

: *তারাশঙ্কর স্মারক গ্রন্থ* (সম্পাদিত) ; ঢাকা, ২০০১

মুক্তি চৌধুরী : *ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর* ; কলকাতা, ১৯৭৭

রবিন পাল ও অন্যান্য (সম্পাদিত) : *প্রসঙ্গ : হাঁসুলী বাঁকের উপকথা* ; কলকাতা, ১৯৯৬

রঞ্জিতকুমার মুখোপাধ্যায় : *তারাশঙ্কর ও রাঢ়-বাংলা* ; কলকাতা, ১৯৯৭

শকুন্তলা ভট্টাচার্য : *রুক্ষ মাটির কবিয়াল* ; কলকাতা, ১৯৯৮

সফিকুন্নবী সামাদী : *তারাশঙ্করের ছোটগল্প : জীবনের শিল্পিত সত্য* , ঢাকা, ২০০৪

সমরেন্দ্রনাথ মল্লিক : *তারাশঙ্কর : জীবন ও সাহিত্য* ; কলকাতা, ১৯৮৯

সরিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় : *আমার পিতা তারাশঙ্কর* ; কলকাতা, ১৯৮৬

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় : *তারাশঙ্করের ভারতবর্ষ* ; কলকাতা, ২০০৩

: *তারাশঙ্কর অন্বেষা* (সম্পাদিত) ; কলকাতা, ১৯৮৭

সুজিতকুমার নাগ (সম্পাদক) : *তারাশঙ্কর স্মৃতিকথা* ; কলকাতা, ১৯৭১

হরপ্রসাদ মিত্র : *তারাশঙ্কর*, কলকাতা, শতাব্দী গ্রন্থভবন, প্রথম প্রকাশ, আষাঢ়, ১৩৬৮

Mahasveta Devi : *Tarasankar Bandyopadhyay* ; New Delhi , 1975

Dhaka University Institutional Repository

তারাশঙ্কর-বিষয়ক উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধপঞ্জি

অখিল নিয়োগী : "অগ্রজ সাহিত্যিক তারাশঙ্কর" ; *তারাশঙ্কর : সমকাল ও উত্তর কালের দৃষ্টিতে,* সম্পাদক: ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়, কলকাতা ১৯৯৯

অখিলেশ্বর ভট্টাচার্য : "পাষাণপুরী" ; 'শনিবারের চিঠি'(তারাশঙ্কর সংখ্যা), সম্পাদক : রঞ্জনকুমার দাস, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ জুলাই ১৯৯৮

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত : "জনগণ নয়, গণদেবতা" ; *তারাশঙ্কর : সমকাল ও উত্তর কালের দৃষ্টিতে,*পূর্বোক্ত

অচিন্ত্য বিশ্বাস : "আর এক আরম্ভের ভূমিকা" ; *তারাশঙ্কর : সমকাল ও উত্তর কালের দৃষ্টিতে,* পূর্বোক্ত

অচ্যুত গোস্বামী : "তারাশঙ্করের সাম্প্রতিক উপন্যাস";'শনিবারের চিঠি' (তারাশঙ্কর সংখ্যা), পূর্বোক্ত

অনিল চক্রবর্তী :"উজ্জ্বল তারাশঙ্কর" ; 'শনিবারের চিঠি' (তারাশঙ্কর সংখ্যা), 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি' (তারাশঙ্কর স্মৃতি সংখ্যা),সম্পাদক : সঞ্জীবকুমার বসু, কলকাতা, বর্ষ ২৮, সংখ্যা ২

অব্যয়কুমার দাশগুপ্ত : "তারাশঙ্কর : মাটি ও মানুষ"; পরিচয় (সমালোচনা সংখ্যা), এপ্রিল-মে ১৯৮৭

অভিজিৎ মজুমদার : "তারাশঙ্কর : 'নাগিনী কন্যার কাহিনী' ; অধিবাচন রীতি ও লোকবৃত্তের শৈলী"; 'লোকসংস্কৃতি গবেষণা', পূর্বোক্ত

অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য : "রবীন্দ্রনাথ ও তারাশঙ্কর"; *তারাশঙ্কর : সমকাল ও উত্তর কালের দৃষ্টিতে,* পূর্বোক্ত

অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় : "ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর" ; *তারাশঙ্কর : সমকাল ও উত্তর কালের দৃষ্টিতে,* পূর্বোক্ত

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় : "আরোগ্য-নিকেতন পুনর্বিচার" 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি' (তারাশঙ্কর স্মৃতি সংখ্যা), পূর্বোক্ত

অরুণ চৌধুরী : "তারাশঙ্কর : সামাজিক বাস্তবতার এক সার্থক রূপ-কার";*তারাশঙ্কর : সমকাল ও উত্তর দৃষ্টিতে,* পূর্বোক্ত

অলোক রায় : "কালিন্দী : বিপ্লবের আগমনী"; 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি' (তারাশঙ্কর স্মৃতি সংখ্যা), পূর্বোক্ত

অরূপকুমার দাস : "তারাঙ্করের উপন্যাস সমাজ আর্থ শ্রেণী বিন্যাস", *তারাশঙ্কর : সমকাল ও উত্তর কালের দৃষ্টিতে,* পূর্বোক্ত

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : "তারাশঙ্কর, বিশালতা ও উত্তর কাল"; *তারাশঙ্কর : সমকাল ও উত্তর কালের দৃষ্টিতে,* পূর্বোক্ত

অসিত দত্ত : "একটি ঐতিহাসিক সমীক্ষা"; *তারাশঙ্কর : সমকাল ও উত্তর কালের দৃষ্টিতে,* পূর্বোক্ত

অসীম রায় : "তারাশঙ্কর প্রসঙ্গে"; *তারাশঙ্কর : সমকাল ও উত্তর কালের দৃষ্টিতে,* পূর্বোক্ত

অশ্রুকুমার সিকদার : "না পড়িয়া উপন্যাস কন্‌তিনাতাল"; সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১-৪ সংখ্যা, ১০৪ বর্ষ

আশাপূর্ণা দেবী : "জীবনশিল্পী তারাশঙ্কর"; *তারাশঙ্কর : সমকাল ও উত্তর কালের দৃষ্টিতে,* পূর্বোক্ত

Dhaka University Institutional Repository

আশুতোষ ভট্টাচার্য : "তারাশঙ্কর ও রাঢ়ের লোক সংস্কৃতি"; *তারাশঙ্কর : সমকাল ও উত্তর কালের দৃষ্টিতে*, পূর্বোক্ত

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় : "একটি সহিষ্ণু সম্রাট"; *তারাশঙ্কর : সমকাল ও উত্তর কালের দৃষ্টিতে*, পূর্বোক্ত

একরাম আলি : "তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়: বীরভূমের প্রত্নমুখ": *তারাশঙ্কর: ব্যক্তিত্ব ও সাহিত্য*, সাহিত্য অকাদেমি, নতুন দিল্লী, ২০০১

ইন্দ্র দুগার : "শিল্পী তারাশঙ্কর"; *তারাশঙ্কর : সমকাল ও উত্তর কালের দৃষ্টিতে*, পূর্বোক্ত

উত্তম দাস . "ঔপন্যাসিক তারাশঙ্করের কবি সত্তা", *তারাশঙ্কর : সমকাল ও উত্তর কালের দৃষ্টিতে*, পূর্বোক্ত

উদয়কুমার চক্রবর্তী : "তারাশঙ্করের ছোটগল্প : গদ্যশৈলী", *তারাশঙ্কর : সমকাল ও উত্তর কালের দৃষ্টিতে*, পূর্বোক্ত

উদয়চাঁদ দাস : "কথাসাহিত্যে সমাজতত্ত্ব : তারাশঙ্কর" ; *তারাশঙ্কর : সমকাল ও উত্তর কালের দৃষ্টিতে*, পূর্বোক্ত

এস. এম. মনির হোসেন : "'পদ্মবউ' ও 'কুষ্ঠরোগীর বউ' : সাদৃশ্য বৈসাদৃশ্য"; *তারাশঙ্কর স্মারকগ্রন্থ*, সম্পাদক : ভীষ্মদেব চৌধুরী, নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০১

কমলাকান্ত পাঠক : "আমার তারাশঙ্কর"; 'শনিবারের চিঠি', (তারাশঙ্কর সংখ্যা), পূর্বোক্ত

করুণাসিন্ধু দাস : "তারাশঙ্করের বাক্‌শিল্প উপাত্ত এবং নির্মাণে"; *তারাশঙ্কর : সমকাল ও উত্তর কালের দৃষ্টিতে*, পূর্বোক্ত

কাঞ্চনকুন্তলা মুখোপাধ্যায় : "তারাশঙ্করের উপন্যাসে নদীমাতৃকতা"; *তারাশঙ্কর : সমকাল ও উত্তর কালের দৃষ্টিতে*, পূর্বোক্ত

কাননবিহারী গোস্বামী : "তারাশঙ্করের গানের জগৎ"; *তারাশঙ্কর : সমকাল ও উত্তর কালের দৃষ্টিতে*, পূর্বোক্ত

কালিদাস রায় : "আশীর্বাদ"; 'শনিবারের চিঠি' (তারাশঙ্কর সংখ্যা), পূর্বোক্ত

কালিদাস রায় : "কথাসাহিত্যে তারাশঙ্কর"; *তারাশঙ্কর : সমকাল ও উত্তর কালের দৃষ্টিতে*, পূর্বোক্ত

কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহী : "স্মৃতির মণিকোঠায়"; *তারাশঙ্কর : সমকাল ও উত্তর কালের দৃষ্টিতে*, পূর্বোক্ত

কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত : "তারাশঙ্করের উদ্দেশে"; 'শনিবারের চিঠি', (তারাশঙ্কর সংখ্যা), পূর্বোক্ত

কুমুদরঞ্জন মল্লিক : "তারাশঙ্করের প্রতি" ; 'শনিবারের চিঠি' (তারাশঙ্কর সংখ্যা), পূর্বোক্ত

গিয়াস শামীম : "'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা : কাহারকুলের পাঁচালী'', 'ঊষালোকে', সম্পাদক : মোহাম্মদ শাকেরউল্লাহ, নব পর্যায় চতুর্থ সংখ্যা, জানুয়ারি-মার্চ ২০০৬

গুণময় মান্না : "তারাশঙ্কর", *তারাশঙ্কর : সমকাল ও উত্তর কালের দৃষ্টিতে*, পূর্বোক্ত

গোপাল হালদার : "তারাশঙ্করের দ্বিতীয় প্রহর"; *তারাশঙ্কর : সমকাল ও উত্তর কালের দৃষ্টিতে*, পূর্বোক্ত

: "তারাশঙ্করের দান ও স্থান"; 'শনিবারের চিঠি' (তারাশঙ্কর সংখ্যা), পূর্বোক্ত

চন্দ্রমল্লী সেনগুপ্ত : "সাহিত্যে মিথ"; *তারাশঙ্কর : সমকাল ও উত্তর কালের দৃষ্টিতে*, পূর্বোক্ত

চিন্মোহন সেহানবীশ : "তারাশঙ্কর স্মৃতি": *তারাশঙ্কর : সমকাল ও উত্তর কালের দৃষ্টিতে*, পূর্বোক্ত

Dhaka University Institutional Repository

জগদীশ ভট্টাচার্য : "ভারতশিল্পী তারাশঙ্কর"; 'শনিবারের চিঠি' (তারাশঙ্কর সংখ্যা), পূর্বোক্ত

: "কবি তারাশঙ্কর"; *তারাশঙ্কর : সমকাল ও উত্তর কালের দৃষ্টিতে*, পূর্বোক্ত

জহর সেন মজুমদার : "তারাশঙ্কর প্রেমে ও পিপাসায়"; *তারাশঙ্কর : সমকাল ও উত্তর কালের দৃষ্টিতে*, পূর্বোক্ত

জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় : "তারাশঙ্করের গল্প, অনুশাসন পর্বের একটি দিক"; *তারাশঙ্কর : সমকাল ও উত্তর কালের দৃষ্টিতে*, পূর্বোক্ত

: "তারাশঙ্কর: লোকসমাজের বৃত্তিবদল ও ধর্মীয় সমীকরণ"; 'লোকসংস্কৃতি গবেষণা', পূর্বোক্ত

জ্যোতির্ময় ঘোষ : "জীবন এত ছোট কেনে?"; *তারাশঙ্কর : সমকাল ও উত্তর কালের দৃষ্টিতে*, পূর্বোক্ত

দক্ষিণারঞ্জন বসু : "আত্মচরিতের তারাশঙ্কর"; 'শনিবারের চিঠি' (তারাশঙ্কর সংখ্যা), পূর্বোক্ত

: "মাতৃভাষা প্রেমিক তারাশঙ্কর"; *তারাশঙ্কর : সমকাল ও উত্তর কালের দৃষ্টিতে*, পূর্বোক্ত

দিব্যজ্যোতি মজুমদার : "নাগিনী কন্যার কাহিনী : মোটিফ অনুসন্ধান"; *তারাশঙ্কর : সমকাল ও উত্তর কালের দৃষ্টিতে*, পূর্বোক্ত

দীপক মুখোপাধ্যায় : "তারাশঙ্করের সাহিত্যে লোকসমাজ"; *তারাশঙ্কর : সমকাল ও উত্তর কালের দৃষ্টিতে*, পূর্বোক্ত

দেবব্রত ভৌমিক : "'উত্তরায়ণ' : উত্তরণের কাহিনী"; 'শনিবারের চিঠি' (তারাশঙ্কর সংখ্যা), পূর্বোক্ত

দেবাশিস্ মুখোপাধ্যায় : "নরনারী"; *তারাশঙ্কর : সমকাল ও উত্তর কালের দৃষ্টিতে*, পূর্বোক্ত

দেবেশ রায় : "বংশানুক্রমিক প্রশ্নটি"; সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, পূর্বোক্ত

: "নিরন্তর দেশ ভাষার বহির্দেশ"; *তারাশঙ্কর নিরন্তর দেশ*, দে'জ পাবলিশার্স, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০৩

ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় : "তারাশঙ্করের উপন্যাসে দেশকাল"; *তারাশঙ্কর : সমকাল ও উত্তর কালের দৃষ্টিতে*, পূর্বোক্ত

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত : "জীবনশিল্পী তারাশঙ্কর"; *তারাশঙ্কর : সমকাল ও উত্তর কালের দৃষ্টিতে*, পূর্বোক্ত

নন্দদুলাল বণিক : "আধ্যাত্মিকতা : তারাশঙ্কর" ; *তারাশঙ্কর : সমকাল ও উত্তর কালের দৃষ্টিতে*, পূর্বোক্ত

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : "আত্মদীপ তারাশঙ্কর"; 'শনিবারের চিঠি' (তারাশঙ্কর সংখ্যা), পূর্বোক্ত

নারায়ণ দাশশর্মা : "'আধুনিক' তারাশঙ্কর"; 'শনিবারের চিঠি' (তারাশঙ্কর সংখ্যা), পূর্বোক্ত

নিতাই বসু : "আরোগ্য নিকেতন, দুই কালের দ্বন্দ্ব"; 'শনিবারের চিঠি', (তারাশঙ্কর সংখ্যা), পূর্বোক্ত

পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় : "আপনাতে আপনি ভাস্বর"; *তারাশঙ্কর : সমকাল ও উত্তর কালের দৃষ্টিতে*, পূর্বোক্ত

পল্লব সেনগুপ্ত : "সাহিত্যিক নৃতত্ত্ব ও তারাশঙ্কর"; *তারাশঙ্কর : সমকাল ও উত্তর কালের দৃষ্টিতে*, পূর্বোক্ত

Dhaka University Institutional Repository

: "সাহিত্যিক নৃতত্ত্বের মাপকাঠি ও চারটি উপন্যাস"; তারাশঙ্কর: শততম বর্ধাপন, পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি, প্র. প্র. ২০০১

পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় : "তারাশঙ্করের সাহিত্যচিন্তা"; *তারাশঙ্কর : সমকাল ও উত্তর কালের দৃষ্টিতে*, পূর্বোক্ত

পিয়ের ফালোঁ এস. জে : "তারাশঙ্কর"; *তারাশঙ্কর : সমকাল ও উত্তর কালের দৃষ্টিতে*, পূর্বোক্ত

প্রণব মিত্র : "উপন্যাসের শিল্পরীতি : তারাশঙ্কর"; 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি' (তারাশঙ্কর স্মৃতি সংখ্যা), পূর্বোক্ত

প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্য :সমাজের মাত্রা এবং তারাশঙ্করের উপন্যাস : 'চৈতালী-ঘূর্ণি'" ; *তারাশঙ্কর স্মারকগ্রন্থ* , পূর্বোক্ত

: "কবির কথায়"; *তারাশঙ্কর: ব্যক্তিত্ব ও সাহিত্য*, পূর্বোক্ত

প্রবালকুমার সেন : "তারাশঙ্করের জীবনদর্শন"; *তারাশঙ্কর : সমকাল ও উত্তর কালের দৃষ্টিতে*, পূর্বোক্ত

প্রবোধকুমার সান্যাল : "তারাশঙ্কর"; *তারাশঙ্কর : সমকাল ও উত্তর কালের দৃষ্টিতে*, পূর্বোক্ত

প্রলয় সেন : "মন্বন্তর : একটি সমীক্ষা"; 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি' (তারাশঙ্কর স্মৃতি সংখ্যা), পূর্বোক্ত

প্রভাকর মাচওয়ে : "তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়"; *তারাশঙ্কর : সমকাল ও উত্তর কালের দৃষ্টিতে*, পূর্বোক্ত

প্রভাতকুমার দাস : "তারাশঙ্কর : রঙ্গমঞ্চ ও যাত্রার আসরে": *তারাশঙ্কর : সমকাল ও উত্তর কালের দৃষ্টিতে*, পূর্বোক্ত

প্রেমেন্দ্র মিত্র : "আমার চোখে তারাশঙ্কর"; 'শনিবারের চিঠি' (তারাশঙ্কর সংখ্যা), পূর্বোক্ত

: "চক্ষুদান" ; *তারাশঙ্কর : সমকাল ও উত্তর কালের দৃষ্টিতে*, পূর্বোক্ত

বনফুল : "তারাশঙ্কর প্রসঙ্গ"; *তারাশঙ্কর : সমকাল ও উত্তর কালের দৃষ্টিতে*, পূর্বোক্ত

: "তারাশঙ্কর"; 'শনিবারের চিঠি' (তারাশঙ্কর সংখ্যা), পূর্বোক্ত

বরুণকুমার চক্রবর্তী : "তারাশঙ্কর : আচার-ধর্ম ও সংস্কার"; *তারাশঙ্কর : সমকাল ও উত্তর কালের দৃষ্টিতে*, পূর্বোর্ক্ত

: ''হাঁসুলী বাঁকের উপকথা-য় লৌকিক জীবনের প্রতিফলন'', 'ঊষালোকে', পূর্বোক্ত

বারীন্দ্রনাথ দাশ : ''পরম শ্রদ্ধাষ্পদেষু'' ; 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি' (তারাশঙ্কর স্মৃতি সংখ্যা), পূর্বোক্ত

বারিদবরণ ঘোষ : "তারাশঙ্কর গ্রন্থপঞ্জি"; 'শনিবারের চিঠি' (তারাশঙ্কর সংখ্যা), পূর্বোক্ত

বাঁশরী রায়চৌধুরী : "পশ্চিমের দিকে মুখ : তারাশঙ্কর"; *তারাশঙ্কর : সমকাল ও উত্তর কালের দৃষ্টিতে*, পূর্বোক্ত

বিনয় ঘোষ : "তারাশঙ্করের সাহিত্য ও সামাজিক প্রতিবেশ"; *তারাশঙ্কর : সমকাল ও উত্তর কালের দৃষ্টিতে*, পূর্বোক্ত

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : "তারাশঙ্কর" ; *তারাশঙ্কর : সমকাল ও উত্তর কালের দৃষ্টিতে*, পূর্বোক্ত

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় : "চৈতালী ঘূর্ণি"; 'শনিবারের চিঠি' (তারাশঙ্কর সংখ্যা), পূর্বোক্ত

: "তারাশঙ্কর স্মরণে"; *তারাশঙ্কর : সমকাল ও উত্তর কালের দৃষ্টিতে*, পূর্বোক্ত

বিমলকুমার মুখোপাধ্যায় : "কথা সাহিত্য"; *তারাশঙ্কর : সমকাল ও উত্তর কালের দৃষ্টিতে*, পূর্বোক্ত

Dhaka University Institutional Repository

: "ওরা অন্ত্যজ ওরা মন্ত্রবর্জিত"; *এক আকাশ দুই নক্ষত্র* ; এবং মুশায়রা, প্র.প্র. জুলাই ১৯৯৮

বিপ্লব চক্রবর্তী : "প্রতিবেশী ভারতীয় সাহিত্য ও তারাশঙ্কর"; *তারাশঙ্কর : সমকাল ও উত্তর কালের দৃষ্টিতে* পূর্বোক্ত

বিশ্বজিৎ ঘোষ : "ছোটগল্পের শিল্পরূপ : তারাশঙ্করের 'তারিণী মাঝি'", *তারাশঙ্কর স্মারকগ্রন্থ*, পূর্বোক্ত

: "হাঁসুলী বাঁকের উপকথা : লোকপুরাণ ও লোকসংস্কৃতি প্রসঙ্গ"; 'উষালোকে', পূর্বোক্ত

বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য : "তারাশঙ্করের রাজনৈতিক চেতনার বিবর্তন ও পরিণতি"; *তারাশঙ্কর : সমকাল ও উত্তর কালের দৃষ্টিতে*, পূর্বোক্ত

বিষ্ণু দাস : "তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিত্র কথা"; *তারাশঙ্কর : সমকাল ও উত্তর কালের দৃষ্টিতে* পূর্বোক্ত

বিষ্ণু দে : "তারাশঙ্কর" ; *তারাশঙ্কর : সমকাল ও উত্তর কালের দৃষ্টিতে*, পূর্বোক্ত

বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র : "তারাশঙ্করের নাটক সম্পর্কে দু-এক কথা"; 'শনিবারের চিঠি' (তারাশঙ্কর সংখ্যা), পূর্বোক্ত

বেগম আকতার কামাল : "কীর্তিহাটের কড়চা : অধুনা মহাকাব্য"; *তারাশঙ্কর স্মারকগ্রন্থ*, পূর্বোক্ত : "হাঁসুলী বাঁকের উপকথা-র উপন্যাসায়ন" ; 'উষালোকে', পূর্বোক্ত

ভীষ্মদেব চৌধুরী : "কবি আঙ্গিক-বিবেচনা" ; *তারাশঙ্কর স্মারকগ্রন্থ*, পূর্বোক্ত

: "কালিন্দী : সামাজিক বিবর্তনের অণু-ইতিহাস" ; 'উলুখাগড়া', সম্পাদক : সৈয়দ আকরম হোসেন, প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা, আগস্ট ২০০৫

মনোজ বসু : "মানুষ তারাশঙ্কর"; 'শনিবারের চিঠি' (তারাশঙ্কর সংখ্যা), পূর্বোক্ত

মহাশ্বেতা দেবী : "তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়"; *তারাশঙ্কর : সমকাল ও উত্তর কালের দৃষ্টিতে*, পূর্বোক্ত

মাহমুদা খাতুন : "তারাশঙ্করের নারী চরিত্র : বিষাদ ও বেদনা"; *তারাশঙ্কর স্মারকগ্রন্থ*, পূর্বোক্ত

মীনাক্ষী সিংহ : "তারাশঙ্করের সাহিত্যে সমাজ চেতনা"; *তারাশঙ্কর : সমকাল ও উত্তর কালের দৃষ্টিতে*, পূর্বোক্ত

রত্না বসু : "উত্তরাধিকার"; *তারাশঙ্কর : সমকাল ও উত্তর কালের দৃষ্টিতে*, পূর্বোক্ত

রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : "লাকবিশ্বাস"; *তারাশঙ্কর : সমকাল ও উত্তর কালের দৃষ্টিতে*, পূর্বোক্ত

রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায় : "রাঢ়বঙ্গের চলমান দিনলিপি"; 'দেশ', কলকাতা, বর্ষ-৬৬, সংখ্যা-২১, আগস্ট ১৯৯৯

শক্তিপদ রাজগুরু : "লাল মাটির মানুষ"; *তারাশঙ্কর : সমকাল ও উত্তর কালের দৃষ্টিতে*, পূর্বোক্ত

শতঞ্জীব রাহা : "জগৎ, জীবন-সুখ-দুখ : তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের আত্ম-জীবন"; *তারাশঙ্কর : সমকা ও উত্তর কালের দৃষ্টিতে*, পূর্বোক্ত

শম্ভুনাথ গঙ্গোপাধ্যায় : "তারাশঙ্কর মঙ্গল-পাঁচালীর ঐতিহ্য"; 'লোকসংস্কৃতি গবেষণা', কার্তিক-পৌষ ১৪০৪

শাতকর্ণি (সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়) : "তারাশঙ্কর একটি রেখা চিত্র"; 'শনিবারের চিঠি' (তারাশঙ্কর সংখ্যা), পূর্বোক্ত

Dhaka University Institutional Repository

শিবদাস চক্রবর্তী : "স্মরণে ও সংগ্রহে তারাশঙ্কর"; 'শনিবারের চিঠি', (তারাশঙ্কর সংখ্যা), পূর্বোক্ত

শিশিরকুমার মাইতি : "তারাশঙ্করের সাহিত্যে সামন্ততন্ত্র"; *তারাশঙ্কর : সমকাল ও উত্তর কালের দৃষ্টিতে*, পূর্বোক্ত

শেখর সমদ্দার : "তারাশঙ্কর ও চলচিত্র"; *তারাশঙ্কর : সমকাল ও উত্তর কালের দৃষ্টিতে*, পূর্বোক্ত

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় : "অন্তরঙ্গ তারাশঙ্কর"; *তারাশঙ্কর : সমকাল ও উত্তর কালের দৃষ্টিতে*, পূর্বোক্ত

শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : "আস্তিক্যবাদী তারাশঙ্কর"; 'শনিবারের চিঠি', (তারাশঙ্কর সংখ্যা), পূর্বোক্ত

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : "তারাশঙ্করের উপন্যাসের নবতম পর্যায়"; 'শনিবারের চিঠি', (তারাশঙ্কর সংখ্যা), পূর্বোক্ত

: "ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর"; 'শনিবারের চিঠি', (তারাশঙ্কর সংখ্যা), পূর্বোক্ত

শ্রী পান্থ : "তারাশঙ্কর"; *তারাশঙ্কর : সমকাল ও উত্তর কালের দৃষ্টিতে*, পূর্বোক্ত

সজনীকান্ত দাস : "তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশ্যে"; 'শনিবারের চিঠি', (তারাশঙ্কর সংখ্যা), পূর্বোক্ত

: "তারাশঙ্কর জীবনী", 'শনিবারের চিঠি', (তারাশঙ্কর সংখ্যা), পূর্বোক্ত

সন্তোষকুমার ঘোষ : "তিনি, তাঁর লেখায়", *তারাশঙ্কর : সমকাল ও উত্তর কালের দৃষ্টিতে*, পূর্বোক্ত

সনৎকুমার গুপ্ত : "তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থপঞ্জি"; 'শনিবারের চিঠি', (তারাশঙ্কর সংখ্যা), পূর্বোক্ত

সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : "শেষ কয়েক বছর"; 'শনিবারের চিঠি', (তারাশঙ্কর সংখ্যা), পূর্বোক্ত

সনৎকুমার মিত্র : "তারাশঙ্কর, সংস্কৃতির উত্তরাধিকার"; *তারাশঙ্কর : সমকাল ও উত্তর কালের দৃষ্টিতে*, পূর্বোক্ত

সমরেশ মজুমদার : "উপন্যাসে আঞ্চলিকতা : প্রসঙ্গ তারাশঙ্কর"; *তারাশঙ্কর : সমকাল ও উত্তর কালের দৃষ্টিতে*, পূর্বোক্ত

: "তারাশঙ্করের উপন্যাসে এপিক লক্ষণ"; *তারাশঙ্কর : সমকাল ও উত্তর কালের দৃষ্টিতে*, পূর্বোক্ত

সরকার আবদুল মান্নান : "হাঁসুলী বাঁকের উপকথা : 'রঙ'-এর জগৎ"; 'ঊষালোকে', পূর্বোক্ত

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় : "তারাশঙ্কর এবং তাঁর দেশদর্পণ"; 'দেশ', বর্ষ-৬৬, সংখ্যা- ২১, আগস্ট ১৯৯৯

: "তারাশঙ্করের উপন্যাসের মাতৃচরিত্র"; 'শনিবারের চিঠি', (তারাশঙ্কর সংখ্যা), পূর্বোক্ত

: "স্মৃতি সত্তার আগ্নেয় হদিশ : 'অরণ্য-বহ্নি' ; *তারাশঙ্কর: ব্যক্তিত্ব ও সাহিত্য*, পূর্বোক্ত

: "লালধুলোর ঘূর্ণি" ; *তারাশঙ্করের ভারতবর্ষ* , বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্র. প্র. ১৪০৮

সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় : "জীবন-সত্যের সার্থক সন্ধানী তারাশঙ্কর"; 'শনিবারের চিঠি',(তারাশঙ্কর সংখ্যা), পূর্বোক্ত

সিরাজুল ইসলাম : "তারাশঙ্করের 'রসকলি' দ্বন্দ্ব ও মীমাংসা"; *তারাশঙ্কর স্মারকগ্রন্থ*, পূর্বোক্ত

সুতপা ভট্টাচার্য : "তারাশঙ্করের শিল্পরীতি"; *তারাশঙ্কর : সমকাল ও উত্তর কালের দৃষ্টিতে*, পূর্বোক্ত

Dhaka University Institutional Repository

সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় : "জীবনতান্ত্রিক তারাশঙ্কর"; 'শনিবারের চিঠি', (তারাশঙ্কর সংখ্যা), পূর্বোক্ত

সুধীর চক্রবর্তী : "কবি উপন্যাসের লোকায়ত পাঠ"; সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, পূর্বোক্ত

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় : "বন্ধুবর"; 'শনিবারের চিঠি', (তারাশঙ্কর সংখ্যা), পূর্বোক্ত

সুমিতা চক্রবর্তী : "তারাশঙ্কর–শাস্ত্রধর্মে, মানবধর্মে"; *তারাশঙ্কর : সমকাল ও উত্তর কালের দৃষ্টিতে*, পূর্বোক্ত

: "হাঁসুলী বাঁকের উপকথা : চিরায়ত জীবন"; 'ঊষালোকে', পূর্বোক্ত

সুশীলকুমার ঘোষ : "তারাশঙ্কর তরুণের স্বপ্ন ও তৎকাল"; 'শনিবারের চিঠি', (তারাশঙ্কর সংখ্যা), পূর্বোক্ত

সুস্নাত দাস : "প্রগতি সাহিত্য-আন্দোলন ও তারাশঙ্কর"; *তারাশঙ্কর : সমকাল ও উত্তর কালের দৃষ্টিতে*, পূর্বোক্ত

সৈয়দ আজিজুর হক : "নাগিনী কন্যার কাহিনী জীবনতৃষ্ণাই মূলকথা"; *তারাশঙ্কর স্মারকগ্রন্থ*, পূর্বোক্ত

সৈয়দ মুজতাফা সিরাজ : "মাননীয় তারাশঙ্কর সমীপেষু"; ; *তারাশঙ্করঃ ব্যক্তিত্ব ও সাহিত্য*, পূর্বোক্ত

সৌমিত্র শেখর : "তারাশঙ্করের উপন্যাসে রাজনীতি"; পূর্বোক্ত

সৌরভ সিকদার : "অরণ্য-বহ্নি : ঐতিহাসিক পটভূমি"; পূর্বোক্ত

স্বাতী ঘোষ : "গণদেবতা : একটি অর্থনৈতিক পাঠ"; *তারাশঙ্কর : সমকাল ও উত্তর কালের দৃষ্টিতে*, পূর্বোক্ত

হাসান আজিজুল হক : "তারাশঙ্করঃ জীবনের গাঢ় সমাচার" ; *তারাশঙ্করঃ ব্যক্তিত্ব ও সাহিত্য*, সাহিত্য অকাদেমি, নতুন দিল্লী, ২০০১

হিমবন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় : "কবি : অন্তহীন সৃজনে সন্ধানে"; 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি', পূর্বোক্ত

হিমাদ্রি বন্দ্যোপাধ্যায় : "তারাশঙ্করের ইতিহাস ভাবনা"; *তারাশঙ্কর : সমকাল ও উত্তর কালের দৃষ্টিতে*, পূর্বোক্ত

হীরেন চট্টোপাধ্যায় : "শিল্পরূপ : তারাশঙ্করের ছোট গল্প"; 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি', পূর্বোক্ত

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় : "কীর্তিযস্য স জীবতি"; *তারাশঙ্কর : সমকাল ও উত্তর কালের দৃষ্টিতে*, পূর্বোক্ত

Dhaka University Institutional Repository

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

অচিন্তকুমার সেনগুপ্ত : *কল্লোল যুগ*; কলকাতা , এস. সি. সরকার এ্যাণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ , অষ্টম প্রকাশ, শ্রাবণ, ১৪০৫

অচ্যুত গোস্বামী : *বাংলা উপন্যাসের ধারা*; কলকাতা, পাঠভবন, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, অক্টোবর, ১৯৬৮

অতুল সুর : *ভারতের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়* ; কলকাতা, সাহিত্যলোক, প্রথম প্রকাশ, জুলাই, ১৯৮৮

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় : *কালের প্রতিমা* ; কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং , তৃতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি, ১৯৯৯

: *কালের পুত্তলিকা* ; কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং , প্রথম সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ১৯৯৫

অরুণ সান্যাল (সম্পাদক) : *প্রসঙ্গ : বাংলা উপন্যাস* ; কলকাতা, কলকাতা ওয়েস্ট বেঙ্গল পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯১

অরূপকুমার ভট্টাচার্য : *আঞ্চলিকতা : বাঙলা উপন্যাস* ; কলকাতা, পরিবেশক পুস্তক বিপণি, প্রথম প্রকাশ, মে, ১৯৮৭

অশোক মুখোপাধ্যায় (সংকলক) : *সংসদ সমার্থ শব্দকোষ* ; কলকাতা, সাহিত্য সংসদ, অষ্টম মুদ্রণ, এপ্রিল, ১৯৯৮

অশ্রুকুমার সিকদার : *আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস* ; কলকাতা, অরুণা প্রকাশনী, দ্বিতীয় পরিমার্জিত সংস্করণ, জুলাই, ১৯৯৩

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : *বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত* (খ্রিস্টীয় দশম-বিংশ শতাব্দী); কলকাতা, মর্ডাণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিঃ, একাদশ সংস্করণ, ১৯৯১

: *বাঙ্গালীর ধর্ম ও দর্শন চিন্তা (সম্পাদনা)* ; কলকাতা, নবপত্র প্রকাশন, ১৯৮০

কামরুদ্দীন আহ্‌মদ : *পূর্ব বাংলার সমাজ ও রাজনীতি* ; ঢাকা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৩৮৩

কার্ল মার্কস : *ভারতীয় ইতিহাসের কালপঞ্জী* ; মস্কো, ১৯৭১

গোপাল হালদার : *তেরশ' পঞ্চাশ*, কলকাতা ; পঁথিঘর, দ্বিতীয় প্রকাশ, জানুয়ারি, ১৯৪৬

গোপিকানাথ রায় চৌধুরী : *দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য*; কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং , প্রথম সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ১৯৮৬

: *বাংলা কথাসাহিত্য : প্রকরণ ও প্রবণতা*, কলকাতা, পুস্তক বিপণি, ১৯৯১

গৌতম ভদ্র ও পার্থ চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদক) : *নিম্নবর্গের ইতিহাস* ; কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ , দ্বিতীয় মুদ্রণ, এপ্রিল ১৯৯৯

জীবেন্দ্র সিংহ রায় : *কল্লোলের কাল* ; দে'জ পাবলিশিং , পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ, জানুয়ারি, ১৯৮৭

দেবীপদ ভট্টচার্য : *উপন্যাসের কথা* ; *প্রথম পর্ব*, কলকাতা, জি, এ, ই, পাবলিশার্স, দ্বিতীয় সংস্করণ, অক্টোবর, ১৯৯২

দেবেশ রায় : *উপন্যাস নিয়ে* ; কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং , পথম প্রকাশ, ১৯৯১

(সংকলন ও সম্পাদনা) : *দলিত*; সাহিত্য অকাদেমী, নতুন দিল্লী, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৭

দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী : : *বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনে ভারতে ক্রীতদাস প্রথা* ; কলকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সী প্রাঃ লিঃ, প্রথম প্রকাশ, অক্টোবর, ১৯৯৬

ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে : *সাঁওতাল গণসংগ্রামের ইতিহাস* ; কলকাতা, পার্ল পাবলিশার্স, পঞ্চম পরিবর্ধিত সংস্করণ, এপ্রিল, ১৯৯৬

Dhaka University Institutional Repository

নরহরি কবিরাজ : *স্বাধীনতা সংগ্রামে বাঙলা* ; কলকাতা, মনীষা, পঞ্চম প্রকাশ, জুলাই, ১৯৮৬

শিশির চট্টোপাধ্যায় : *উপন্যাস পাঠের ভূমিকা* ; কলকাতা, বুক ল্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেড, মে, ১৯৬২

শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিজিৎ দাসগুপ্ত (*সম্পাদিত*) : *জাতি, বর্ণ ও বাঙলি সমাজ* ; কলকাতা অ্যালায়েড প্রিন্টিং সিস্টেম, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৮

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় : *পঞ্চাশের মন্বন্তর* ; কলকাতা, বেঙ্গল পাবলিশার্স, তৃতীয় সংস্করণ, ভাদ্র, ১৩৫১

সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় : *ইতিহাসের দিকে ফিরে ছেচল্লিশের দাঙ্গা* ; কলকাতা, রামকৃষ্ণ প্রিন্টিং প্রেস, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯৩

সমরেশ মজুমদার : *বাংলা উপন্যাসের পঁচিশ বছর* ; কলকাতা, রত্নাবলী, প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর, ১৯৮৬

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় : *উত্তর প্রসঙ্গ* ; কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং , প্রথম প্রকাশ, আগস্ট, ১৯৮৬

: *তারাশঙ্কর অন্বেষা* (সম্পাদনা); কলকাতা, রমা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি, ১৯৮৭

: *বাংলা উপন্যাস : দ্বান্দ্বিক দর্পণ*; কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, প্রথম প্রকাশ মে, ১৯৯৩

: *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর*, কলকাতা, পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ, ১৯৭১

সুবলচন্দ্র মিত্র (সংকলিত) : *সরল বাঙ্গলা অভিধান* ; কলকাতা, নিউ বেঙ্গল প্রেস লিমিটেড, পুনঃ মুদ্রণ, ১৯৯৫

সুবোধ ঘোষ : *বাংলা কথাসাহিত্যে ব্রাত্য সমাজ* (১৯২৩-৪৭) ; কলকাতা, পুস্তক বিপণি, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি, ১৯৯৯

সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত (প্রধান সম্পাদক): *সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান* ; কলকাতা, সাহিত্য সংসদ, সংশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, ডিসেম্বর, ১৯৮৮

সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় : *স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য* ; কলকাতা, বসুধারা প্রকাশনী, ১৩৬৭

বিনয় ঘোষ : *পশ্চিম বঙ্গের সংস্কৃতি* প্রথম খণ্ড ; কলকাতা, রামকৃষ্ণ সারদা প্রেস, চতুর্থ মুদ্রণ, ডিসেম্বর, ১৯৯৫

ভেলাম ভান সেন্দেল ও এলেন বল (সম্পাদনা) : *বাংলার বহুজাতি বঙালি ছড়া অন্যান্য জাতির প্রসঙ্গ*, কলকাতা, অ্যালায়েড প্রিন্টিং সিস্টেসস্ প্রথম প্রকাশ, অক্টোবর, ১৯৯৮

: Census of India: 1991 ; District Census Handbook, Birbhum, Calcutta, 1997

Dalton, Edward Tuite C.S.I. : *The Native Races of India : The Tribal History of Eastern India* ; Cosmo Publications, Delhi, 1978

Majumder, Durgadas : *West Bengal District Gazetters: Birbhum* ; Calcutta, 1975

Russell, R, V : *The Tribes and Castes of the Central Provinces of India*, vol. iii ; Cosmo Publications, Delhi, 1975